অদৃশ্য মৃত্যুর হুক

আনন্দ বাগচী

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

প্রকাশ করেছেন
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ১৯৫৯

ছেপেছেন
বি. সি মজুমদার
বি পি এমস প্রিন্টিং প্রেস
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগণা (উঃ)

প্রচ্ছদ
বিজন কর্মকার

অদৃশ্য মৃত্যুর ছক

আনন্দ বাগচী

আমি শচীদুলালকে প্রথমে চিনতেই পারিনি। এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালা থেকে বেরিয়ে দেখলাম তখনও বেলা আছে। বাড়ির কার্নিসে ঝলমলে শাড়ির মত রোদ্দুর ঝুলছে। গোটা দুপুর একটানা পুঁথির মধ্যে হুমড়ি খেয়ে ছিলাম, এখন যেন চোখ জুড়োল। ফুটপাথের কিনারে জিরেনছুট দাঁড়িয়ে সবে একটা সিগারেট ঠোঁটে তুলেছি অমনি একটা ছায়া এসে আমার সামনে টাল খেয়ে দাঁড়াল। সিগারেট ধরানো হল না, মুখ তুলে তাকালাম। মাঝারি হাইটের একটি মানুষ, চাপদাড়ির ফাঁকে তেলরঙা দুটি দাঁত সকলের আগে চোখে পড়ল। আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে, 'চেনা যাচ্ছে?'

কস্মিনকালেও দেখেছি বলে মনে পড়ল না। তবে চিনেছি, এই ধরনের চেহারা, চেহারা না বলে চরিত্র বলাই ভাল, আমার বিলক্ষণ দেখা আছে। লোকটার পা টলছে না বটে, তবে আঁচানো মুখচোখ আর মজে আসা স্বর শুনেই বুঝলাম পেটে নির্ঘাত দু পাত্তর পড়েছে। এ সেই হোলটাইমার টাইপ, এনি টাইম খাইয়ে, যাদের দেখে বলা হয়, মাতালের কিবা দিন কিবা রাত। সন্দিগ্ধ চোখে মাথা দোলাচ্ছি দেখে আমার মনের কথা আঁচ করে সশব্দে হেসে উঠল, 'নো মতলব, নো স্লাইটেস্ট মতলব। জাস্ট একটা ওল্ড রিলেশন ঝালাই করতে দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি কি ওত্নু মজুমদারের সঙ্গে কথা বলছি? ব্যস্, ব্যস্, বলতে হবে না, বুঝে গেছি। আমি শচে, মানে গ্রেট শচীদুলাল সরকার, কেয়ার অফ ওরিয়েন্টাল সেমিনারি। থার্ড ক্লাস থেকে তোমাকে ফেয়ারওয়েল দিয়েছিলাম, মনে নেই?'

নামটা শোনার সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল। ছেলেবেলার একটা আলাদা টান থাকে, সে স্মৃতির ছবি মোছে না। ক্লাস এইটেই শচের লেখাপড়ার ইতি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর যোগাযোগ এই বছর দশেক আগে পর্যন্তও ছিল। ছিল, তার কারণ ও কেবল আমার সহপাঠীই ছিল না, ও ছিল আমার জীবনদাতা। নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে ও আমাকে একবার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। আহেরীটোলা ঘাটের সেই কালান্তক বানের মুখে সেদিন আমি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ভেসে যেতাম শচে না থাকলে। নিজের পরিচয় দেবার সময় শচী কিন্তু সেই ঘটনার উল্লেখমাত্রও করল না। ও এই রকমই চিরটাকাল।

পকেটভর্তি কাঁচা পয়সা ও বন্ধুদের জন্যে যেমন উড়িয়ে-ফুরিযে দিযেছে কোনও প্রত্যাশা না করে, প্রাণটাও যেন তেমনি। প্রসঙ্গ তুললে হয়তো মুচকি হেসে বলেই বসত, ওটা তো খেটে রোজগার করতে হযনি ভাই, অত মাযা কিসের! মুফতে পাওয়া পৈতৃক জিনিস, হাতে ছিল, খরচা করে দিলুম।

ওর চেহারা দেখে কষ্ট হচ্ছিল। বুকে জড়িযে ধরে বললাম, 'কী আশ্চর্য কাণ্ড! শচী—তুমি? কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে ভাই!'

ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল শচী, তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'চলো কোথাও গিয়ে একটু বসি। তোমার অনারে।'

আমি কঠোর গলায় বললাম, 'না।'

শচী একটু দমে গেল, ভেতরে একটু আহতও হযেছিল বোধহয। আমার হাত জড়িয়ে ধরে প্রায় মিনতি করে বলল, 'না কোরো না ভাই। কতকাল পরে দেখা, এই একটু—'

ওর ভঙ্গি দেখে দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল। ইতস্তত করে বললাম, 'বেশ, চলো। কিন্তু এভাবে চললে আর বেশিদিন—'

পলকে চাঙ্গা হযে উঠে শচী বলল, 'ড্যাম ইট! নিরিমিষ্যি একাদশী করার জন্যে শচে জন্মায়নি। বিছানায় শুযে হেঁচকি তুলে এ শালা যাবে না। বাবার মত উইদাউট টিকিটে আমি কেটে পড়ব দেখে নিযো।'

ছাত্র বয়সে শচের মুখে শোনা সেই মজার গল্পটা মনে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। হযতো গল্প না, পুরো ব্যাপারটাই নিখাদ সত্যি। শচে জন্মাবার পর ওব বাবা নাকি ওর মুখে মধুর বদলে এক আঙুল হুইস্কি দিয়ে বলেছিলেন, কারণামৃত দিয়ে শোধন করে দিলাম, যা ব্যাটা তরে গেলি! ভদ্রলোক ছিলেন চিৎপুরের এক নামকরা যাত্রাপার্টির দুর্ধর্ষ নট। খানদানি মানুষ। সন্ধের পর জীবনে কখনও জলস্পর্শ করেননি। উনচল্লিশ বছর বয়সে টুকটুকে পাকা লীভার নিয়ে জমাট আসর চমকে দিয়ে বামাল স্বর্গে চলে গিযেছিলেন। একেই বোধহয় সজ্ঞানে পরলোকগমন বলে। তা শচীর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে ও অতটা লেট করবে না, বাপের চেয়েও আর্লি রাইজ করবে।

অলিগলি ঘুরে শর্টকাট করে শচী আমাকে যেখানে নিয়ে গেল সেটা বোধহয় ওর অনেক দিনের ঠেক। সিগারেট ধরিয়ে গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে গল্প জমে উঠেছিল। পরস্পরের খবর চালাচালি আর ঠিকানা বিনিমযের পর হঠাৎ বলল, 'তোমার ওখানে যাব একদিন, আগে থেকেই বলে রাখছি। কিন্তু সেদিন যেন আবার ওরকম হুটআউট করে দিয়ো না। খুব দরকার আছে।'

'তোমাকে আবার হুটআউট কখন করলাম!'

শচী জড়ানো গলায় রীতিমত ঝোঁক দিয়ে বলল, 'বাঃ, করোনি? সেদিন নৈহাটি স্টেশনে আমাকে ইনসাল্ট করোনি?'

আমি রেগে গেলাম, 'নৈহাটি স্টেশনে! কবে? কি করেছি?'

'মাস তিনকে আগের কথা। যাকগে বাদ দাও। পাস্ট ইজ পাস্ট!'

'না, তোমাকে বলতেই হবে।' আমার নেশা এবং জেদ দুটোই চেপে গিয়েছিল।

শচী গ্লাসে আলগোছে একটা চুমুক দিয়ে কি ভাবতে লাগল।

'কই বলো?'

'তুমি বোধহয় প্ল্যাটফর্মে জল ভরতে নেমেছিলে। হাতে ওয়াটার বট্‌ল। আমি এক ভদ্রলোকেব সঙ্গে ওভাবব্রিজের দিকে যাচ্ছিলাম। দেখতে পেযে ছুটে গেলাম। নাম ধবে ডাকলাম, তুমি না শোনাব ভান কবে তাকালে না পর্যন্ত। শেষে গাযে হাত দিযে ডাকলাম। নিজের নাম বললাম। তুমি ঠেলে সরিযে দিয়ে দৌড়ে গিযে ট্রেনে উঠে পডলে। মেল ট্রেন। সেটা তখন স্টার্ট নিয়েছে।'

'অ্যাবসার্ড! হতেই পারে না। শুনে সুখী হবে, গত ছমাসের মধ্যে আমি মেল কেন, কোনও ট্রেনেই চাপিনি। কলকাতার বাইরেই যাইনি। বিলিভ মি। নেশার চোখে হযতো—'

'হুঁ।' বলে শচী কেমন সাইলেন্ট হযে গেল। ও প্রসঙ্গ আর তুলল না।

আমিও। খালি পেটে ভোজটা ইতিমধ্যেই হেভি হযে গিয়েছিল। নিয়মিত পানাভ্যাস নেই বলেই বোধহয রক্তের ভেতর হুইস্কির ছোবল বেশ গভীর হয়েছে। টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গিযেই টের পেলাম আমার পাযের তলায় ভূমিকম্প শুরু হযে গেছে। আমি যেন শিমুল তুলোর বীজের মত বাতাস ছাড়াই ভেসে যাচ্ছি, আমার হাত-পা কিছুই আর আমার পুবোপুরি বশে নেই। আমার পক্ষে বাড়ি ফেবা এবার সত্যিই শক্ত হবে। শচী কি যেন বলার জন্যে আমার কাঁধে হাত রেখে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। আমি মাছি তাড়ানোর কায়দায় হাতের ঝামটা দিয়ে তাকে নস্যাৎ করে দিলাম।

আমার আবছা চেতনার মধ্যে দূরে কোথাও টেলিফোন বাজছিল। বেজেই চলেছিল। মনে হচ্ছিল যেন স্বপ্নের ভেতবে কতকাল থেকে বেল বেজে যাচ্ছে। রাত-কাঁদুনে শিশুকে হাত বাড়িয়ে ঘুম পাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টার মত আমি বিছানায় টেলিফোন হাতড়ে যাচ্ছিলাম। একসময় যন্ত্রটা হাতে ঠেকতেই চমকে উঠলাম। চটকা ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখলাম বাইরের পোশাক পরেই আমি বিছানায় শুয়ে আছি। সিলিংয়ের আলোটা হাঁ-হাঁ করে জ্বলছে। পা থেকে জুতো-মোজা পর্যন্ত খোলা হয়নি। হাতঘড়িটায় হঠাৎ চোখ পড়ল, এখন রাত ঠিক এগারোটা।

বালিশের পাশে টিপয়ের ওপর কুণ্ডলী পাকানো বিষধরের মত টেলিফোনটা ঝনঝনিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিছুই মাথায় ঢুকছিল না, কয়েক সেকেন্ড ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে ফোনটা তুলে নিলাম। আমি সাড়া দেবার আগেই অন্য প্রান্ত থেকে একটা অচেনা কণ্ঠ ভেসে এল।

'অতনু মজুমদার?' ভরাট কাঁপধরা গলা, একটু যেন হাঁপের টান আছে। মানুষটার বোধহয় বয়স হয়েছে।

'হ্যাঁ, কথা বলছি।'

'ওঃ। এই নিয়ে চারবার আমি ফোন করলাম।' গলাটা আর এক পর্দা খাদে নেমে এল। কেমন একটু অসহিষ্ণুতা।

ঘোরটা তখনও পুবোপুরি কাটেনি। একটা হাই উঠে এসেছিল, সেটা চাপতে গিয়ে বিস্বাদ মুখের ভেতর মোদো গন্ধ টের পেলাম। আর ঠিক তখনই বিকেলবেলার ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। পার্ক স্ট্রিটের সেই এয়ারকন্ডিশন বারের ভেতর শচীদুলাল আর আমি। ভাঙা ভাঙা টুকরো টুকবো কিছু কথাবার্তা। শচী আমাকে ছাড়তে চাইছিল না। কতকাল পরে দেখা। ও চোখ ছোট করে আমাকে দেখছিল। শেষে বলল, যাঃ, এখুনি যাবে কী! সবে তো কলির সন্ধে...বউ তুলসীতলায পিদিম দিচ্ছে....এখনও চোকে ডবল দ্যাখোনি ট্রিপিল দ্যাখোনি...এটা ক'আঙুল বলো তো...অ্যাঁ?—কথাগুলো যেন ডুবজলের তলায় বহুদূর থেকে ভেসে আসছিল। আবছা, ক্ষীণ, মশার ডাকের মত পিনপিন করে। আমার এক গোঁ। ঘাড় শক্ত, একই কথা আবার বললাম, না! বাড়ি যাব। এবং এক্ষুণি! তারপর উঠে দাঁড়াতে গিয়ে জলের গেলাস ওল্টালাম, পায়ের তলায় মৃদু ভূমিকম্প টের পেলাম। মগজটা শিমুল তুলোর বীজের মত ভেসে যাচ্ছে....তারপর...তারপর আর কিছু মনে নেই। একেবারে ব্ল্যাক-আউট। অন্ধকারে ধোয়ামোছা।

'কী হল! শুনতে পাচ্ছেন, এই নিয়ে চারবার আপনাকে—'একটা উদ্বেগ পাচ্ছিলাম।

'কে আপনি?'

'আপনার পাস্ট, অতীত—'

'মানে? কী আলতু-ফালতু বকছেন!' এবার আমি বিরক্ত হই।

'আহ্! সবটা আগে শুনুন! আপনার অতীত জানতে ইচ্ছে করে না?' চাপাস্বরে যেন কানে কানে কথা বলছেন।

'না, করে না।'

'সে কী! কেন?'

'আমার অতীত আমি জানি। নতুন করে আর কিছু জানার নেই।'

'কে বলল নেই? একটা দারুণ খবর আছে, শুনলে চমকে যেতে পারেন।'

আমি এবার বাঁকা সুরে হেসে উঠলাম, 'বিজনেস খারাপ যাচ্ছে বুঝি?'

'বিজনেস? বুঝতে পারলাম না।'

'না বুঝতে পারার কি আছে! আপনি জ্যোতিষী, মানে গণৎকার। আমার অতীত আপনি বলতে চান, এই তো?'

'না। আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী। জ্যোতিষী-ফোতিসি কিছু না।'

আমি শব্দ করে হেসে উঠলাম, 'শুভাকাঙ্ক্ষী! আমার কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী নেই। আপনার নামটা জানতে পারি কি?'

'রঞ্জুপ্রসাদ। চেনেন? জানতাম চিনতে পারবেন না। তা না চিনলেও চলবে। আসলে খবরটাই আসল। খুব জরুরি। জরুরি কেন না, এর ওপর আপনার ভাগ্য, আপনার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।'

'বেশ তো বলুন, আমি শুনতে রাজী আছি।'

'ফোনে? খেপেছেন। কে কোথায় আড়ি পেতে আছে কে জানে!'

'তাহলে?'

'চলে আসুন। দেরি করবেন না। সময় খুব অল্প।'

গোটা ব্যাপারটাই কেমন রহস্য গল্পের মত ধোঁয়াটে। খুব নাটক-নাটক। তবু আমার কৌতূহল বাড়ছিল। বললাম, 'আপনিই চলে আসুন না মশাই আমার এখানে?'

রঞ্জুপ্রসাদ দুঃখিত গলায় বললেন, 'আমার পক্ষে তা আর সম্ভব নয়।'

'সম্ভব নয়! কেন?'

একটু চুপ করে থেকে উনি বললেন, 'আমি ইনভ্যালিড। হুইল চেয়ার আমার ভরসা!'

আমি অপ্রস্তুত। ধাক্কা সামলে বললাম, 'স্যরি, আমি বুঝতে পারিনি। আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন?'

'ঝাউতলা, ঝিল রোড।'

'ও ব্বাবা, সাউথে?' আমি চিন্তিত গলায় বললাম। লোকেশনটা জানা। আবছা মনে পড়ল একবার যেন গিয়েছিলাম।

'চেনেন দেখছি। বাড়ির নাম 'শেষ নমস্কার'। ব্যাপারটা গোপন বুঝতেই পারছেন, একা আসবেন কিন্তু।'

'একা?' আমি হাসলাম, 'আমি যাচ্ছিই না, তা একা আর দোকা!'

একটুক্ষণ রঞ্জুপ্রসাদ থমকে থেকে বলল, 'ঠিক আছে, সে আপনার ইচ্ছে। আপনার ব্যাপার আপনি বুঝবেন। কিন্তু এত কথার পর হঠাৎ মত বদলে ফেললেন কেন বলুন তো?'

'নিজেই বুঝে দেখুন, এই মাঝরাত্তিরে, এই ঠাণ্ডায়, নর্থ থেকে সাউথে

কে যাবে? কি করে যাবে! শুধু যাওয়া না, আবার ফিরে আসা। ইম্পসিবল।'

'রাত্তিরে কে বলেছে? কাল সকালে আসবেন, ঠিক সাড়ে দশটায়। পাক্কা! আমাকে ডাকবেন না, সিঁড়ি দিয়ে সোজা দোতলায় উঠে আসবেন। বারান্দা ক্রস করে প্রথম ঘর। দেখবেন সবুজে-হলুদে চৌখুপ্পি পর্দা ঝুলছে। আমি ভেতরে থাকব। আসছেন?'

এত আচমকা আমি সত্যিই মনস্থির করতে পারছিলাম না। নেশা ছুটে গেলেও আমার হতভম্ব ভাবটা তখনও কাটেনি। বললাম, 'আচ্ছা ভেবে দেখি।'

'ভাবুন। তবে এগারোটার মধ্যেও না এলে ধরে নেব আপনার ইন্টারেস্ট নেই, আপনি আসছেন না। তখন—'

হঠাৎ কট্ করে লাইনটা কেটে গেল। আমি বার দুই হ্যালো করে ফোনটা নামিয়ে রাখলাম। অসম্পূর্ণ কথাটা শেষ হল না। 'তখন' শব্দটা মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। আবার এক্ষুণি রিং হতে পারে ভেবে মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করে থাকলাম কিন্তু ফোন এল না। স্মৃতি হাতড়াতে হাতড়াতে আমি মনের মধ্যে উচ্চারণ করতে থাকলাম, রঞ্জুপ্রসাদ, রঞ্জুপ্রসাদ, রঞ্জুপ্রসাদ! কিন্তু নামটা কখনও কারও মুখে শুনেছি এমন মনে হল না। উনি কি আমার বাবার বন্ধু বা পরিচিত কেউ, কিংবা লতায়-পাতায় কোনও আত্মীয়তা আছে আমাদের সঙ্গে? নইলে আমার ভালর জন্যে ওঁর এত মাথাব্যথা কিসের? তবে এটাও ঠিক, উনি আমাকে চেনেন, নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর সবই ওঁর জানা। এই ধাঁধার উত্তর আমার কাছে আপাতত অজানাই থেকে গেল। কিন্তু মনের ভেতর একটা অদ্ভুত আলোড়ন টের পাচ্ছিলাম। রঞ্জুপ্রসাদ যে ক্রমশ আমাকে টানছেন তাতে সন্দেহ নেই। ভাগ্য কিংবা ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই, কোনওদিন ছিলও না। তাই সে জন্যে নয়। অন্য একটা ব্যাপার আমাকে উত্তেজিত আর অস্থির করে তুলছিল। আমার স্বভাবটাই এরকম, একগুঁয়ে, অদ্ভুত, কারও সঙ্গে মেলে না। রঞ্জুপ্রসাদের ঘটনাটাকে ঘিরে একটা অজানা রহস্য, একটা ছমছমে শিহরণ যে বিপজ্জনক অ্যাডভেঞ্চারের মত হাতছানি দিতে শুরু করেছে, তাতে কোনও ভুল নেই। দু-চারজন মানুষ এরকম থাকে, সুখে থাকতে যাদের ভূতে কিলোয়, নাকে দড়ি দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়, কিছুতেই ঘরে থাকতে দেয় না।

খাট থেকে নেমে জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে রঞ্জুপ্রসাদের চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার নিজেকে নিয়ে পড়লাম। সন্ধেবেলার এই ঘটনার পর থেকে কেন যে আর বিন্দুবিসর্গও আমার মনে পড়ছে না, কে জানে! পার্ক স্ট্রিটের বার-এ আমার খুব নেশা হয়েছিল এটা ঠিক। তবে মাতলামি

করেছিলাম কিনা জানি না। ওই অবস্থায় পথে বেরিয়ে নিজের চেষ্টায় ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফেরার ক্ষমতা ছিল না, এটাই স্বাভাবিক। তবে এটাও তো ঘটনা যে, আমি ঠিকঠাক বাড়ি ফিরেছি, চাবি দিয়ে দরজা খুলেছি, তারপর নির্দিষ্ট ঘরে নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়তেও ভুল করিনি। যদি কেউ আমাকে বাড়ির সামনে এনে ছেড়ে দিয়েও গিয়ে থাকে, তারপর আমি নিজে নিজেই সব করেছি। আমার ট্রাউজার্সের পকেটে সদরের চাবিটা রয়েছে, হিপ পকেটে পার্স, পার্সের ভেতরে এক গোছা টাকা, কেউ লুটে-মুটে নিযে যায়নি। হাতঘড়ি আর হীরের আংটিটা অনায়াসেই হাপিস হয়ে যেতে পারত। যায়নি। আসল ঘটনাটা কি হয়েছিল, সুবলদা থাকলে জানা যেত। কিন্তু সে আজ সন্ধে থেকেই বাড়ি নেই, টালাপার্কে গেছে, সেখানে আজ সারারাত যাত্রা হবে। ছেলেবেলা থেকেই সুবলদার এই একটি মাত্র নেশা। গাঁযের মানুষ। হবেই। আমরা সবাই এ নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করি, আবার প্রশ্রয়ও দিই। খাবার গরম রাখার পাত্রে, রেঁধেবেড়ে পরিপাটি করে রেখে গেছে আমার জন্যে। এ-বাড়িতে এখন আমরাই তো দুটি প্রাণী, আমি আর সুবলদা, বাবার আমলের কাজের লোক। এসেছিল বালক বয়সে, এখন চারের কোঠায়। তিন কুলশূন্যি মানুষ, এখন এই পরিবারের একজন হযে গেছে। ও বাইরে থেকে ঘরে এসেছে, আর আমি ঘরের ছেলে হয়েও বাইবের মানুষ হযে গেছি। জন্ম থেকেই বোহেমিযান, বংশের বয়ে যাওয়া, বাড়ি-পালানো ছেলে। আটঘাটের জল খেয়ে মানুষ কিংবা অমানুষ। পনের-ষোল বছর পরে ফিরে এসেছি।

কত ঘটনা ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। বাবা গত হযেছেন। মেজ আর ছোট দিল্লিতে। একজন চাকরি, অন্যজন ব্যবসা হাঁকিয়ে বসেছে। যৌথ উদ্যোগে ব্যবসা, বাড়ি হয়েছে, গাডি হয়েছে, খুব রমরমা। আমি তো খরচের খাতায় চলে গিয়েছিলাম, সবাই ধরেই নিয়েছিল বেঁচে নেই। বাবা মরবার সময় বিচক্ষণতার পরিচয দিয়েও গেছেন। কলকাতাব বাড়িটা মেজ আর ছোটকেই লিখে-পড়ে দিয়ে গেছেন। আমার নামের উল্লেখ পর্যন্ত তাঁর উইলে নেই। মা আর এক বিধবা পিসি তাঁর মেয়েকে নিযে বেশ দাপটের সঙ্গেই কলকাতার বাড়ি আগলাচ্ছিলেন। বাড়িতে পুরুষ বলতে, বলা বাহুল্য, ওই সুবলদা। ছোটর শ্বশুরমশাই কাছেই থাকেন, তিনি নিয়মিত এসে খোঁজখবর নিয়ে যেতেন। আমি বেমক্কা এসে পড়ায়, সুবলদা ছাড়া কে কতটা খুশি হয়েছিল জানি না, তবে ভূত দেখার মত চমকে গিয়েছিল সেটা বুঝতে পারি। আমি আসার পরে পরেই পিসতুতো বোনটি পি-এইচ ডি করে স্বামীর ঘর করতে চলে গেল। মেজ আর ছোট এসেছিল এই উপলক্ষে। বলল, যাক, দাদা এসে গেছে ভালই হয়েছে,

বাড়িটা আর বিক্রি করতে হল না, কলকাতার আস্তানা হিসেবে এটা আমরা রেখেই দেব ভাবছি। বরং তোমরা চলো, এই সুযোগে বছর খানেক কাটিয়ে আসবে আমাদের ওখানে।

মা আর পিসিকে নিয়ে যাবার আসল কারণটা পরে জেনেছি। ওখানে মেজ আর ছোটর দুই বউ বাচ্চা নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে। তাদের একটু বড় করে তোলা দরকার। সেই থেকে আমি এ-বাড়ির কেয়ারটেকার, বিনা মাইনের মুশকিল আসান।

তা আজকের কথাই বা বলি কেন! ছেলেবেলা থেকেই আমি একটু ছাড়া-ছাড়া ভাবে মানুষ। খুব যে অনাদর অবহেলায় বড় হয়েছি তা নয়, তবে আমার প্রতি মা-বাবা কারুরই সেই টানটা ছিল না। ভাইদের থেকে আমাকে যে একটু পৃথক চোখে দেখা হত, সেটুকু আমার শিশুবুদ্ধিতেও বুঝতে পারতাম। প্রথম সন্তানের প্রতি মায়ের যে একটা বাড়তি পক্ষপাত থাকে, অন্ধ স্নেহ, সে আমার ভাগ্যে জোটেনি।

আমি নিজেও কি নিজের প্রতি সঠিক ব্যবহার করেছি? ভেবে দেখলে আমার গোটা জীবনটাই কেমন পরিকল্পনাহীন, বিশৃঙ্খল খামখেয়ালে ভরা। অথচ ছাত্র হিসেবে আমি কিছু খারাপ ছিলাম না। ওদের তুলনায় রীতিমত মেধাবীই ছিলাম। হয়তো কিছুটা অস্থির, অমনোযোগী। কিন্তু নামমাত্র পড়াশোনা করেও পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর তুলেছি। তবে তখন কি আর জানতাম, আমার রক্তের ভেতরেই বাসা বেঁধে আছে আমার নিয়তি! সে আমাকে কোথাও থিতু হয়ে দাঁড়াতে দেবে না, কেবলই ফুসলে নিয়ে ছুটে বেড়াবে। বি এস-সি পাস করে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলাম, হল না। বছর দুই পড়ার পর এক নষ্ট চরিত্রের ডাক্তারকে বেধড়ক ঠেঙিয়ে কলকাতা থেকে উধাও হয়ে যাই। আমার নামে তখন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঝুলছে। পুলিশ এসে বাড়িতে হানা দিচ্ছে যখন তখন। সত্যি বলতে কি, আমি ফেরার হয়েছিলাম বাবার ভয়ে। তাঁর মত আদর্শবাদী আর রাশভারী মানুষ যে আমাকে কখনও ক্ষমা করবেন না, এ আমি জানতাম। কিছুদিন কলকাতার আনাচে-কানাচে গা ঢাকা দিয়ে থেকে সোজা চলে গিয়েছিলাম বম্বেতে। পেটের দায়ে ওই অঞ্চল জুড়ে কত বিচিত্র জীবিকাই না নিতে হয়েছে! মোটর গ্যারেজে কাজ করেছি, ট্যাক্সি চালিয়েছি, ছেলে পড়িয়েছি। স্টুডিয়োতেও কাজ করেছি অনেকদিন। সে সময় এক গুণী ওস্তাদের কাছে ফটোগ্রাফিতে আমার হাতেখড়ি হয়। তারপর ছোটখাটো রকমারি ব্যবসায় নিজের দৌড় পরীক্ষা করে পাততাড়ি গুটোলাম। এক ইন্টারন্যাশনাল সার্কাস পার্টির সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরে চলে আসি কলকাতায়। এখানে শো করতে এসে হঠাৎ একটা ঘটনায়

মন ফিরে যায়। সেই থেকে ঘরের ছেলে আবার ঘরে। আর ছোটাছুটি ভেসে বেড়ানো নয়। এখন আমার সেই বয়স যখন মানুষ নোঙর ফেলতে চায়। আমিও সেভাবেই থিতু হয়েছি। হাতে কিছু নিজস্ব পুঁজি জমেছে। আমি তাতেই সন্তুষ্ট। বাড়ি আগলাই আর নিজের নেশা নিয়ে বিভোর হয়ে থাকি। নেশা বলতে কলম আর ক্যামেরা। ফটোগ্রাফিতে, বিশেষ করে পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফিতে আমার ইতিমধ্যেই যথেষ্ট নাম হয়েছে। ফ্রিল্যান্স কনট্রিবিউটার। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কভার স্টোরি জোগান দিই। সম্প্রতি পারিবারিক রত্নাবলী আর মূর্তিমালার ইতিহাস নিয়ে একটা বই লিখছি। তার জন্যে খবরের কাগজ আর পুঁথিপত্র বিস্তর ঘাঁটতে হচ্ছে। লুপ্ত ইতিহাস আর প্রত্নবস্তুর সন্ধান—এ এক হিসেবে গবেষণামূলক গোয়েন্দাগিরিই বলা যায়। হাতবদলের রোমহর্ষক ইতিহাস খুঁড়তে গিয়ে অনেক কলঙ্ক, কিংবদন্তী, রক্তপাত আর উত্থানপতনের অবিশ্বাস্য ঘটনা বেরিয়ে আসছে চোখের সামনে।

বাইরের পোশাক ছেড়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিতে নিতেই টের পেয়েছিলাম, পেটের মধ্যে আগুন জ্বলছে। খেতে বসব, তার আগে অচেতন অবস্থায় সদরটা ঠিকমত বন্ধ করেছিলাম কিনা দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে প্যাসেজ দিয়ে ডাইনিং স্পেসে আসতে গিয়েই চমকে উঠলাম। পাশের ঘরের দরজা হাঁ করে আছে, তালা খোলা। সুইচ টিপে আলো জ্বালতেই আমার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল। ঘরের মেঝে ছড়ানো কাগজপত্রে কুরুক্ষেত্র হয়ে আছে। আলমারি, ওয়ার্ডরোব, টেবিলের ড্রয়ার সব হাট করে খোলা। কেউ তন্নতন্ন করে সব হাঁটকেছে। কি খুঁজেছে, কি নিয়েছে, এই মুহূর্তে ধরা সম্ভব নয়। তবে লুকোনো চাবির গোছা যে বা যারা অনায়াসে খুঁজে বের করে নিতে পারে তারা সাধারণ চোর নয়। আমি হতবাক হয়ে লণ্ডভণ্ড করে রেখে-যাওয়া ঘরের চারপাশে আহত দৃষ্টিতে দেখছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল আমার দামী ক্যামেরাটা খোলা অবস্থায় সোফার ওপরে পড়ে আছে।

এতটা দক্ষিণেও কলকাতা এখন দ্রুত বাড়ছে। এক-দেড় দশকেই তামাম চেহারা উল্টেপাল্টে যেন অচেনা হয়ে গেছে। ফাঁকা জমি, পোড়ো জমিতে টান পড়েছে। এলোপাথাড়ি দালান-কোঠা বসে গেছে গায়ে গায়ে। বাস্তুবাগীশ শহরতলী দেখলে জনস্ফীতির বহরটা বোঝা যায়। এই নিরাপত্তাহীন অনিশ্চিত জীবনে মানুষের কাছে এখন আগে মাথা বাঁচাও, পরে পেট। সব ঠাঁই ঘাড়ধাক্কা খেতে খেতে বাঙালি সার বুঝেছে—আগে নাস্তা না, আস্তানা। আগে মাথা গোঁজার আশ্রয়।

অতনুর ঝাপসা স্মৃতিটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল। চেনা মানুষকে অচেনা চেহারায় যেমন লাগে। আদলের আলেয়ায় থমকে দাঁড়াতে হয়। শেয়ালদা পাড়ার এক বিখ্যাত রাস্তার সঙ্গেই এখন এর কিছুটা তুলনা চলে। তবে সার্পেন্টাইনের বদলে ইনস্টেটাইন নামটা জুড়লেই বোধহয় এই রাস্তার চালচরিত্তির সঠিক বোঝানো যায়। প্রকাণ্ড সাপের মত এঁকেবেঁকে কুণ্ডলী পাকিয়ে তামাম পল্লীটাকে শেষ পর্যন্ত এস্পার-ওস্পার, যাকে বলে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে। এক মাথায় ছোট্ট একট লেক, আসলে ঝিল, যে-নামেই ডাকা যাক ঠিক পাকস্থলীর আকৃতি। তার গা বেয়ে ভেতরে নেমে গেছে এই পথটা, স্টমাকের রানওয়ের মত, লার্জ অ্যান্ড স্মল ইনটেসটাইন যেন। যাকে বলা যায় জিগজাগ হুজমিকল, বাসিন্দেদের তো গিলেই বসে আছে, নতুন কেউ ঢুকলেও তার পক্ষে বেরোনো শক্ত। বুঝি গিলতে গিলতে হজম করে ফেলবে রাস্তাটা। খানিক দূর এগোনোর পরেই কেমন খটকা লাগে, মনে হয় এটা ব্লাইন্ড লেন, যে কোনও বাড়ির গায়ে মাথা ঠুকে বুঝি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু না। বাঁক ঘুরে, নিজের তৈরি জট ছাড়িয়ে ঠিকই বেরিয়ে আসে আবার। নামে ঝিল রোড, কিন্তু আসলে গলি, কোথাও কোথাও ঠিক গলিও নয়। দুটো হাত-রিকশা মুখোমুখি পড়লে পরস্পরকে সমীহ-সামাল করে কাঁকাল বেঁকিয়ে পেরিয়ে যেতে পারবে হয়তো।

অতনু অবশ্য অতশত কথা ভাবছিল না। এ রাস্তায় কিছুটা এগিয়েই তার মনে হয়েছিল এখানে আজ কিছু গণ্ডগোল আছে। হাওয়াটা যেন ভারী, রুদ্ধশ্বাস, থমথমে। এখানে ওখানে ছুটকো জটলা দানা বেঁধে আছে। কিছু একটা কাণ্ড হয় ঘটে গেছে, নয়তো ঘটতে যাচ্ছে। কলকাতার পরেশনাথের মিছিল কিংবা মহরমের বাদ্যি কানে আসতেই যেমন তস্য-তস্য গলির মুখে, ছাদের আলসেয় কৌতূহলী মুখের অপেক্ষা আর উঁকিঝুঁকি শুরু হয়ে যায়। হয়তো তার থেকে একটু বেশিই, একটা চাপা আতঙ্কও টের পাওয়া যাচ্ছে। নেতামহলের বয়ানে কলকাতা শহর অন্য রাজ্যের তুলনায় খুনখারাপিতে পিছিয়ে থাকলেও ঘটনা কিন্তু অন্যরকম। দল-উপদলের বদলা আর ফিরতি বদলায় লাশ ফেলা লাশ তোলার ঘটনা আকচাব ঘটছে। প্রকাশ্য দিবালোকে, ঠাণ্ডা মাথায়। হিন্দি ফিলিমের সুবাদে বাঙালির অন্তঃপুরের কাছেও এসব এখন জলভাত। কাগজে গোনাগুনতি দু-চারটে খবর বেরোয় বড়জোর।

সে এ-পাড়ায় নতুন মানুষ, কৌতূহল প্রকাশ না করে দ্রুত পা চালিয়ে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। অতনু সতর্ক হয়েই জোর কদমে হাঁটা দিয়েছিল। একটা বাঁক পেরিয়ে যাবার মুখে বাই লেনে ঢুকে নিজের ভুল বুঝতে পেরে যখন

ফিরে আসছিল, ঠিক তখনই সেই বিকট ঝোড়ো শব্দটা তার কানে এল। ব্যাপারখানা কী তা আঁচ করার জন্যে থেমে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে। কিন্তু ভাল করে কিছু বোঝার আগেই বাঁকের মুখ থেকে কী যেন হুড়মুড় করে একেবারে তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল। অতনু এক ঝটকায় ভল্ট খেয়ে নিজেকে একপাশে সরিয়ে নিতে পেরেছিল তাই রক্ষা, নইলে পাগলাগতিতে ছুটে আসা সাইকেলের ধাক্কাটা সরাসরি বুকে এসে লাগত। আর সেখানেই বিপদ শেষ হত না, সাইকেলের পিছু ধাওয়া করে আসা মোটরবাইক বুনো মোষের মত শিং বাঁকিয়ে তেড়েফুঁড়ে আসছিল প্রায় গায়ে গায়েই। এবং তারও পিছনে মূর্তিমান ঝড়ের মত যেন সব ঝেঁটিয়ে নিয়ে আসছিল এক রাগী অ্যামবাসাডার। অতনু প্রায় ঘোরের মধ্যে দেওয়ালে পিঠ ঠেসে সিনেমার পোস্টারের মত সেঁটে না দাঁড়ালে শার্টটা তো ফর্দাফাই হতই, গায়ের ছালবাকলও কোন-না ঘষটে তুলে নিয়ে যেত ওই গাড়ি! বলতে গেলে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুঠোর ভেতর থেকে ফসকে বেরিয়ে আসা যাকে বলে। অতনুর মুখময় বিনবিন করে হিমেল ঘামের বিন্দু ফুটছিল।

ধুলো, ধোঁয়া আর শব্দের ঘূর্ণি তুলে গাড়িগুলো বেরিয়ে যাবার মুখে রাস্তার কলের লাইনে গোটা দুই-তিন প্লাস্টিকের বালতিতে যেন পেনাল্টি কিক্ ঝেড়ে গেল। ফুটবলের মতই সেগুলো ছিটকে ঢুকে গেল পাশের বস্তির ভেতর। একটা মুরগি পিং-পং বলের সাইজের ছানার পাল আগলে চরে বেড়াচ্ছিল ওপাশের রাস্তায়। গলাফাটা চিৎকার ছুঁড়ে মা পাখিটা উড়ন্ত চাকির মত পাখা ঝাপটে দিয়ে পড়ল এক দোকান ঘরের চালায়। সে কোনও গতিকে বেঁচে গেল কিন্তু গণ্ডাখানেক ক্ষুদে বাচ্চার ফাঁড়া আর কাটল না, রক্তের ড্যালা হয়ে থেঁতলে গেল মাটির সঙ্গে।

আড়ষ্ট দাঁড়িয়ে থাকা অতনুর গায়ের পাশে কে যেন তেতো গলায় কথা বলে উঠল, 'নাহ্, এ এক মহাজ্বালা হল দেখছি, রোজ-দিন এই উটকো উৎপাত কাঁহাতক ভাল্লাগে, মশাই!'

চমকে পিছন দিকে ঘাড় ফেরাতেই বক্তাকে দেখতে পেয়ে গেল অতনু। হাত দুই তফাতে ঘরের দরজা আধখানা খুলে জুলজুলে চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে একটি লোক। বছর পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ বয়স। টাঙ্গির মত ঝুল জুলফি আর ঠোঁটের কোণ ছুঁয়ে নেমে আসা শুঁয়োপোকার ধরনে পুরুষ্টু একজোড়া গোঁফ।

'কোথায় লেগেছে বলুন তো? সিরিয়াস ইঞ্জুরি?' লোকটির গলায় উদ্বিগ্ন সহানুভূতি, 'ফার্স্ট এড দরকার হলে বলুন, এভরিথিং ঘরে আছে।'

অস্বস্তি চেপে অতনু বলল, 'আজ্ঞে তার দরকার হবে না। অল্পের জন্যে এ যাত্রা—'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান মশাই, এখনই বলবেন না। উত্তেজনার মুখে বোঝা যায় না, থিতিয়ে গেলে টের পাবেন। ওই তো কনুইয়ের কাছে রক্ত দেখছি।'

অতনু তাকিয়ে দেখল, দেওয়ালের একটা ভাঙা ইটে ঘষা খেয়ে কনুইয়ের নিচে সামান্য কেটে গিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরিয়েছে। অতনু হাসল, 'ও কিছু না, একটু ছড়ে গেছে।'

'আরে করেন কি! একটু দাঁড়িয়ে যান, ওরা এক্ষুণি আবার ফিরে আসবে।'

যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও থমকে গেল অতনু। একটু অবাক হয়ে বলল, 'ফিরে আসবে! কী করে জানলেন?'

'কাল তো তাই এসেছিল। একবার নয়, বার কয়েক।' লোকটা বিজ্ঞের মত মাথা ঝাঁকাল।

অতনু পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বাঁকের দিকে তাকাল। বলা যায় না ওদিকের রাস্তাটা হয়তো আরও সরু হয়ে গেছে।

'বলেন কি, কালও হাঙ্গামা হয়েছিল?' গলায় তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি ফুটিয়ে প্রশ্ন করল, 'তা গপ্পোটা কি মশাই?'

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, 'সে আমি কি করে বলব!'

'এই একই দল?'

'তাছাড়া কি! কালো কাচের জানলার সাদা গাড়িটা দেখলেন তো, পিকিউলিয়ার নম্বর, নয় ছয় নয় ছয়—ওটাই তো ছিল। মিসেসের মুখে শুনেছি তিনটে মোটরবাইক পটকা ছুঁড়তে ছুঁড়তে গাড়িটাকে তাড়া করে সারা পাড়া ঘুরেছে। আসুন, ভেতরে আসুন সব বলছি।' দরজাটা পুরো খুলে ধরে লোকটা অতনুর জন্যে জায়গা করে দিল।

আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে অতনু দেখল সে অনেক অ্যাডভান্স এসে গেছে। হাতে বেশ কিছুটা উদ্বৃত্ত সময় যখন আছে তখন একটু বসে গেলে মন্দ হবে না, বিশেষ করে লোকটা এই ঝিল রোডের বাসিন্দা। এর কাছ থেকে কিছু খবরাখবর জেনে নেওয়া যাবে। তবে স্বস্তির ব্যাপার এই, আজকের হাঙ্গামা যা নিয়েই ঘটুক, রঞ্জুপ্রসাদ তার লক্ষ্য নয়, তার কোনও বিপদ ঘটেনি। এটা কালকের কোনও ঘটনারই জের চলেছে। পলকে এই কথাগুলো ভেবে নিয়ে অতনু সৌজন্যের হাসি হাসল, 'যা বলেছেন, একটু বসেই যাই তাহলে।'

ঘরটা বৈঠকখানা বাড়ির বাইরের ঘর। বাটিক প্রিন্টের শাড়িমার্কা লুঙ্গির ওপর একটা হাফ-পাঞ্জাবি চড়ানোয় একেবারে অবতারের মত দেখাচ্ছিল লোকটাকে। ঘরে নিয়ে গিয়ে খুব সমাদর করে বসাতে বসাতে বলল, 'ভেরি স্যরি স্যার।

চা খাওয়াতে পারছি না কিন্তু। ছুটির দিন, ছেলেমেয়েকে নিয়ে মিসেস বাপের বাড়ি দৌড়েছেন। এদিকে চায়ের পাতা যে ফুরিয়েছে খেয়ালই নেই। বানাতে গিয়ে বেকুব হলাম। কাজের মেয়েলোকটাও আবার এই ডামাডোলে বেমালুম ডুব মেরে বসে আছে। তাই তো জামাটা গলিয়ে চা খেতে বেরোচ্ছিলাম। যাঁহা দরজাটি খুলেছি...ওঃ! মশাই, আপনি ন্যারোলি এসকেপ করেছেন। আমি হলে স্যার মরেই যেতাম।' নিজের বাতাবি সাইজের ভুঁড়িটির ওপর মমতার সঙ্গে হাত বুলোতে থাকল।

অতনু দুঃখ প্রকাশ করে বলল, 'ইস, দেখুন দেখি, আপনার চায়ে ব্যাঘাত ঘটালাম, ছি ছি!'

'কে বলেছে, আমিই তো বেবোলাম না। এইসব বিপজ্জনক খেলাধুলোর মধ্যে আমি নেই! আসল কথা কি জানেন, কাল আগে থেকে খবর ছিল, লোকে জানত। আজ আচমকা সারপ্রাইজ বলতে পারেন। আমি, মানে আমরা অন্তত জানতাম না। তবে ব্যাপার হল জানান দিয়ে এসব করতে গেলে ঝুঁকি নিতে হয়। আজকাল, কি বলব, পাবলিক বড্ড হামলে পড়ে।'

শেষ কথাটায় খটকা লাগল অতনুর। বলল, 'ঠিক বুঝলাম না। পাবলিক হামলে পড়ে কেন?'

'কেন পড়বে না তা বলুন! টিভি ক্যামেরা বলে কথা! এক ঝলক ক্যাচ করলেই রাতারাতি ফেমাস। মিসেস বলছিল—'

'মাই গুডনেস। এটা কি তবে শূটিং হচ্ছিল? টিভি কোম্পানির শূটিং?' অতনু আকাশ থেকে পড়ে।

'তবে আর বলছি কি! মিসেস বলছিল, তেরো পর্বের সিরিযাল হবে। দুর্দান্ত রহস্য কাহিনী। কাল ঢালাও ছবি নিয়েছে। এ-গলির অনেকেই খুব খুশি।'

'দেখুন কাণ্ড!' অতনু হেসে ফেলল, 'আমি ভেবেছিলাম পলিটিক্যাল আকচা-আকচি, স্ট্রিট ড্রামা, দু-চারটে খুন-জখম। ঠিক জানেন, তা নয়?'

'না, মশাই, এ-পাড়ায় ওসব নেই। পাড়াটা পাঁচমেশালি হতে পারে কিন্তু খুব ঠাণ্ডা। কখনও মশাই খবরের কাগজের হেডিং হয়নি।' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে খুলে বাড়িয়ে ধরল, 'নিন একটা। আপনি পাড়ায় নতুন এসেছেন বুঝতে পারছি। কোন বাড়ি? কত নম্বর?'

এরকম প্রশ্নের জন্যে অতনু তৈরি ছিল না। ভদ্রলোকের হাত থেকে সিগারেট আর আগুন নিতে নিতে একটু সময় নিল, 'থাকি না, বেড়াতে এসেছি। খুব ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে এ-পাড়ায় আসতুম। এতকাল পরে সেই স্মৃতি ঝালাতে এসেছি। ঝাপসা মনে পড়ছে, এদিকে কোথায় যেন একটা অদ্ভুত নামের বাড়ি

ছিল, কাছে এলেই বাবা মজা করে বলত, কই আজ নমো করলে না! আসলে বাড়িটার নাম ছিল 'শেষ প্রণাম'। এখনও মনে আছে।'

'প্রণাম না, নমস্কার, 'শেষ নমস্কার'। এক বিখ্যাত বাংলা উপন্যাসের নামে নাম। আর 'ছিল' কথাটাও ঠিক না, 'আছে'। আপনি যেদিকে যাচ্ছিলেন, আরও মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই দেখতে পাবেন একটা জরাজীর্ণ দোতলা বাড়ি এখনও দাঁড়িয়ে আছে, নাম 'শেষ নমস্কার'। এরকম নাম কেন জানেন? ওটাই তখন ছিল এ-রাস্তার শেষ বাড়ি, তারপর জলাজঙ্গল ফসলের ক্ষেত।'

অতনু খুশি হল, লোকটি কত সহজেই লাইনে চলে এসেছে। এবার আর এক ধাপ এগোতে হবে। কয়েক সেকেন্ড কপালে হাত রেখে চোখ বন্ধ করে বসে থেকে হঠাৎ আবেগ-কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'দারুণ, মশাই, দারুণ। আপনি আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। আমি এবার দেখতে পাচ্ছি, আপনার মেমারির ছোঁয়া লেগে আমার ছেলেবেলার আরও কিছু কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার যেন মনে হচ্ছে, ওই পুরনো বাড়িটাতেই আমরা যেতাম। ওখানে—'

'বাড়িটা পুরনো ছিল না, তখনকার হাল ফ্যাশানের, আনকোরা নতুন।'

অতনু হোঁচট সামলে নিয়ে বলল, 'তা হবে, সেটা মনে পড়ছে না, তবে ওখানে বোধহয় বাবার এক বন্ধু কিংবা পরিচিত কেউ থাকতেন। আমরাও বোধহয় কাছেভিতেই কোথাও থাকতাম। তাই বাবার হাত ধরে প্রায়ই....ওহো, মনে পড়েছে, ভদ্রলোকের নাম ছিল গঙ্গুপ্রসাদ না মঞ্জুপ্রসাদ কি যেন! চেহারাটা ধোয়ামোছা, কোনও ছবি নেই। তবে বেঁচে থাকলে আজ তার বয়স হয়েছে। চেনেন কাউকে?' এক দমে কথাগুলো বলে নিয়ে অতনু তাকাল ওঁর মুখের দিকে।

এক হাতের মুঠোয় সিগারেট, দাঁতে অন্য হাতের নখ কাটতে কাটতে লোকটি কেমন সন্দিগ্ধ চোখে অতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। অন্যমনস্ক, তাও হতে পারে। হাতের মুঠোয় সশব্দে একটা কলকে-টান চড়িয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মাথা নাড়ছিল লোকটি। একটু থেমে থেকে বলল, 'না, আপনি ঠিক বলছেন না।'

'কেন, আমি ভুল বলেছি?'

'হ্যাঁ, গুলিয়ে ফেলছেন। মঞ্জু গঞ্জু কোনও প্রসাদই ও বাড়িতে কখনও ছিল না, এখনও নেই। থাকলে আমি জানতাম।'

চিন্তিত অতনু কথা ঘোরাবার জন্যে বলে উঠল, 'কিন্তু আপনার রেসুড়ে পার্টি কই এখনও তো ফিরল না!'

'রেসুড়ে' কথাটা শুনে শব্দ করে হেসে উঠল লোকটি, 'খাসা বলেছেন, ঠিক বলেছেন, রেসুড়ে! কাল সত্যিই জব্বর রেস হয়ে গেছে এখানে। বেশ ধুমধাম করেই। ওয়াইফ বলেছিলেন, বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে একজন নাকি উত্তেজনায় চলন্ত মোটরবাইকের ওপর উঠে দাঁড়াচ্ছিল থেকে থেকে। সার্কাসে দেখেছি এই খেলা। আচ্ছা, টিভি সিনেমায় তা দেখেছি ফাইট কম্পোজার আলাদা লোক থাকে, ভাড়াটে খেলোয়াড়দের দিয়ে ওসব করানো হয়?'

অতনু খোর্যাটে গলায় হাসল, 'তা হবে, আমি টিভি দেখি না, আর এই ধরনের বোমবাজিও চাক্ষুষ করার সৌভাগ্য কখনও হয়নি। তবে শখ করে কিছুদিন এক চিনেম্যানের কাছে হাত-পা ছোঁড়ার তালিম নিয়েছিলাম মনে আছে।'

লোকটির চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে গোল্লা পাকাল, 'ওরে গুরু। কুং ফু না ক্যারাটে বলে, তাই? আপনি তো ডেঞ্জারাস লোক মশাই।' তারিফেব গলায় লোকটা হেসে উঠল, 'আমার ছেলে আজ বাড়ি থাকলে আপনাকে তো পাগলা করে দিত। ওব ফার্স্ট কোশ্চেনই হত, নানচাক্কু জানো? হ্যাঁ মশাই, আপনাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করি, জিনিসটা কি? হান্টিং নাইফ গোছের কিছু? ছ বছরের ছেলের কাছে বেইজ্জত!'

লোকটা এমনিতেই বেশি কথা বলে, বলতে ভালবাসে। কিন্তু হঠাৎ যেন কথার তোড় বাচালতার পর্যায়ে পৌঁছেছে। অতনু সন্দেহের চোখে তাকাল। লোকটা তাকে নিয়ে ইয়ার্কি শুরু করল না তো? মুখ দেখে সেরকম অবশ্য মনে হল না। আর যদি করেই থাকে, অতনু ভাবল, তার বয়েই গেছে। সেও হাসতে হাসতে জবাব দিল, 'নানচাক্কু ইজ নো-চাক্কু! অন্য জিনিস। আপনার কোনও কম্মেই লাগবে না।' বলেই অতনু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

লোকটা অবাক, 'সে কি, এরই মধ্যে?'

'হ্যাঁ, এবার যাই। আপনাকে ধন্যবাদ।'

'আচ্ছা, আসুন। এদিকে এলে এই নিমাই ঘোষকে মনে রাখবেন, স্যার।'

রাস্তাটা এদিকে বেশ নির্জন, বাড়িঘর দূরে দূরে। কারখানা-টারখানা, স্ক্র্যাপ লোহার গোডাউন বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে বসেছে। কাচেব টুকরো বসানো, মানুষ-সমান উঁচু পাঁচিল। বরাবর হাঁটতে হাঁটতে কখন লোহার জংধরা ফটকটা এসে গিয়েছিল খেয়াল করেনি অতনু। ফটকের গা ছুঁয়ে মার্বল পাথরের ফলকটা নজরে ঠেকতেই দাঁড়িয়ে গেল। ধুলোময়লায় জীর্ণ অবস্থা, লেখাটা ভাল করে পড়া যায় না, ফোকলা দাঁতের মত দু-একটা অক্ষর মিসিং, তবু অতনু অনুমানে ধরে নিল শে...মস্কার। কথাটা আদিতে কি ছিল! দুটো অক্ষর পূরণ করে নিলে শেষ নমস্কার-ই তো দাঁড়ায়। এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকে দেখতে পাওয়া গেল না। দেউড়িতে দরোয়ান থাকবে অবশ্যই আশা করেনি, বাড়িটার সে

দিনকাল আর নেই। এখন পড়ন্তি দশা, বয়সের ভারে জবুথবু, কেমন নিঃসঙ্গ। ফটকের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বাড়ির সামনেটা। দশ-বারো গজ লম্বা মোরামের রাস্তাটা গিয়ে বাড়ির সদর ছুঁয়েছে। দু পাশে খানিকটা করে পোড়ো জমি, গাছে-অগাছে-কাঁটাগাছে ভর্তি বুনো বাগান।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল অতনু। হিসেবমত এখনও মিনিট আষ্টেক দেরি আছে। স্নায়ুর ওপর রীতিমত চাপ অনুভব করছিল এতক্ষণে। মনের ভেতরে এক ধরনের অস্থির উত্তেজনা। রহস্যের এত কাছে পৌঁছে অপেক্ষা করা সত্যিই কঠিন কাজ। মাত্রই কয়েক গজ তফাতে ওই বাড়ির দোতলার ঘরে প্রতিবন্ধী একটি মানুষ ঠিক এই মুহূর্তে তার জন্যে, কেবলমাত্র তারই জন্যে অনেক ঝুঁকি নিযে অপেক্ষা করে আছেন। রঞ্জুপ্রসাদের গোপন ঝাঁপিতে অপেক্ষা করে আছে তাকে চমকে দেবার মত এমন এক আশ্চর্য খবর যা নাকি তার ভাগ্য, তার ভবিষ্যৎ বদলে দেবে। কাল রাতে টেলিফোনে কেমন অস্বাভাবিক চাপা গলায় ভদ্রলোক কথা বলছিলেন মনে পড়ল। প্রথমে অতটা বুঝতে পারেনি কিন্তু ফোনটা রহস্যজনকভাবে কেটে যাবার পর যখন দেখল তার বাড়িতে ইতিমধ্যে কারা হানা দিয়ে সব কিছু লণ্ডভণ্ড তছনছ করে গেছে, তখন বুঝতে পারল এই ব্যাপারের সঙ্গে নির্ঘাত একটা যোগসূত্র আছে। মনে পড়ল ভদ্রলোকের গলায় যেন একটা চাপা উদ্বেগ আর ত্রাসের ছোঁয়াও ছিল। কাদের ভয় করেছিলেন তিনি? সে যারাই হোক, তাঁর আশঙ্কা কিন্তু অমূলক ছিল না। কারণ অতনুদের বাড়িতে যারা নিঃশব্দে তল্লাশী চালিয়ে গেছে তারা টাকাপয়সার লোভে আসেনি। মূল্যবান জিনিসপত্রও ছোঁয়নি।

কি কি জিনিস তারা নিয়ে গেছে এখনও ধবতে পারা যায়নি। আর একটু পরেই কি রঞ্জুপ্রসাদের আসল পরিচয়, সত্যি করে কে তিনি, জানতে পারা যাবে? একটু আগে নিমাই ঘোষ লোকটা কি তাকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল? নইলে কেন বলল মঞ্জু গঞ্জু কোনও প্রসাদই এ-বাড়িতে কখনও ছিল না এবং এখনও নাকি নেই। লোকটা কি এ ব্যাপারে তাহলে কিছু জানে? ও হয়তো চাইছিল যাতে সে বাড়িতে না ঢোকে, রঞ্জুপ্রসাদের সঙ্গে দেখা না করে! অবশ্য রঞ্জু নামটা সে ইচ্ছে করেই সঠিকভাবে উল্লেখ করেনি। কিন্তু তাতে কি আর ব্যাপারটা গোপন থাকল? কেমন সন্দিগ্ধ চোখে লোকটা অতনুর দিকে নইলে তাকিয়ে ছিল কেন? ভাবতে গিয়ে নিজের ওপর রাগ হল অতনুর। সত্যিই সে নির্বোধের মত কাজ করে ফেলেছে। রঞ্জুপ্রসাদ তো তাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন ব্যাপারটা অন্য কান না করতে।

ফটকের সামনে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে শেষ পর্যন্ত ফটক দিয়ে ভেতরে ঢুকেই পড়ল অতনু। নির্ধারিত সময়ের তখনও মিনিট তিনেক বাকি।

সদরের সামনে পৌঁছে নেমপ্লেট খুঁজতে গিয়ে দেখল হাতে লেখা এক টুকরো কাগজ দরজার সঙ্গে সাঁটা। পড়তে গিয়েই চমকে উঠল, যদিও নাম নেই তবু কথাগুলো রঞ্জুপ্রসাদ তার উদ্দেশেই লিখে রেখেছেন। 'দরজা খোলা আছে। যেমন বলেছি, সিঁড়ি দিয়ে চটপট আমার ঘরে। অপেক্ষা করছি।'

দরজা ঠেলতেই সিঁড়ি দেখতে পেল অতনু। সতর্ক নজরে একবার চারপাশ দেখে নিল সে। ধারে-কাছে কোথাও কেউ নেই দেখে নিশ্চিন্ত হল। তারপর যতদূর সম্ভব শব্দ বাঁচিয়ে দ্রুত পায়ে দোতলায় উঠে এল। বারান্দাটার এপাশে ওপাশে কাউকে দেখা গেল না। মুখোমুখি ঘরটা চিনতে অসুবিধে হল না, হলুদ সবুজ দু রঙা চৌখুপ্পি পর্দা ঝুলছে দরজার মাথা থেকে তলা পর্যন্ত। জানলাটাও টানটান পর্দায় ঢাকা। হঠাৎ ভেতরে বেশ জোরালো গমগমে গলার আওয়াজ পেয়ে চমকে গিয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারল টিভি চলছে, ঘরে রঙিন আলোর ঝলক কমছে বাড়ছে। টিভি-র পর্দার ওপর যাতে বাইরের আলো সরাসরি গিযে না পড়ে সেই জন্যেই পর্দাটর্দা টেনে দিনের বেলায়ও ঘরটাকে আলোআঁধারি করে রাখা হয়েছে।

বারান্দার মুখে অনর্থক দাঁড়িয়ে থেকে ঝুঁকি নেবার কোনও মানে হয় না। কেউ কোথাও এসে পড়ার আগেই অতনু তিন লাফে বারান্দা ক্রস করে একেবারে ঘরের দরজায়। পর্দা সরাতে দেখল যা ভেবেছিল তাই। কালার টিভির স্ক্রিনে বিজ্ঞাপনের রঙের ঝলক। অতনুব চোখ ধেঁধে গিয়েছিল। সামনে কাউকে দেখতে না পেয়ে প্রথমে ডাকতে গিয়েছিল কিন্তু তখনই রঞ্জুপ্রসাদের নির্দেশ মনে পড়ে যাওযায় সামলে নিল। এবং ঝটিতি ভেতরে পা বাড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গেই ভারী নরম কিছুর সঙ্গে পা বেধে গিযে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল অতনু। এতই অপ্রত্যাশিত এই পতন যে কিছু বুঝে ওঠার সময়টুকুও সে পেল না।

বাইরের রোদে ঝলমলে সকাল থেকে হঠাৎ পর্দাটানা ঘেরাটোপের মধ্যে ঢুকলে নজর ভোঁতা হয়ে যেতে বাধ্য। তার ওপর টিভি-র বিজ্ঞাপনের তাণ্ডব, ফুল ভল্যুমে রঙিন ঝলকানি অতনুকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে একেবারে অন্ধই করে দিয়েছিল। নইলে দরজা জুড়ে পড়ে-থাকা দেহটা তার চোখ এড়িয়ে যেতে পারত না। ভারসাম্য হারিয়ে সেই নিঃস্পন্দ মূর্তির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ষষ্ঠ চেতনা এক অজানা বিপদের আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। তার আসার একটু আগেই যে এ ঘরে একটা ভয়ঙ্কর নাটকের মহলা হয়ে গেছে এই অনুভূতি তার শরীরের প্রতিটি পেশীকে ইস্পাতের মত টানটান করে তুলল। দুই হাতের তালুতে ভর রেখে সে এক মোচড়ে নিজেকে ছিটকে সরিয়ে নিয়ে গেল মেঝের ওপর। আর তখনই টের পেল যে চটচটে তরল পদার্থে তার

দুটি হাত মাখামাখি হয়ে গেছে তা আর কিছু নয়, রক্ত! সামান্য ঘন হয়ে আসা তাজা খুন।

ঘরের আলোয় চোখ সয়ে এসেছিল এরই মধ্যে। চারপাশ এবার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। বেশ বড় আকারের ঘরখানার মধ্যে আসবাবপত্রের কোনও বাহুল্য ছিল না। ঘরের বাঁ দিকের দেওয়াল ঘেঁষে একটি ডিভান। তার মুখোমুখি অন্য প্রান্তে গুটি তিনেক চেয়ারে ঘেরা একটি টেবিল। দরজার বিপরীত দিকের দেওয়াল ছুঁয়ে ডালা খোলা টিভি ক্যাবিনেটের মধ্যে টিভি চলছে। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় ধূসর রঙের গদিমোড়া একটা সোফা। অতনু একটা হুইল চেয়ার দেখতে পাবে আশা করেছিল, এবং টেলিফোন। নেই। সে আর মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে-থাকা মানুষটি ছাড়া তৃতীয় কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না। মেঝের কার্পেটে হাত মুছে এক লাফে অতনু উঠে দাঁড়াল। পড়ে-থাকা মানুষটি যে রঞ্জুপ্রসাদ সে বিষয়ে তার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। সেদিকে তাকিয়ে এই প্রথম আবিষ্কার করল রঞ্জুপ্রসাদের বাঁ দিকের পিঠে চকচক করা জিনিসটা আসলে ছুরির বাঁট। আমূল বিঁধে থাকা ছুরিটা তাঁর হৃৎপিণ্ড এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে, সেটা অনুমান করা কিছু শক্ত নয়। নাঙ্গা মেঝের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে অসহায় ভঙ্গিতে তিনি পড়ে আছেন। তাঁর মুখটা ওপাশে ফেরানো, অতনু দেখতে পাচ্ছিল না। তাঁর বুকের তলা দিয়ে রক্তের ধারা দু পাশেই অনেকটা গড়িয়ে এসেছে। জুড়িয়ে সর পড়ার মত এখন বুঝি জমাট বাঁধার মুখে। বুকের ভেতর হিম করে আনা দৃশ্যটা অতনুকে কেমন বিমূঢ় আর অসাড় করে দিল। সাদা পাতলুন আর র-সিল্কের পাঞ্জাবি পরা রঞ্জুপ্রসাদের একমাথা ঠাস বুনোন চুল দিব্যি পরিপাটি করে আঁচড়ানো, একটু এলোমেলো হয়ে যায়নি, যেন চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে আঁকা ছবি। এই ছবির মধ্যে, পুরো দৃশ্যটার মধ্যেই কোথায় যেন কী একটা অসঙ্গতি আছে যা অতনু ধরতে পারছিল না। বলতে কী, নিজেকে তার কেমন বেহেড লাগছিল, থমকে থাকা মগজ একটুও বুঝি কাজ করছিল না। কার হাতে, কাদের হাতে রঞ্জুপ্রসাদের এই মর্মান্তিক পরিণতি? ছুরির বাঁটের চারপাশ ঘিরে এক চক্কর জায়গা লাল হয়ে আছে। অস্ত্রটা যদি নির্ভুল লক্ষ্যে ভেতরে ঢুকে গিয়ে থাকে তা হলে উনি চিৎকার দেবার সময়টুকুও পাননি, মৃত্যু প্রায় তৎক্ষণাৎ ঘটেছে। বেচারা রঞ্জুপ্রসাদ আর কোনওদিনই সেই মূল্যবান খবরটা অতনুকে শোনাতে পারবেন না, যে রহস্যকথা জানবার জন্যে তার এভাবে ছুটে আসা! কিন্তু যদি এমন হয় যে ছুরির ফলাটা এক চুলের জন্যে হার্ট ছুঁতে পারেনি, পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে? অনেকটা রক্তক্ষরণের ফলে মৃতপ্রায় ওই শরীরে এখনও প্রাণ রয়ে গেছে! নাড়ির ক্ষীণতম স্পন্দন, আবছা শ্বাস এখনও মুছে যায়নি! সম্বিত ফিরে পেয়ে অতনু প্রথমেই যা প্রয়োজন দেখতে পেয়ে গেল।

এক লাফে রঞ্জুপ্রসাদকে ডিঙিয়ে সে দরজার পাশে সুইচবোর্ডের সামনে চলে গেল। টিউবের আলোয় ঝলমল করে উঠল ঘরের ভেতরটা।

বিপদ যত অতর্কিতেই আসুক, আর যেদিক থেকেই আসুক, অতনুকে তা কোনও দিনই একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলতে পারেনি। দশ-বারো বছর যে ঘরের বাইরে হরেক আঁচে পোড় খেয়েছে, রোদে জলে হাওয়ায় সিজিন্ড হয়েছে, প্রতিকূল প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় যাকে খালি হাতে একা লড়তে হয়েছে, সে যে দমবার, হাল ছাড়বার পাত্র মোটেই নয়, এই মুহূর্তে সেটা আর একবার টের পাওয়া গেল। দ্রুত ছুটে গিয়ে টিভি বন্ধ করে আবার রঞ্জুপ্রসাদের কাছে ফিরে এল। যে কোনও উপায়ে ওঁকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। সাবধানে ছুরিটা আস্তে আস্তে টেনে খুলে ফেলতেই এক ঝলক রক্ত বেরিয়ে এল। রঞ্জুপ্রসাদের একটা হাত ওঁর বুকের তলায় চাপা পড়েছিল। সাবধানে পাশ ফিরিয়ে দিতে গিয়ে অতনু বুঝতে পারল লোকটা আর বেঁচে নেই, শরীর ঠাণ্ডা, হাত-পা শক্ত হতে শুরু করেছে যেন।

মনটা বেজায় খারাপ হয়ে গিয়েছিল তার। এটা তো কেবল মৃত্যু নয়, হত্যা। মার্ডার। আর তার জন্যে দায়ী পরোক্ষে হলেও, অতনু নিজে। অনিচ্ছায় আর অজ্ঞাতসারে হলেও। তার অতীতকে ঘিরেই এই ঘটনার উৎপত্তি! এইসব ভাবতে ভাবতে মৃতদেহটাকে পাশ ফেরাচ্ছিল সে। হঠাৎ মুখের দিকে নজর পড়তেই অবাক অতনু থমকে গেল। একটু আগের সেই ধরতে-না-পারা অসঙ্গতিটা এবার তার কাছে স্পষ্ট হল। টেলিফোনে গলা শুনে যে রঞ্জুপ্রসাদকে তার রীতিমত বয়স্ক আর হাঁপানির রোগী মনে হয়েছিল, পক্ককেশ এক বৃদ্ধের ছবি তার মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গিয়েছিল, তার সঙ্গে তো এর মিল নেই। বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের এই সুঠাম তরুণকে শ্বাসকষ্টে ভোগা কোনও প্রতিবন্ধী তো ভাবা যাচ্ছে না কিছুতেই। এ কি তবে রঞ্জুপ্রসাদ নয়? এ কি অন্য কেউ? টেলিফোনের কথাগুলো সত্যি হলে ধারে-কাছে অন্তত সেই হুইল চেয়ারটি দেখতে পাওয়া যেত। অতনু আর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশটা তল্লাশ করে দেখল। না, এ ঘরে কোথাও ওই বস্তুটি নেই। এবং টেলিফোন! সেটাও তো এ ঘরেই থাকা উচিত ছিল। টেবিল-চেয়ারগুলোর পেছনে একটা দরজা অবশ্য দেখা যাচ্ছিল। পর্দা টানা থাকায় এতদূর থেকে বোঝা যাচ্ছিল না যে সেটা ভেতরের ঘরে যাবার, নাকি অ্যাটাচ্ড্ বাথরুমের পথ! এ যদি রঞ্জুপ্রসাদ না হয়, তবে রঞ্জুপ্রসাদ লোকটি আসলে কে? নিহত লোকটার সঙ্গে কী তার সম্পর্ক? ধরা যাক, অন্য কেউ রঞ্জুপ্রসাদের বেনামীতে অতনুর সঙ্গে একটু রঙ্গ-তামাশা করতে চেয়েছিল। শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তাকে দৌড়ছুট করিয়ে মজা দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনাই প্রমাণ, ব্যাপারটা

অত লঘু ছিল না। একটা জলজ্যান্ত খুন, আর যাই হোক, ইয়ার্কি না। কঠিন বাস্তব।

এলোমেলো জট-পাকানো চিন্তার সূত্রটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল অতনুর। ভূত দেখার মত চমকে উঠল সে। নিহত তরুণটির মুখের দিকে তাকিয়ে তার চোখের পলক পড়া বন্ধ হয়ে গেল। এত বড় বিস্ময় তার জন্যে অপেক্ষা করে ছিল অথচ এতক্ষণ সে খেয়ালই করেনি! এ কাকে সে দেখছে! কপাল ছুঁয়ে ওঠা চুলের ঢেউ, ঘন ভুরু, নাক, ঠোঁট, চিবুকের খর ছাঁদ, কত কালের চেনা! নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল কোনও অদৃশ্য আয়নার মধ্যে নিজেকেই সে হুবহু দেখছে। মৃতদেহ থেকে বেরিয়ে এসে আত্মা বোধহয় এভাবেই নিজেকে দেখে। অতনুর সামনে ঠিক সেভাবেই আর এক অতনু রক্তাক্ত দেহে শুয়ে আছে। যন্ত্রণায় চোখের পাতা কোঁচকানো। আধখোলা ঠোঁটের কোণ বেঁকে আছে। নাটকীয় দুঃস্বপ্নের মত এই দৃশ্য বেশিক্ষণ সহ্য করা শক্ত। কাল বিকেলের কথাটা বিদ্যুতের চমকের মত অতনুর মাথার মধ্যে ফ্ল্যাশ দিল। শচীদুলালকে তখন ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। নৈহাটি জংশনে তাহলে খোয়াব দেখেনি শচী। সে কি একেই দেখেছিল?

বাসনকোসন কিছু একটা গড়িয়ে পড়ার ঝনঝন শব্দ হতেই অতনু তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। অন্যমনস্ক থাকায় শব্দের উৎসটা ঠিক ঠাওর করতে পারেনি। একবার মনে হল নিচের তলা থেকে শব্দটা এসেছে। কিংবা ভেতরের কোনও ঘর থেকে আসাও কিছু বিচিত্র না। দোতলার এই ফ্ল্যাটে তবে কি আরও মানুষ আছে? কথাটা মনে হতেই অতনুর গায়ে কাঁটা দিল। হত্যাকারী তবে কি গা ঢাকা দিয়ে এই বাড়ির মধ্যেই রয়ে গেছে এখনও? অতনু এসে পড়ায় পালিয়ে যেতে পারেনি এমন নয় তো! অতনুকে সে তাহলে প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছে। অথবা দোতলায় উঠে আসার অন্য কোনও পথ, লোহার ঘোরানো সিঁড়িটিড়ি কিছু আছে। সেই পথ দিয়ে কেউ উঠে এসেছে এইমাত্র। বাড়ির কাজের লোকও হতে পারে, আবার স্বয়ং খুনী হওয়াও অসম্ভব নয়। অপরাধী নাকি দ্বিতীয়বার তার অকুস্থলে ফিরে আসে কিছু চিহ্নটিহ্ন ফেলে গেছে কিনা দেখার জন্যে। উদ্বিগ্ন অতনু নিঃশব্দে পা টিপে টিপে ভেতরের দরজার দিকে এগোল। ব্যাপারটা অনুমানের ওপর ছেড়ে না দিয়ে নিজের চোখে দেখা দরকার। পর্দার পাশ থেকে উঁকি মারার আগেই নিজের কানের ভুল বুঝতে পেরে গেল। নিচের তলার ঘরে ঠুনঠুন আওয়াজ হচ্ছে, সাঁড়াশি নামিয়ে রাখার আওয়াজ, কেউ বোধহয় রুটি সেঁকছে। এক একটা বাড়িতে এরকম হয়, নিচের তলার শব্দ ওপরে উঠে আসে। টিভির আসর ভেঙে মেয়েরা বোধহয় এবার কাজে লেগে পড়েছে। ভেতরের ঘরে কেউ নেই দেখে বাথরুমে উঁকি দিল অতনু।

বেসিনের ওপরে ঝকঝকে আয়নাটায় তার নিজের চেহারা দেখে চমকে গেল, সাদা সোয়েটারের বুকের কাছটায় রক্তের ছিটে লেগে আছে। দাগটা জল দিয়ে ধোবার জন্যে পা বাড়াতে যাবে, এমন সময় একটা জিপগাড়ি থামার আওয়াজ শোনা গেল। কয়েক জোড়া ভারী বুট লাফিয়ে নামল মেটাল রাস্তার ওপর, কে যেন ভারী গলায় কাকে ডাকল। ভেতরের ঘরের খোলা জানলার দিকে দৌড়ে গেল অতনু। যা ভেবেছিল তাই। নিচের রাস্তায় পুলিশের জীপ। জনাচারেক কনস্টেবল গাড়ির পাশে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িযে। ওপবের দিকে আঙুল দেখিযে ইন্সপেক্টর তাদের কী বোঝাচ্ছেন। পর্দার ফাঁকে চোখ রেখে অতনু বুঝতে পারল, এখানকার খবর কেউ পুলিশের কাছে পৌঁছে দিযেছে। এবং পুলিশ ওপরে আসছে।

অতনুর মাথায় যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হল। পুলিশের বিচারবিধান এবং কাজের পদ্ধতি তার অজানা নয়। সেই বিপজ্জনক ছকের মধ্যে তার অবস্থা যে কতটা সঙ্গিন হয়ে উঠবে এটা সে পলকে বুঝতে পারল। সম্পূর্ণ অচেনা একটা বাড়িতে এভাবে ঢুকে পড়াটাই যথেষ্ট বেআইনি কাজ হয়েছে, তার ওপর সদ্য ঘটে যাওয়া একটা খুন—কোনও গপ্পো দিয়েই পুলিশকে ভোলানো যাবে না। এখন পালানো ছাড়া তার দ্বিতীয় কোনও রাস্তা নেই। কিন্তু অনেক দেরি হযে গেছে, সে পথও এতক্ষণে বন্ধ। ওরা বোধহয় ফটক দিয়ে ঢুকে পড়েছে। 'দ্বিতীয় কোনও রাস্তা' কথাটা মাথায় পাক খেযে গেল অতনুর। আবছা মনে পড়ল, বাথরুমে একটা ছোট দরজা সে দেখেছে। বাইরে থেকে জমাদার আসার জন্যে যেরকম থাকে। কিন্তু তার আগে তাকে একটা ছোট কাজ সারতে হবে। বাতাসের মত হালকা পাযে সে ছুটে গেল বাইরেব ঘরে। দরজাটা বন্ধ করতেই এসেছিল কিন্তু ভেবে দেখল সেটা মূর্খামি হবে, খুনীর পালাবার রাস্তাটা তক্ষুণি চোখে আঙুল দিযে দেখিয়ে দেওয়া হবে। তার চেয়ে ববং মৃতদেহটা নিয়ে ওরা প্রথমেই ব্যস্ত হয়ে পড়ুক, সেটাই তার বেশি কাজে আসবে। আগের মত টানটান করে পর্দা টেনে দিয়ে আলো নেভাল অতনু, তারপর মুহূর্ত দেরি না করে বাথরুমে।

বাথরুমের ছোট দরজাটা খুলতে গিয়ে অতনু বেশ ফাঁপরে পড়ে গেল। বহুকালের অব্যবহারে ছিটকিনিতে জং ধরেছে। কপাটটাও রোদে বেড়ে গিয়ে অনড় আঁট হয়ে বসে গেছে। খোলে কার সাধ্য! ওদিকে সদরে অনেক মানুষের গুঞ্জন ছাপিয়ে ভারী হালকা অনেক জোড়া জুতোর শব্দ ওপরে উঠে আসছিল। পিছন ফিরে দেখার সুযোগ ছিল না, শুধু কান খাড়া রেখে বোঝার চেষ্টা করছিল বুটের মসমস শব্দ বিপদসীমায় পৌঁছে গেছে কিনা। মুশকিল এই, দরজার পাল্লায় জোরে ধাক্কা দিলে সে শব্দ ওদের কান এড়াবে না। যত নিঃশব্দে সম্ভব দরজা

খুলে ফেলতে হবে। আর সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছিল। দারুণ স্নায়ুচাপের মধ্যেও অতনু হাল ছাড়েনি। শেষ পর্যন্ত পুলিশ যখন বারান্দা পেরিয়ে প্রায় ঘরের দরজায় ঠিক তখনই সিঁড়ির কপাট খুলে গেল।

বেড়ালের মত নিঃশব্দে লোহার ঘোরানো সিঁড়ির ধাপে পা রাখল অতনু। তারপর খুব আস্তে আস্তে দরজাটা ঠেসে বন্ধ করে দিয়ে একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল। এক পর্ব চুকল, নিশ্চিত ধরা পড়ার হাত থেকে কোনও গতিকে তো রেহাই পাওয়া গেছে, এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ-বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে যেতে পারলে তবেই নিশ্চিন্তি। সতর্ক দ্রুত চোখে চারপাশ দেখে নিল সে, না, কোনও জনমনুষ্য ধারে-কাছে নেই। পিছনের বাগান-জমি একটা বাঁক নিয়ে এই একটেরে অংশটায় এসে শেষ হয়েছে। ধুতরো আকন্দ বুনো কুল আর ছাতাপ্রমাণ পাতাগুলো, মানকচুর জঙ্গল ওর পায়ের নিচের জায়গাটাকে যেন খামচে ধরেছে। পারতপক্ষে এদিকে কেউ পা বাড়ায় না, আর তার দরকারও হয় না। দশ-বারো গজ তফাতে মান্ধাতার আমলের শ্যাওলা আর ফাটধরা বাউন্ডারি ওয়াল। সেটা ডিঙিয়ে যাওয়া অতনুর কাছে সামান্য ব্যাপার, শুধু সমস্যা একটাই, নিচের তলার কিচেন আর বাথরুমের জানলাগুলো খোলা রয়েছে। কেউ দেখে ফেললেই চেঁচাবে। কিন্তু এই মুহূর্তে এখন সাত-পাঁচ ভাববার সময় নেই। রক্তের ছোপলাগা সোয়েটার তাড়াতাড়ি গা থেকে খুলে ভাঁজ করে কাঁধে ফেলল।

ঝোপঝাড়ের ভেতর ঢুকে যতটা সম্ভব আড়াল দিয়ে নিচু হয়ে এগোচ্ছিল সে। তার কপাল ভাল, নিচের তলার সবাই বোধহয় বাড়ির সামনের দিকে ভিড় জমিয়েছে পুলিশের কাণ্ডকারখানা দেখতে। অতনু যখন প্রায় পাঁচিলের কাছে পৌঁছে গেছে, হঠাৎ তখনই পাশের ঝোপটা কেমন দুলে উঠল, সেই সঙ্গে একটা চাপা খসখস শব্দ। চমক খেয়ে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠেছিল তার। মানকচুর ঝোপের তলায় পাথর হয়ে বসে ব্যাপারটা দেখার জন্য ঘাড় ফেরাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। একটা বড়সড় আকারের বেজি, দুই বিন্দু জ্বলজ্বলে চোখে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। এখানে এই অসময়ে একটা দু-পেয়ে জীবের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে বেজিটা বোধহয় বিশ্বাস করতে পারছিল না। অতনুর ঠোঁটে এসে-যাওয়া হাসিটা মিলিয়ে যেতে দেরি হল না। কারণ সেই মুহূর্তেই সেই নির্ভুল শব্দটা কানে এসে পৌঁছাল। পাতার আড়ালে বসেই পিছন ফিরে দেখল দোতলার বাথরুমের দরজা খুলে গেছে। সেই ফাঁকা জায়গা ভরাট করে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের সাদা ইউনিফর্ম।

প্রায় এক যুগ পরে তনুকে আবার ফিরে পাবে ভাবতেই পারেনি শচী। পার্ক স্ট্রিটের মুখে ওকে দেখতে পাবার পর সত্যি বলতে কী মনস্থির করতে

পারেনি। থমকে দাঁড়িয়ে কয়েক লহমা ইতস্তত করেছিল। নৈহাটি স্টেশনের ঘটনাটা সে তখনও ভুলতে পারেনি। অপমানের জ্বালা আর জেদ একই সঙ্গে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত জেদের বশেই এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছিল ভাগ্যিস। নইলে চিরকালের জন্যেই ওর সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা আর যন্ত্রণা মনের মধ্যে থেকে যেত! ছেলেবেলার বন্ধুর কাছে তো মানুষ কোনও কিছু পাবার আশা নিয়ে যায় না। আসলে অন্য ধরনের একটা আনন্দে মন ভরে যায়। তনু জানে না, এই দশ-বারো বছরে বেশ কয়েকবার ওর বাড়িতে হানা দিয়েছে শচী। কিন্তু প্রতিবারই মন খারাপ করে ফিরে এসেছে। তনুর সঙ্গে তার বন্ধুত্বের চেহারাটা ছিল অন্যরকম। সে তনুকে আর পাঁচটা ছেলের সঙ্গে কখনই গুলিয়ে ফেলেনি। বন্ধু হিসেবে ওকে সে সমীহই করত। অথচ ওর বাড়ির লোককে প্রতিবারই কেমন যেন বিরক্ত আর উদাসীন মনে হয়েছে। নিরুদ্দেশ নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ছেলের জন্য ঘরেব লোক এমন নির্বিকার থাকতে পারে কখনও! যেন আপদ গেছে এরকম একটা ভাব। শচীর মন খারাপ ডবল হযে যেত এর ফলে। শেষবার যখন শুনল, তনু বেঁচে নেই, তখন চোখে জল এসে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু যাদের কাঁদবার কথা তারা নিরুত্তাপ ছিল, গলা কাঁপেনি। জীবনে অনেক ধাক্কা-খাওয়া মানুষ শচী, তবু তার কাছেও ক্ষতিটা অপূরণীয় মনে হযেছিল।

আজ সেই পুরনো কথা মনে পডছিল আর ভেতরটা খচখচ করছিল এই ভেবে যে কাল সন্ধে রাত্তিবে হলেও ওকে ওভাবে একা ছেড়ে দেওযা উচিত হযনি। তিন-চাব রাউন্ডেই যে ওর নক আউটের দশা হযেছে, নেশার জডতায় শচী কাল নিজেও বুঝতে পারেনি। আজ শ্যামবাজারের দিকে এক বাড়িতে টিভি সারাই করতে এসেছিল সে। কাজ শেষ করে রাস্তায় বেরিয়ে শচীর মনে হল কাল তনু ঠিকমত পৌঁছতে পেরেছিল কিনা খোঁজ নিযে যাওয়া ভাল। কিন্তু একটা ব্যাপার শচীদুলাল কোনও দিনই জানতে পারবে না। কাল বিকেলের মুখে বন্ধুকে দেখে রীতিমত অন্যমনস্ক হয়ে না পড়লে হয়তো শচীর চোখে পড়ত, একটু তফাতে আরও দুটি লোক গল্পের ছলে দাঁড়িয়ে তনুর ওপরে নজর রেখেছে। তারপর গোটা পথ তাদের পিছু নিয়ে বারে ঢুকেছে। দুই বন্ধু যখন নিজেদের কথায় মশগুল তখন টেবিল বদলে তাদের গায়ের কাছে এসে বসেছে। এবং তনুর সঙ্গে সঙ্গেই তারাও বার থেকে বেরিয়ে গেছে। অর্থাৎ কাল রাতে তনু একা বাড়ি ফিরে যায়নি।

ডোরবেল টিপতেই তার উদ্দেশে উঁচু গলায় বকতে বকতে এসে দরজা খুলে দিয়েই সুবলসখা অপ্রস্তুত হয়ে হেসে ফেলল। বলল, 'এই দ্যাখো, তোমরা এসে গেছ আর আমি তনুদাদাবাবুকে এখুনি গাল পাড়ছিলাম গো!'

বহুবচনের সম্বোধন কানে সামান্য কেমন ঠেকলেও শচী গায়ে মাখল না। মুচকি হেসে বলল, 'বেশ করেছ। তা এত বেলায় বাবুর ঘুম ভাঙল বুঝি? তুমি ওকে খবব দাও, আমি বসছি, আমার তাড়া নেই।'

থতমত খেয়ে সুবল বলল, 'কোথায সে?'

কথাটা শচীর বুকে ধক করে উঠল। সে উদ্বিগ্ন গলায় শুধোল, 'কেন, বাড়ি ফেরেনি?'

সুবল মাথা নাড়ল, 'তবে আর বলছি কী! নাও ভেতরে এসো।'

শচী এতখানি আশা করেনি। তার মুখে কথা শুকিযে গেল। কেমন অপরাধীর মত মাথা নিচু কবে সুবলকে পাশ কাটিযে বসবাব ঘরে চলে এল কিন্তু উত্তেজনায বসতে পাবল না। কী যে হল, শচী আকাশপাতাল হাতড়াচ্ছিল, কোনও দুর্ঘটনা, নাকি অন্য কারও বাড়িতে ভুল কবে চলে গেল তনু? এ দুয়ের কোনওটা না হলে নির্ঘাত পুলিশে ধরেছে। স্টম্যাক পাম্প করিয়ে থানার লক-আপে ভরেছে।

'কী হল, বসো। চাযের জল চাপাই।'

চমক ভেঙে শচী বলল, 'অ্যাঁ! কিন্তু কাল সন্ধেবেলায়ই তো তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ফিরে এল!'

'তা এলে কী হবে, কোন সকালে আবার হুড়মুড় করে তো বেরিয়েও গেল। আমি বললাম, এ কী! এখন বেরোচ্ছ? চা-টা খেয়ে যাও। খেল না, কোথায নাকি দবকার আছে। শুধু বলল, দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দাও। আমি না ফেরা পর্যন্ত তুমি কোথাও বেবিযো না!—শোনো কথা!'

বুকের ভেতরটা জুড়িয়ে গেল। যাক, ঠিকঠাক বাড়ি ফিরেছিল তনু এবং সুস্থই ছিল। একটু আগের দুশ্চিন্তা সে সুবলের কাছে ভাঙল না। সামলে নিয়ে বলল, 'তুমি ভেবো না সুবলদা, ও এক্ষুণি দেখো এসে যাবে। যাও চা করো।'

সুবল ভেতরে চলে গেল। শচীন ঠোঁটের হাসিটা চেপে রেখেই সেন্টার টেবিল থেকে রবিবারের কাগজটা টেনে নিয়ে বসল। এ-পাতা ও-পাতা ঠুকরে ঠুকরে একটু দেখল, খববে মন বসাতে পারল না। সুবলকে সে বলল বটে কিন্তু তনু ছুটির দিনে এভাবে তাড়াহুড়ো করে কোথায় গেল, কখন ফিরবে কে জানে! সুবলকে বলা ওর শেষ কথাটা একটু কেমন যেন, এখনও কান ছুঁয়ে আছে। সুবল নিজেও এমনটা শুনতে বোধহয় অভ্যস্ত নয়, অবাক হয়েছে, না হলে বলত না। কিছু কি ঘটেছে তাহলে? তনু কি কিছু আশঙ্কা করছিল? কাল ওকে কেমন দেখেছে, মনে করবার চেষ্টা করল। ছোটখাট কথার পিঠে কথাগুলো ভাবতে ভাবতে তার মনে হল তনু একটু অন্যমনস্ক ছিল হয়তো, তবে যাকে উদ্বিগ্ন বলে তা নয়। শেষদিকে বাড়ি ফেরার জন্যে একটু ব্যস্ত হয়েছিল অবশ্য। শচীর চিন্তা থমকে গেল টেলিফোনের আওয়াজে। শোবার

ঘরে ফোন বেজে যাচ্ছে। সুবল কিচেন থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'দাদাবাবু, ধরো।' সুবল বোধহয় ডিম ভাজছিল, নাকে গন্ধ এল শচীর।

শচী ফোন তুলে বলল, 'হ্যালো!'

'আমি কি অতনু মজুমদারের সঙ্গে কথা বলছি?' কোনও তরুণীর গলা বুঝতে অসুবিধে হয় না। গলায় এমন একটা বাড়তি সুর আছে যা কানে লেগে থাকে।

'আপনি?'

'কী অসভ্য লোক! এভাবে কেউ যায়?' গলাটা যেন ঘনিষ্ঠতায় রমরম করছিল।

'দেখুন আমি—-' শচীর গলায় যেন আড়ি পেতে কথা শোনার অপরাধবোধ। সে তাড়াতাড়ি মহিলার ভুল ভেঙে দিতে চাইল কিন্তু তারের ও প্রান্ত যেন তেতে উঠেছে, শচীর কথা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে বলেই চলল, 'শেষে কিনা পেপারে তোমার অ্যাড দেখে আমাকে জানতে হল! মানুষের মনে কীরকম চাপ—'

শচী এবার নিরুপায়, কঠোর হতে বাধ্য হল, 'দেখুন ম্যাডাম, আপনি কে জানি না কিন্তু আপনি ভুল করছেন। আমি অতনু মজুমদার নই। অতনু একটু বেরিয়েছে।'

কট করে একটা শব্দ তুলে টেলিফোনটা গুলি খাওয়া পাখির মত শচীর হাতের মধ্যেই যেন মরে গেল। হ্যালো হ্যালো বলে বার দুই মিথ্যেই ঝাঁকাল শচী। কিচেন থেকে সুবলসখা ছুটে এল, 'কী হল? কে? কী বলছে?'

দরজা খুলে দিয়েই সুবল অবাক গলায় বলে উঠল, 'এই দ্যাখো, পাঁচ মিনিটও হয়নি তোমার বন্ধু চলে গেল। রাস্তায় দেখা হয়নি?'

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিতে দিতে অতনু জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'আমার বন্ধু? কই না তো! তুমি কার কথা বলছ?'

সুবল ভুরু কুঁচকে অতনুর আপাদমস্তক দেখছিল, বলল, 'কেন, শচীদাদাবাবু। অনেকক্ষণ তোমার জন্যে বসেছিল। ইস, তুমি একেবারে বেলা গড়িয়ে ফিরলে, ঘড়িতে কটা বাজে খেয়াল আছে? এত শুকনো-মুকনো দেখাচ্ছে, কী ব্যাপার? সকাল থেকে নেশ্চয় পেটে কিছুই পড়েনি?'

'চা খাব, সুবলদা।'

'এখন! এই অবেলায়? না না, তুমি মুখ-হাত ধুয়ে এসো, আমি একেবারে ভাতই দিয়ে দিচ্ছি।' বলেই চলে যেতে গিয়েছিল, পা বাড়িয়েও থেমে দাঁড়াল। এই হচ্ছে সুবলসখা, বরাবর তার ওপরে একটু গার্জেনি ফলাবে। আসলে ভালবাসে তো, একটু আলাদা চোখে দেখে, তাই! এ-বাড়ির আর যে দুটি ছেলে, মেজ

আর ছোট, তারা বহুকাল আগেই লায়েক হয়ে গিয়েছে, চালচলনে অন্যরকম। সুবলকে তারা বিশেষ পাত্তা দেয় না। মান নয়, মাইনের সম্পর্ককেই তারা ধর্তব্যের মধ্যে রাখে। সুবলও তার অধিকারের সীমানা, স্থান-কাল-পাত্র বুঝে গিয়েছে। আগ বাড়িয়ে কথা বলতে যায় না।

সুবলকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে অতনু মুখ তুলে তাকাল। তারপর এই প্রথম হেসে ফেলল, 'কী হল? কিছু বক্তব্য রাখবে বলে মনে হচ্ছে?'

সুবল হাসল না, মাথা দুলিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, 'সোয়েটারটা হারিয়ে এসেছ নিকৃঘাত? হুঁ! যাবার সময় তোমার গায়ে দেখেছি স্পষ্ট মনে আছে।'

'হারাবে কেন? আসার পথে একেবারে কাচতে দিয়ে এলাম। ভাত বাড়ো, আমি মুখ-হাত ধুয়ে আসছি।' বলেই অতনু পাশ কাটাবার তালে ছিল, সুবল দু-পা এগিয়ে এসে বলল,'মাথাটা একটু হেঁট করো তো, তনুদাদা! চুলের ভেতর কী যেন—'

এ-বাড়িতে অতনুই সবচেয়ে ঢ্যাঙা মানুষ, তার হাইট ছ ফুটের ওপরে। অল্প বয়স থেকেই ও ধাঁই ধাঁই করে মাথায় বেড়ে উঠছিল। তাই ক্বচিৎ কখনও বাবা যখন হাল্কা মুডে থাকতেন, ওকে লং ফেলো বলে ডাকতেন। কথাটা আজ অনেকদিন পরে হঠাৎ মনে পড়ে গেল। অতনু মনের চাপ কমাতে কৌতুকের গলায় বলল, 'তোমার কাছে মাথা হেঁট করতে আমার আপত্তি নেই, এই নাও'—কুর্নিশ করার কায়দায় সামনে অনেকখানি ঝুঁকে মাথাটাকে সুবলদার এক্তিয়ারে সমর্পণ করে, স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে মন্তব্য করল, 'কোনও হতচ্ছাড়া পাখি নিশ্চয়! রাস্তার স্ট্যাচুগুলোর মাথা ইস্তক ওরা খারাপ করে দিচ্ছে দেখো না?'

চুল কামড়ে থাকা কিছু দু আঙুলে টেনে ছাড়িয়ে আনতে আনতে গম্ভীর গলায় সুবল বলল, 'ঠিক ধরেছিলাম বাঘ-আঁকড়ার ফল! গাঁ-দেশে গরুর ন্যাজে এমন কত আটকে থাকত, বনবাদাড়ে—' সুবলের চোখে বিস্ময়।

বড় এলাচের সাইজের কাঁটাঅলা এঁটেল পোকা যেন। নিজের হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছিল অতনু। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'আশ্চর্যি তো।'

'তোমার সবই আশ্চর্য। এই তো বারোটা লাগাদ এক মেয়েছেলে—'

'দেখা করতে এসেছিল? কী বলে!'

'কিছুই বলে না। টেলিফোনে ভ্যান্তারা করছিল।'

'টেলিফোনে!' অতনু কেমন শঙ্কিত বোধ করল, 'নাম বলেছে?'

সুবল অসন্তুষ্ট গলায় বলল, 'না। কী যে হয়েছে সব আজকাল! পরে শচীদাদার কাছে শুনো, এখন যে-কাজে যাচ্ছিলে যাও তো—' আপনমনে গজগজ করতে করতে সুবল রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

খেয়ে উঠে নিজের বিছানায় টানটান শুয়ে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল অতনু। একটা গোটা বেলা জুড়েই বলতে গেলে একটা ভয়ঙ্কর নাটকের মহড়া আর স্নায়ুযুদ্ধ গেছে তার। অথচ পুরো ব্যাপারটায় সে কোথায়, কী তার ভূমিকা, সেটাই কিছু বোধগম্য হচ্ছে না। উত্তেজক দৌড়ছুট আর ক্ষুন্নিবৃত্তির পর বিছানায় নিশ্চিত আরামে শরীর ছেড়ে দিয়েছিল যেন। মগজ ঝুল, চোখের পাতা ভারী, থেকে থেকেই নেমে আসতে চাইল যেন। এই অবসাদের আমেজকে আমল না দিয়ে নিজেকে চাঙ্গা করে তুলতেই বুঝি তার বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়া। সিগারেটে সশব্দে গোটাকতক লম্বা টান দিয়ে অ্যাশট্রের ভেতরে ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে অতনু ঠাণ্ডা মাথায় এক-দুই-তিন করে ঘটনাগুলো পরপর সাজিয়ে নিচ্ছিল। শচীদুলালের সঙ্গে তার হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু না, কাল না ঘটলেও খুব শীগগিরই একদিন যে সাক্ষাৎকার ঘটে যেত তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, দুজনেরই গতিবিধি ওই পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলটাকে ঘিরেই। কিন্তু কালই শচীর মুখে অতনুর ডুপ্লিকেট লোকটার হদিস পেয়ে যাওয়া একটু নাটকীয় হলেও তার ষোলো-সতেরো ঘন্টার মধ্যেই এক রোমহর্ষক ঘটনায় সেই কানে শোনা লোকটাকে নিজের চোখে দেখতে পাওয়া কী অতি কাকতালীয় ব্যাপার নয়? অবশ্য লোকটা অতনুর দু নম্বর নাকি তিন নম্বর সেটা নিশ্চয় করে অতনু জানে না। অতনুর চেহারার কতগুলো হুবহু নকল এই পৃথিবীতে এই মুহূর্তে ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে কে জানে?

গতরাতের ঘটনায় আবার ফিরে আসে অতনু। পার্ক স্ট্রিটের বার থেকে তার সেই বাগবাজারের বাড়ি, বাড়ির সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মেটানো, ঠিকঠাক দরজায় পৌঁছে তালা খুলে ভেতরে ঢোকা, আলো জ্বেলে শোবার ঘরে গিয়ে স্ট্রেট বিছানায় শুয়ে পড়া—এই অংশটুকু আলো লেগে জ্বলে-যাওয়া কাঁচা ফিল্মের মত বিলকুল সাদা, একদম হেঁয়ালি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু যেটা পুরোপুরিই ধাঁধা, বলতে গেলে রীতিমত রহস্য, তা হল বাড়িতে অজ্ঞাত পরিচয় আগন্তুকের হানা। অতনু বেরিয়ে গিয়েছিল দুপুরের বেশ আগেই আর সুবল সন্ধে হবার সঙ্গে সঙ্গেই। স্বভাবতই এই সময়ের মধ্যে কেউ তাদের বাড়িতে ঢুকতে পারেনি, তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তাহলে ধরে নিতে হয়, অনুপ্রবেশকারীর কাছে খবর ছিল, সুবল রাতে বাড়ি থাকবে না, সন্ধের মুখে-মুখেই বেরোবে, যাত্রা শুনতে যাবে। সেটা খুব যে কঠিন কাজ তা নয়। তবে খুব নামী কোম্পানির তৈরি ডোর-ল্যাচ সেই বিশেষ নম্বরি চাবি দিয়ে ছাড়া খোলা একেবারেই অসম্ভব কিনা অতনুর জানা নেই, তবে তা খুবই শক্ত একথা জানে। অন্য উপায়ে খুলতে পারলেও তালা নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য। তালা কিন্তু খারাপ হয়ে যায়নি। একটুও গোলমাল করছে না। তাহলে ধরে

নিতে হচ্ছে, দরজার কপাটে বসানো গা-তালার জন্যে তৈরি সেই নির্দিষ্ট নম্বরি চাবিটি দিয়েই ল্যাচ খোলা হয়েছিল। কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব? এক সেট চাবি তার পকেটে, দ্বিতীয় গোছা মায়ের সঙ্গে দিল্লি চলে গেছে, আর তিন নম্বরের গুচ্ছ যে সুবলের কাছে ছিল তার প্রমাণ ভোরবেলা তাকে ল্যাচ খুলে ভেতরে ঢুকতে হয়েছে। কারণ অতনু তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। এই তিন প্রস্থ চাবির কোনওটাই তাহলে বাইরের লোকের হাতে ছিল না, অথচ তারা ভেতরে ঢুকেছিল। আলমারি, ড্রয়ার, ড্রেসিং টেবিলের টানা থেকে শুরু করে বাক্স-প্যাঁটরা হাঁটকে লণ্ডভণ্ড করে রেখে যাওয়া জিনিসপত্র ফের যথাস্থানে গুছিয়ে রাখতে গিয়ে কাল রাতেই অতনু টের পেয়েছিল, চোর কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু একটা তল্লাশ করেছে। সে জিনিস তারা বা তাদেব হস্তগত হযেছে কিনা সে জানে না। তবে তারা টাকাকড়ি বা অন্য মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে যায়নি। কি খোয়া গেল, কিছু আদৌ খোয়া গিয়েছে কিনা সেটা পরিষ্কার ঠাণ্ডা মাথায় [illegible] মিলিয়ে-জুলিয়ে দেখতে হবে। দূরবীন, ক্যামেরা, দামী কলম যেমন ছিল 'পড়ে ও :ছে, কোনওটাই হাওয়া হয়ে যায়নি।

এই ঘট ার সঙ্গে রঞ্জুপ্রসাদের কোনও যোগসূত্র আছে এমন মনে হয় না। তাছাড়া ওঃ নামেব সত্যিকারের কোনও মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কেই তো যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। সেই বৃদ্ধ, পঙ্গু মানুষটা, টেলিফোনের কথোপকথন থেকে যাকে সেরকমই আন্দাজ করে নিয়েছিল, সে-লোক কিন্তু ঝিল রোডের বাড়িতে অন্তত ছিল না। তবে ঝিল রোড আদপেই ফক্কিবাজি ছিল না। ওটা যে-কোনও মানুষের কাছেই রীতিমত দুঃস্বপ্নের রাস্তা হয়ে উঠতে পারত। সামান্য টিভি রিহার্স্যালও নিশ্চিন্ত পথচারীর পক্ষে মর্মান্তিক হয়ে উঠতে যাচ্ছিল। ওয়ান ওয়ে টু ডেথ অ্যাহেড বললে কিছু বাড়িয়ে বলা হয় না। বানানো গপ্পো দিয়ে নিমাই ঘোষকে ভোলানো গেলেও প্রায় অনিবার্য নিয়তির মত সেই বাড়িটা তার জন্যে আগেভাগেই বুঝি ছক পেতে বসেছিল। মাকড়সার জালে জড়িয়ে গিয়েও অতনু কপালজোরে ক্লিন বেরিয়ে আসতে পেরেছে এটাই সবচেয়ে বড় স্বস্তি। সিগারেট পুড়তে পুড়তে কখন ছোট হয়ে এসেছিল খেয়াল করেনি। আঙুলের ফাঁকে ছ্যাঁকা লাগতেই জ্বলন্ত টুকরোটা অ্যাশট্রের ভেতর ফেলে দিল।

তার ক্লিন বেরিয়ে আসা ব্যাপারটাও বোধহয় এই রকম। আর একটু হলেই আঙুল পুড়ত কিন্তু তার আগের মুহূর্তের আগুনের ছ্যাঁকা তাকে সামলে দিয়েছে। হাত ঝেড়ে ফেলে সে এখন নিরাপদ। চোখ বন্ধ করে ঝিল রোডের ঘটনাটা অতনু ঠাণ্ডা মাথায় খতিয়ে দেখছিল। সে পুরোপুরি বিপদমুক্ত কিনা, হাত মুছে পরিষ্কার বেরিয়ে আসতে পেরেছে কিনা, ভাল করে ভেবে দেখা দরকার। স্বস্তির বিষয়, একটা ব্যাপারে সে নিভুল রকমে নিশ্চিত, 'শেষ নমস্কার'-এ তাকে

ঢুকতে কেউ দেখেনি, বেরোতেও না। তার কোনও চিহ্নও সে ওখানে ফেলে আসেনি। না, কথাটা বোধহয় ঠিক না। আবার নতুন করে বুকেব ভেতরটা গুড়গুড় করে উঠল। একটা খুব কাঁচা কাজ সে করে এসেছে। মারাত্মক একটা ভুলই বলা যায়। খুনের জায়গায়, দোতলার ওই ফ্ল্যাটের নানা জিনিসে মূর্খের মত নিজের হাতের ছাপ সে নির্ঘাত রেখে এসেছে। টিভির সুইচে, ছুরির বাঁটে, সোফার গালচেতে আর বাথরুমের দরজার গায়ে। আরও কোথায় কে জানে! তবে এটাই বাঁচোয়া, পুলিশের ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যালবামে তার আঙুলের ছাপ জমা নেই। শুধু ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেখে মানুষ আবিষ্কার করা যায় না। বিশেষ করে এই কলকাতা শহরে, যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক নানা প্রয়োজনে তাঁতের মাকুর মত অবিরাম দৌড়ে বেড়াচ্ছে। তার বাড়ি আর ওই বাড়ি শহরের দুই প্রান্তে। কলকাতার নর্থপোল সাউথপোল বললেই বোধহয় ভাল মানায়। ঝিল রোডে তার মত একজন নগণ্য মানুষকে কেউ চোখ তুলেও হয়তো দেখেনি। একমাত্র নিমাই ঘোষ ছাড়া। সে অবশ্য তাকে মুখোমুখি দেখেছে। তবে তার কাছে এমন কোনও ভাব দেখায়নি যাতে মনে হতে পারে, ওই বাড়িই তার লক্ষ্য, ওখানেই সে জরুরি দরকারে যাচ্ছে। বানিয়ে তোলা গল্প গেলাতে গিয়ে ভাগ্যিস সে কোথায় থাকে বলে ফেলেনি! তা ছাড়া পুলিশের ধারে-কাছে তার যাবার সম্ভাবনাও নেই। যতদূর বুঝেছে, লোকটা একের নম্বরের ভিতুর ডিম। কোনও ঝামেলার দিকে সে পা বাড়াতে যাবেই না।

চোখ বন্ধ করে এই সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতেই অতনু ঘরের ভেতরে সুবলের আগমন টের পেল। চোখ না খুলেও সে বুঝতে পারল সুবলদা জলের জগ আব গেলাস রেখে যেতে এসেছে। খাটের পাশে টিপয় টেনে এনে কাচের জগ আর গেলাস নামানোর শব্দ শুনতে পেল। তার একটু পরেই তার গলা।

'তোমার চিঠি। বসে ঝিমাচ্ছ কেন, একটু গড়িয়ে নিলে পারতে।'

ভেতরে কখন ভাত-ঘোর লেগে গিয়েছিল বুঝতে পারেনি। অবাক হয়ে হাত বাড়াল, 'কখন এল?'

'আজ রবিবার না, চিঠি আসবে কি?' সুবল হাসল, 'কাল দুপুরে এসেছিল, তা তোমাকে আর দেবার সময় পেলাম কই!'

চিঠির সংখ্যা ভালই, খান ছ-সাত তো হবেই। সবগুলিই খামের চিঠি। হাতের লেখা অচেনা, প্রেরকের হদিস খামের ওপরে নেই, একমাত্র একটি চিঠি ছাড়া। সেটি এসেছে এক নামকরা সাপ্তাহিকের সম্পাদকের কাছ থেকে ছাপানো খামে। সেটা আপাতত সরিয়ে রেখে অন্য চিঠিগুলোর খাম ছিঁড়তে ছিঁড়তে অতনু অবাকই হল। কিছুদিন আগে প্রধান প্রধান দৈনিকগুলিতে সে কপাল ঠুকে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। কয়েকটি পারিবারিক হারানো রত্ন ও দৈবমূর্তি বিষয়ে আলোকপাত

চেয়ে। তাতে নাম-ঠিকানার সঙ্গে যে ফোন নম্বরও দেওয়া ছিল, সে-কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল সে। এতদিন পরে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সেই ব্যাপারে কৌতূহলী মানুষের জিজ্ঞাসাবাদ এই শুরু হল। কিছু তথ্যের আভাস-ইঙ্গিতও সেগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে হয়তো। হঠাৎ একটা কথা তার মগজে খেলে গেল। খবরের কাগজের ওই বিজ্ঞাপন থেকেই রঞ্জুপ্রসাদ তার হদিস পেয়ে যায়নি তো? টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে অতনুর নাম নেই, কারণ ফোনটা আছে তার মায়ের নামে। সেই প্রথম আমল থেকেই। লোকটা যদি তার এত নাড়িনক্ষত্রের খবরই রাখবে তাহলে এতকাল পরে কাল রাত্তিরে কেন, অনেকদিন আগেই তাকে তলব করতে পারত। অতীতের ব্যাপারটা বোঝাই যাচ্ছে একটা টোপ, বেশ লোভনীয় টোপ, তার তলায় লুকোনো ছিল তার নির্ভুল বঁড়শিটা। একটা ব্যাপার অতনুর কাছে এখন পরিষ্কার। রঞ্জুপ্রসাদ লোকটা যেই হোক, সে চেয়েছিল খবরের লোভে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা পূর্বপরিকল্পিত খুনের মামলায় গেঁথে দিতে। এই উদ্দেশ্যে সে বেশ ঠাণ্ডা মাথায় দিন-ক্ষণ স্থির করেছিল, এবং যথাসময়ে পুলিশকেও উড়ো টেলিফোনে খবর পৌঁছে দিয়েছিল। অথচ কার্যত হয়তো রঞ্জুপ্রসাদ তাকে চোখেই দেখেনি কোনওদিন, তার সম্পর্কে জানা তো দূরের কথা। কিন্তু তাহলে এই ষড়যন্ত্রের মোটিভটা কী? একটু ভাবতেই ভেতর থেকে উত্তরটা উঠে এল। উদ্দেশ্য বোধহয় একটাই, সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। লাঠি মানে, তদন্তের পরিভাষায় যাকে বলে অ্যালিবাই। নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখার পাথুরে প্রমাণ। প্রমাণের কথায় কী যেন স্মরণ হতে অতনু উঠে গিয়ে কাচতে দেবার জন্যে ছেড়ে-রাখা প্যান্টের পকেট হাতড়াতে লাগল। না, আছে! হেলায় ফেলে রাখলেও খোয়া যায়নি কাগজের টুকরোটা, হাতে ঠেকল। ঠিক ঢোকার মুখে সে কী ভাবে কপাট থেকে চিরকুটটা ছিঁড়ে নিয়েছিল। সে যে অনাহূত নয়, তার নজির হিসেবে এটাকে সে পকেটস্থ করেছিল অথবা লেখাটা আর কারও নজরে পড়ুক এটা সে চায়নি বলেই—এখন তা আর মনে নেই। সেই উত্তেজনার মুহূর্তে অত কিছু হয়তো ভাবেওনি। একটা ঝাপসা ইনটুইশন কাজ করে থাকবে। এখন দ্বিতীয়বার লেখাটা পড়তে গিয়ে আর একটা সম্ভাবনার কথা তার মনে উদয় হলো। নিহত লোকটাই যদি ওরফে রঞ্জুপ্রসাদ হয়, নিজেকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য হয়তো মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল। তার কোনও অসাধু উদ্দেশ্য হয়তো ছিল না। কিন্তু তৃতীয় কোনও ব্যক্তির কাছে রঞ্জুপ্রসাদ, স্বনামে অথবা বেনামে যাই হোক, ছিল বিপজ্জনক। অতনুর কাছে রঞ্জুপ্রসাদ মুখ খুলুক, এটা সেই থার্ড পার্সন, সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি চায়নি। ফলে অতনু পৌঁছাবার আগেই রঞ্জুপ্রসাদকে চিরদিনের মত নীরব করে রেখে গিয়েছিল। খুনের ঘটনায় অতনুকে জড়াবার পরিকল্পনা তার ছিল না। ওটা

কাকতালীয় ঘটনা, অতনু নিজেই ব্যাপারটাকে অকারণে জটিল করে ভেবে নিয়েছে। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতই নিজেকে বিপদমুক্ত আর ঝরঝরে বোধ করল অতনু। তার মন থেকে একটা গুরুভার যেন নেমে গেল আপনা থেকেই।

নিশ্চিন্ত মনে অতনু এবার সম্পাদকের চিঠিটা খুলে চোখ বুলাল। মামুলি চিঠি, আগের সংখ্যার কভার-স্টোরির প্রশংসা করে পরের লেখাটার জন্যে তাগাদা, যেন হাতে না পৌঁছানো পর্যন্ত রাতে ঘুম হচ্ছে না। একটু পপুলার হয়ে উঠলে সব সম্পাদকেরই এক রা। ভালই লাগে। সবশেষে সম্পাদকমশাই লিখেছেন, এই লেখাটার সঙ্গে তিনি আরও বেশি ছবি ছাপতে চান, ছবি যেন তৈরি থাকে।

অতনু গলা চড়িয়ে ডাকল, 'সুবলদা, আমার ক্যামেরাটা এ-ঘরে দিয়ে যেয়ো তো।'

সুবল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুখ বাড়াল, সে এদিকেই আসছিল। বলল, 'দিল্লির চিঠি পেলে ?'

মাথা নেড়ে অতনু বলল, 'না, অন্য ব্যাপার, ক্যামেরাটা নিয়ে এসো, বলছি।'

'চা খাবে নিশ্চয়, জল চাপিয়েছি।' সুবল ওর স্বভাব জানে, তাই হাসল।

ছবির চিন্তাটাই অতনুর মাথায় ঘুরছিল। লেখার জন্যে তেমন চিন্তা নেই। তার আগামী বইটির চ্যাপটার ভেঙে শুধু কপি করা। কিন্তু ছবির ব্যাপারটা তাব নিজেব হাতে নেই। অনেক ধরা-করা করতে হয়। অনেক পরিবারেই কেমন একটা রক্ষণশীল কুসংস্কার আছে। বংশপরম্পরায় আগলে রাখা রত্ন বা মূর্তি সম্পর্কে মুখ খুললেও ছবি তুলতে দিতে নারাজ। ক্যামেবা হাতে নিয়ে ছবির সংখ্যাটা দেখতে গিয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল অতনু। ক্যামেরা খালি, ফিল্মের রোলটা কেউ বের করে নিয়েছে।

বিমূঢ় ভাবটা কাটতে সময় লাগল অতনুর।

এমন সৎ নির্লোভ এবং নিষ্ঠাবান চোর তাদের বাড়িতে ঢুকেছিল এ যেন ভাবাই যায় না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কুটোগাছাও সে নিয়ে যায়নি। এক রিল ফিল্মেব দাম অবশ্য এমন কিছু নয়। কিন্তু ফিল্মটা চুরি যাওযায় তার যে ক্ষতি হল তা এক হিসেবে অপূরণীয়।

যতদূর মনে পড়ছে, অনেক অনেক মেহনত করে মাত্রই গোটা কুড়ি ছবি সে তুলতে পেরেছিল এযাবৎ। তবে বিষয়বস্তুর নিরিখে ডকুমেন্ট হিসেবে দেখলে সেগুলো ছিল দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য। এইসব লক্ষ্যবস্তুর খোঁজ পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে, বিস্তর পুঁথিপত্র আর খবরের কাগজের বিবর্ণ পৃষ্ঠার পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে হয়েছে। শুধু কি তাই! পোস্টাপিসের লক্ষ্যভ্রষ্ট চিঠির মত রিডাইরেক্ট হতে হতে এক ঠিকানা থেকে আর এক ঠিকানায়, এক দরজা থেকে আর

এক দরজায় দৌড়ছুট তো কম করতে হয়নি। অনেক সাধ্যসাধনা, আর ধর্না দিতে হয়েছে নাছোড়বান্দার মত। আজ আচমকা এই ধাক্কা খেয়ে তার কাজ পিছিয়ে গেল অনেকখানি। কয়েকখানা ছবি, বিশেষ করে তার পক্ষে দ্বিতীয়বার তোলা বোধহয় সম্ভবই হবে না। ভেবে মনটা দমে গেল খুব।

কিন্তু এই ছবিগুলোর জন্যে হঠাৎ কার এত মাথাব্যথা হল, আর কী জন্যেই বা হল, সেটাই এখন তার কাছে রীতিমত ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। ভাবতে ভাবতে একটা আশঙ্কা অতনুর মগজে ঝিলিক দিল। ক্যামেরা অবশ্য তার একটা নয়, দু-দুটো। আর দুটোই বলতে গেলে প্রায় চোখের সামনে ছিল। এর জন্যে তো হাঁটকা-হাঁটকি, সারা বাড়ি চষে বেড়ানোর দরকার ছিল না। বোঝাই যাচ্ছে আরও কিছু, অন্য কিছুও নিশ্চয় খুঁজে বেড়িয়েছিল লোকটা। অবিশ্যি লোকটা, না লোকগুলো তা এখন আর হলফ করে বলা যাবে না।

আশঙ্কার কথাটা আবার মনের মধ্যে ফিরে আসতেই খাট থেকে লাফিয়ে নেমে পাশের ঘরে ছুটে গেল সে। লেখার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে মনটাকে শক্ত করতে একটু বেশিই সময় লাগল বুঝি। আনাড়ি মানুষ যেন জেনেশুনে গোখ্‌রো সাপের চুবড়ির ডালা খুলতে যাচ্ছে। কাঁপা-কাঁপা হাতের একটানে ড্রয়ারটা খুলে ফেলল। না! তার অনুমান ভুল, মিথ্যেই সে ভয় পেয়েছিল। যাক, আছে! কেউ বোধহয় ছুঁয়েও দেখেনি তার বহু পরিশ্রমের দলিল। পাণ্ডুলিপি ভর্তি পেটমোটা ফ্ল্যাট ফাইলটা। ফিতে বাঁধা অবস্থায় ঠিক একই রকমভাবে রাখা আছে।

বড় করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অতনু দাঁড়িয়ে থাকল একটুক্ষণ। এও এক হিসেবে যাকে বলে কানের পাশ দিয়ে বেঁচে যাওয়া। আর সেই সঙ্গে ধাঁধা। যদি পাণ্ডুলিপি নয়, তা হলে কী সেই জিনিস, যার জন্যে এত হন্যে হয়ে তল্লাশী চালানো হয়েছে? ড্রয়ার বন্ধ করে ফিরে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল অতনু। যা নির্ঘাত খোয়া যাবে ভেবেছিল, যায়নি বলেই দ্বিতীয়বার ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। ড্রয়ার খুলে ফাইলের ভেতর থেকে ফুল্‌সক্যাপ কাগজের গোছা বের করে নিল অতনু। পাণ্ডুলিপির পাতাগুলোকে অন্য কোথাও সরিয়ে রাখা দরকার। মনের মত নিরাপদ জায়গা এ-বাড়িতে নেই তা নয় কিন্তু সেভাবে লুকিয়ে রাখার মুশকিল আছে। সম্প্রতি শেষ করা তিনটে পরিচ্ছেদ ভেঙেচুরে লেখাগুলো নতুন ছাঁদে ঢেলে সাজাচ্ছিল সে। তাই সেগুলো আপাতত চোখের সামনে রাখা দরকার। গল্পের অবয়বে ইতিহাসকে ঢালতে গেলে তাকে চোলাই করে নিতে হয়। সম্পাদকমশাই লেখার বরাত দিতে গিয়ে অতনুকে বলেছিলেন, 'আমি আপনার কাছে কিন্তু হিস্ট্রি চাই না, ফুটনোটে ঠাসা প্রবন্ধ না।'

সম্পাদকের হেঁয়ালি বোধগম্য হয়নি প্রথমে। অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তাহলে?'

গল্পের টোপ ফেলুন। ভদ্রলোক চোখ টিপে হেসেছিলেন, 'গোলা পাবলিক নিয়ে আমার কারবার নয়, আমার হচ্ছে গেলা-পাবলিক। গপ্পো-গেলা পাবলিক।'

অতনুও বুঝি টোপ গেলার কায়দায় হাঁ করে থেকেছিল একটুক্ষণ। তারপর কৌতুকের গলায় বলেছিল, 'পাবলিক খাবে?'

'খাবে মানে? গিলবে! হিস্টোরি মিনস হাই স্টোরি, বুঝেছেন?'

ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছিল অতনু, এর বেশি আর খোলসা করে বলতে হয়নি। প্রথম কিস্তি জমা দিয়েছিল নির্ভুলভাবেই। সেই প্রসঙ্গেই সম্পাদকের চিঠিটা এসে পৌঁছেছে গতকাল। টেবিলের ওপরে রাখা পোটেবল বাংলা টাইপ রাইটারটার দিকে চোখ চলে গেল স্বভাবতই। মেশিনের মধ্যে একটা কাগজ ভরা রয়েছে এখনও। দ্বিতীয় কিস্তির সূচনা, চার-পাঁচ লাইনের বেশি এগোয়নি। মনে পড়ে গেল, দিন কুড়ি-পঁচিশ আগে শেষ বসেছিল ওখানে। গল্পটা তখনও বোধহয় পুরোপুরি মাথায় আসেনি, তাই চার-পাঁচ ছত্র টাইপ করেই উঠে পড়েছিল, আর ফিরে বসা হয়নি। কাজটা ঠিক হয়নি। এমন সব ধোয়ামোছা, গল্পের মাথামুণ্ডু কিস্যু আর মনে নেই। কৌতূহলী অতনু টাইপরাইটারের সামনে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। সেদিনের ভাবনার যদি কোনও সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

চোখ খুলতেই মনে হল দমবন্ধ করা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার যেন বুকে হাঁটু গেড়ে চেপে বসে আছে। ডিমলাইটটা নিবে গেছে কখন, এক বিন্দু আলো নেই কোথাও। এরকম অন্ধকারে ঘুম ভাঙলে ঘরের দিশে থাকে না, কোন দিকে কী সব গুলিয়ে যায়। হঠাৎ মনে হল ঘরের ভেতর কারও আবির্ভাব ঘটেছে, তার পায়ের চাপা খসখস শব্দে রঞ্জুপ্রসাদ চমকে উঠলেন, গায়ে কাঁটা দিল।

রঞ্জুপ্রসাদ! চমকে উঠল অতনু, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। কাল রাতে, মাত্রই পনেরো-ষোলো ঘণ্টা আগে, টেলিফোনে যে রঞ্জুপ্রসাদকে সম্পূর্ণ অচেনা মনে হয়েছিল, যার নাম কস্মিনকালেও কোথাও শুনেছে বলে মনে হয়নি, সে কিনা তার টাইপমেশিনের মধ্যে লুকিয়ে বসে আছে! রঞ্জুপ্রসাদ তা হলে ইতিহাস নয়, সত্যিকারের কোনও অস্তিত্ব নয়, নিতান্তই কাকতালীয় একটা নাম, জাস্ট গল্পের জন্য বানানো একটা নাম, অতনুর আঙুলের খেয়ালী ঠোকায় টাইপরাইটারের ভেতর ছাপার অক্ষরে তার জন্ম। অ্যাকসিডেন্টাল বার্থ বলতে পারলেই ল্যাঠা চুকে যেত, কিন্তু গেল না। ছাপা নামটা দু-তিন সপ্তাহের মধ্যেই জ্যান্ত হয়ে ফিরে এল আবার তারই কাছে। নিজের গলায়, নিজের হস্তাক্ষরে সে নিজেকে কেবল জানান দিল তাই নয়, অতনুকে ঘিরে একটা জটিল আবর্ত সৃষ্টি করল।

বিভ্রান্ত বিস্মিত অতনু টাইপ-মুখো চেয়ারে গিয়ে ধপ করে বসে পড়ল। এই অঘটন কী করে সম্ভব হল? ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে গিয়ে এর দুটো সম্ভাবনার কথাই বারবার তার মনে হতে থাকল। খুব সম্ভব টাইপে ছাপা নামটা দেখে ফেলার পর তাকে আকৃষ্ট করার জন্যে ওই নামটাকে কেউ কাজে লাগিয়েছিল। তবে এটা যদি ঘটনা না হয় তাহলে ধরে নিতেই হবে রঞ্জুপ্রসাদ নামে সত্যিই কেউ ছিল কিংবা আছে। দীর্ঘ পারিবারিক ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে আপাতদৃষ্টিতে খুবই নগণ্য একটা নাম তার লেখার এক কোণে ঠাঁই পেয়েছিল। তার অবচেতন মনে সেটা থেকেও গিয়েছিল, ফলে গল্প বানাবার সময় সহজেই নামটা তার মাথায় এসে গিয়েছিল। পাণ্ডুলিপির গোছায় নজর বুলোলে হয়তো হদিস পেয়ে যেতেও পারে ভেবে অতনু কাগজের বাণ্ডিল চোখের সামনে রাখল। ওপরের প্রথম পৃষ্ঠাটা অসম্পূর্ণ, এটাই সে শেষ লিখেছিল। সেটা সরাতেই পাতার নম্বরে গোলমালটা চোখে পড়ল প্রথম। আর পৃষ্ঠাসংখ্যা মেলাতে গিয়েই আসল ব্যাপারটা ধরা পড়ল। হাল আমলের তিন তিনটে চ্যাপ্টার উধাও, অন্তত গোটা তিরিশ পৃষ্ঠা নিখোঁজ হয়েছে অত পরিপাটি করে বেঁধে রাখা ফাইলের ভেতর থেকে। হতভম্ব অতনু ঠিক এরকম একটা আঘাতের জন্য তৈরি ছিল না। চোর যে সামান্য নয়, অতিশয় ধূর্ত, এটা তার বোঝা উচিত ছিল। লোকটার অন্য উদ্দেশ্য যাই হোক, একটা ব্যাপারে অন্তত খটকা নেই যে, পত্রিকার সিরিজটা তাকে সে লিখতে দিতে চায় না। আর সেই জন্যেই ফিল্ম আর পাণ্ডুলিপি একসঙ্গে হাতিয়ে নিয়ে গেছে।

বিমর্ষ অতনু কতক্ষণ একইভাবে বসে ছিল খেয়াল ছিল না। সুবলদা কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি।

'অমা! তুমি আবার বাদ্যিযন্তর নিয়ে খটখটাতে বসে গেলে নাকি!' টেবিলের ওপর চায়ের কাপ আর বড়ি ভাজার প্লেট নামাতে নামাতে সুবলদার গজগজানি শুরু হয়ে গেল, 'মানুষটাকে এই দেখে গেলাম বিছানায়, চা নিয়ে যেয়ে দেখি কোথায় কে! সত্যি দু দণ্ড জিরোনোও কি তোমার ধাতে নাই? এবার মা জননী ফিরে আসুক, আমি সব বেত্তান্ত বলব। তখন বলোনি সুবলদাদা লাগাতে গেচে!'

কথাটা অতনুর মনের মধ্যে আঁচড় কেটে গেল। একটা আবছা জ্বালার মত অনুভূতি সে টের পাচ্ছিল। পরস্যাপর হয়েও সুবলদা তার জন্যে যতটা ব্যস্ত, তার 'মা জননী' বোধহয় ঠিক ততটাই উদাসীন। তার ভালমন্দ নিয়ে তাঁর খুব মাথাব্যথা আছে, এমন মনে হয় না।

চায়ে একটা হালকা চুমুক দিয়ে অতনু শব্দ করে হাসল, 'লাগিয়ে দেখতে পারো, কোনও ফল হবে না। মা তার এই ছেলেটিকে বিলক্ষণ চেনে।'

ওর নকল হাসিটা সুবলদা ধরে ফেলেছে এমন সন্দেহ হল, কারণ তা না হলে ভুরু কুঁচকে ওভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে কেন! এই লুকোচুরির মাঝখানে আচমকা টেলিফোন বেজে উঠল। মুখে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ করে সুবলদা বলল, 'ওই ন্যাও, এক দণ্ডও যদি শান্তিতে থাকতে দেয়! যন্তর মানেই যন্তন্না।'

সুবলদা তাড়াহুড়ো করে ফোন ধরার জন্যে পাশের ঘরের দিকে এগোচ্ছিল, অতনু বাধা দিল, 'থাক। আমি দেখছি, তুমি নিজের কাজ সারোগে যাও।'

'হ্যালো?'

তারের অপর প্রান্ত নীরব, কোনও জবাব এল না। বিরক্ত হয়ে অতনু ফের বলল, 'অতনু মজুমদার স্পিকিং। কাকে চাইছেন?'

ও প্রান্তের ফোনটা আস্তে করে নামিয়ে রাখার শব্দ অতনুর কান এড়াল না। তবু বার দুই হ্যালো হ্যালো করে রিসিভার রেখে দিল। এ কী ভুতুড়ে কল্ রে বাবা! যন্ত্র না যন্ত্রণা! সুবলদা বলেছে ঠিকই। কাল রাত থেকে অনেক নাটক তো হল টেলিফোনেই। চোরচোট্টা, খুনী—সবাই তার পিছনে লেগেছে একসঙ্গে। কেন রে বাবা, যা তোদের নেবার ছিল নিয়ে তো গেছিস, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, তবে আবার কেন? এই ধরনের ইয়াকির মানে কী! নাকি কারও অন্য মতলব আছে? কী আর মতলব থাকতে পারে? না হয় ও-ঘর থেকে ছুটিয়ে এনে ফোন ধরালি, তাতে অতনুর ক্ষতিটা কী হল! জব্দ? মোটেই না। কত রং নাম্বার হয় না? গলায় ঘরঘর শব্দ তুলে মাঝপথে টেলিফোনও তো বিগড়োয়, তাতে কী! নাহ্, সে সব নয়! যে লোকটা মার্ডার করতে পারে ঠাণ্ডা মাথায়, যে লোকটা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে নির্ভুলভাবে চুরি করতে পারে এই জনবহুল কলকাতার পাড়া থেকে, সে এরকম ছেলেমানুষী করতে যাবে কেন?

হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। ঠিক দুক্কুর বেলা ভূতে মারে ঢেলা। আজ বেলা বারোটার সময় যে মেয়েছেলেটা (সুবলদার কী ভাষাজ্ঞান! অতনু ঠোঁটের কোণে হাসল) টেলিফোনে ভ্যান্তারা করছিল সে নয় তো? এরকম ন্যাকামি, এরকম মেয়েলি রসিকতা পুরুষের কর্ম নয়। সঙ্গে সঙ্গে শচীর কথা মনে পড়ে গেল। শচী মনে হয় কোনও দরকারেই এসেছিল, অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে গেছে বেচারী! সুবলদার কথাটা আবার যেন কানের মধ্যে বেজে উঠল, 'কী যে হয়েছে সব আজকাল! পরে শচীদাদার কাছে শুনো—'

ঠিক কথা! শচীর সঙ্গেই তার এই মুহূর্তে দেখা হওয়া দরকার। সব উটকো চিন্তার জাবর কাটা ছেড়ে দিয়ে গা-ঝাড়া দিল অতনু। এক লাফে আলনার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঘড়ি ধরে ঠিক দেড় মিনিটের মাথায় সে পোশাক পাল্টে তৈরি, মাথায় চিরুনি টানছে।

'দ্যাখো কাণ্ড! আবাব বাইরে? ঘরের ম্যায়াদ শ্যাষ!'

চটি জোড়ায় পা গলাতে গলাতে অতনু হাসল, 'হ্যাঁ, শ্যাষ। বেরুচ্ছি। সাবধানে থেকো।'

'তা হলি বিছানা বালিশও বগলে করি নিয়ে যাও—একেবারে রাতের মত নিশ্চিন্তি!'

সুবলদার চিবুক ধরে আলগোছে একটু নেড়ে দিয়ে অতনু বলল, 'ফিরব গো ফিরব, তাড়াতাড়িই ফিরব।'

সদর খুলে বেরিযে পড়তে পড়তে অতনু সুবলদার টিপিক্যাল স্বগতোক্তি শুনতে পেলঃ 'টেলিফোন তোমাকে তুক করেছে, তা কি বুঝতে পারিনি ভেবেছ!'

প্রায় পনেরো-ষোলো বছর পরে এ-পাডায় প্রথম পা দিয়ে অতনু সব কেমন গুলিয়ে ফেলেছিল। আঁটোসাঁটো ঠাসবুনোন পাড়াটা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে হযতো এক ইঞ্চিও বাড়েনি, বাডা সম্ভবই ছিল না। উত্তর কলকাতার বহু পুবনো ঘিঞ্জি অঞ্চলগুলো আসলে যেমন হয়, বাঁকাচোরা রোগাভোগা রাস্তা, গলির গলি তস্য গলি ফুঁড়ে বেরিয়েছে তার গা থেকে সরু সরু শিরার মত। গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়িঘর, মান্ধাতার আমলের জোড়াতালি খাওযা কড়িবরগার ছাদ, এক দেওয়াল শুধু দরজায আলাদা, নম্বরে পৃথক। শিক্ষায়-দীক্ষায পিছুহটা, মধবিত্ত ভাঙতে ভাঙতে গরিব বসতি, বারো ঘর এক উঠোনের দশা। অনেকেব জীবিকাই জটিল, অন্ধকারের, প্রায় কহতব্য নয়। ঘরে শুচিবাই, বাইবে জাত-পাত-চরিত্তির মোছা বেহেড দশা। খিদের ঝাঁজটা থেকে থেকে ফেটে বেরোত। প্রায়ই সন্ধের পর সোডার বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি আর দোকানপাটের ঝপাঝাপ ঝাঁপ বন্ধ হত মনে আছে। এখন সেখানেও চোরাগোপ্তা কালো টাকা, উপরি রোজগাব ঢুকে পড়েছে। স্মৃতির সঙ্গে তাই মেলাতে পারছিল না অতনু। বস্তিগুলো প্রায় লোপাট, কিন্তু বাড়ি ভেঙেচুরে স্বাধীন হয়েছে, আশপাশের বাঁধন ছিঁড়ে জিরাফের মত মাথা তুলেছে। দোকানপাট তার সাইনবোর্ড আর পসরা বদলেছে। এ-পাডায যা একদিন ভাবনার বাইরে ছিল, বিউটি-পার্লার, ভি ডি ও ক্যাসেট আর ফাস্ট ফুডের দোকান হয়েছে। এইসব ওলটপালটের মধ্যে শচীনের বাড়িটা খুঁজে পাচ্ছিল না অতনু। আসলে পারসপেকটিভ বা দৃশ্যকোণ বদলে যাওয়ায় সব কেমন অচেনা ঠেকছিল। গলির মুখে ঝুলবারান্দার তলায় বৈঠকখানা ঘরের ঢালাও তক্তাপোশের মত লাল রঙের ঝকমকে রকটা যে বাড়িটার পেটের মধ্যে ঢুকে কবে হজম হয়ে গেছে তা কে জানত! স্টিলফ্রেমে ঝকমকে কাচের জানলা, ভেতরে পোলিও সেন্টার, একজন এফ আর সি এস ডাক্তার সেখানে বসেন। কেবল রং নয়, খোলনলচে বদলে বাড়িটার ভোল বিলকুল বদলে গেছে। স্মৃতি হাতড়ে অতনু সেখানে বারকতক আনাগোনা করার পর যখন কোথায় শচীদুলালের

কথা জিজ্ঞেস করা যায় ভাবছে, এক ভদ্রলোক ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন, 'আপনাকে অনেকক্ষণ থেকে ঘুরপাক খেতে দেখছি, কী ব্যাপার বলুন তো?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছেন ভদ্রলোক, ভুরুর মাঝখানে একটা ভাঁজ, যেন ধরেই নিয়েছেন সে এখানে কোনও কুমতলবে ঘোরাফেরা করছে। অতনুর কাছে রহস্যটা পরিষ্কার হল এইবার। বেশ কিছুক্ষণ থেকেই একটা অবচেতন অস্বস্তি হচ্ছিল তাহলে এই জন্যে? সেন্সিটিভ ত্বকের ওপরে একাগ্র দৃষ্টিরও কি ভাইব্রেশন হয়?

অতনু জবাব দিল, 'আমার এক বন্ধুকে খুঁজছি—'

কথাটা শেষ করতে না দিয়ে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'বন্ধু? আপনার বন্ধু? কী নাম তাঁর?'

'শচী—শচীদুলাল। অনেক বছর পরে এলাম তো, তাই কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে! মনে হচ্ছে এই বাড়ি!' অতনুর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন ভদ্রলোক। চোখে সন্দেহ আরও যেন ঘন হল।

'না, মশাই, শচীদুলাল-ফুলাল কেউ থাকে না এ-বাড়িতে। কী করেন ভদ্রলোক বলুন তো?'

অতনু এবার গেরোয় পড়ল। তালেগোলে সেদিন শচীর কাজকর্মের খবরটাই নেওয়া হয়নি। আশ্চর্য! বন্ধু বলে পরিচয় দিচ্ছে অথচ কী কাজ করে সেটাই জানে না বললে কেউ বিশ্বাস করবে? শচীর যা বিদ্যে, কী কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব অতনু ভাবছিল। আর ঠিক তখনই উল্টো দিকের ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে গুটিতিনেক ছোকরা বেরিয়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল।

'কেসটা কি কাকাবাবু? কোনও ঝ্যামেলা নাকি?'

ভদ্রলোক বাঁকা সুরে বললেন, 'ঠিক বুঝতে পারছি না, শচীদুলাল বলে কাউকে তোরা চিনিস নাকি? এ-বাড়িতে আবার শচীদুলাল কে থাকে রে? এনার বন্ধু বলছেন!'

'কত নম্বর মোশাই, আহিরীটোলা ইস্টিট তো?'

অতনু বলল, 'শচীদুলাল গোস্বামী এখানে থাকে না? এই রাস্তাই, তবে নম্বরটা—'

'গোস্বামী, গোস্বামী?' ওরা নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বলল, 'অ! কীরম দেখতে বলুন তো?'

'এই মাঝারি হাইট, মুখে চাপদাড়ি আছে, খুব ফর্সা, গোল। বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বয়স। একটু বেশি ড্রিঙ্ক-ফিঙ্ক করে।'

'ওরে গুরু!' তিনজনেই প্রায় সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'হয়েছে! আসুন আমাদের সঙ্গে। লালুদা, টিভি মাস্টার লালুদা! আগে বলবেন তো মোশাই।'

বাড়িটা ঠিকই আন্দাজ করেছিল অতনু, তবে পিছনের অংশ, ঢোকবার দরজা

গলির ভেতরে। দুঃখের বিষয় শচী বাড়ি নেই, বেরিয়েছে। তিনতলা থেকে ভেতর উঠোনের দিকে ঝুঁকে তাকিয়ে এক ভদ্রমহিলা কথা বলছিলেন। লালুর বন্ধু অতনু এসেছে শুনে পাশের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে বললেন। অতনুর ইচ্ছে ছিল না, ফিরেই যাবে ভাবছিল কিন্তু একটা ছোকরা উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'যান দাদা, তেত্‌লায় সোজা উটে যান, বড়দি ডাকচেন যকন।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই অতনু বাড়িটার চরিত্র বুঝে গেল। অনেকগুলো পরিবার ঠাসাঠাসি। সিঁড়ির কিনার দিয়ে জুতো, কালিপড়া লণ্ঠন, ভাঙা ছাতা। ল্যান্ডিংয়ে প্যাকিং বাক্সে ঘুঁটে, কয়লা, গুল, তোলা উনুন, কী নেই! এ-ঘর ও-ঘর থেকে আধঘোমটা, আর কাচ্চাবাচ্চা উঁকিঝুঁকি মারছিল। সন্ধের অন্ধকার আগাম ঢুকে পড়েছিল ভেতর বাড়িতে, সিঁড়ির ধাপগুলো খুব দেখেশুনে ডিঙোতে হচ্ছিল, কেউ তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে দিল বোধহয়।

বড়দি মানে লালুর, মানে শচীর দিদি নিশ্চয়। অতনুর আবছা মনে পড়ল, ফোর্থ ক্লাস কিংবা থার্ড ক্লাসে পড়তে সে যখন লালুদের বাড়িতে আসত তখন ওর দুই দিদিকে দেখেছে, চেহারা মনে নেই। ওরা দুই বোন, এক ভাই। নটরাজ শঙ্কু গোঁসাইকে দেখার সৌভাগ্য অতনুর হয়নি, তবে শচীর মা তখনও বেঁচে ছিলেন। বড় ভালমানুষ, বড় স্নেহময়ী ছিলেন, প্রতিমার মত চেহারা ছিল তাঁর। নিজের মায়ের সঙ্গে তুলনা করে মনে কষ্ট পেত।

'এসো ভাই, বসো।' ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে শচীর বড়দি, 'তোমার ফ্রেন্ড রুগী দেখতে বেরিয়েছে, এখুনি এসে পড়বে।' বলে মুখ টিপে হাসলেন। বছর পঁয়তাল্লিশের গোলগাল ভারিক্কি চেহারা, পরনে থান নেই বটে কিন্তু বিধবা সেটা বুঝতে বিলম্ব হয না। দ্রুত হাতে ঘরখানাকে ভদ্রস্থ করে এলেন বোধহয়। ঘরের আধখানা জুড়ে সাবেককালের ভারী খাট, তলায এন্তার বাক্স-প্যাঁটরা ঠাসা। ওপাশে খোলা জানলার ধার ঘেঁষে একটা দশাসই আর্মচেয়ার। রুগী কথাটা শুনে থমকে দাঁড়িয়েছিল, পরের মুহূর্তেই বড়দির মুখে হাসির টিপ্পনী দেখে বুঝে গেল। হেসে ফেলে অতনু বলল, 'টিভি?'

'হ্যাঁ, লালু বলে রুগী দেখতে চললাম। তুমি বসো গিয়ে, আমি চায়ের জল চাপাই।'

বোধহয় মিনিটখানেকও হয়নি, চেয়ারে বসে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের অবস্থা দেখছিল, এমন সময় শচীর উদয়। সিঁড়ি দিয়ে তরতরিয়ে উঠে এসে ঘরের চৌকাঠে দু হাতের ভর রেখে দাঁড়াল, 'হুঁ, নিচে থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম আমার কাছে কেউ এসেছে। কিন্তু সে যে অতনু তুমি, তা বুঝতে পারিনি। আমার কী সৌভাগ্য! ঠিক চিনে এসেছ তো, সব মনে আছে দেখছি!'

'ভেতরে আসবি, না ওখানে দাঁড়িয়েই বক্তৃতা করবি?'

'আসব, কিন্তু তুমি কি এক্ষুণি চলে যাবে নাকি?'

'কেন? তাড়া কিসের, অনেক কথা আছে তোর সঙ্গে।'

'তাহলে ওদের ডেকে আনি, বাইরে কেন দাঁড়িয়ে থাকবে।'

শচী চলে যেতে যাচ্ছিল, অতনু ডাকল, 'শোন, কাদের ডেকে আনবি, আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কেন, তোমার সঙ্গে দুজন ভদ্রলোক আসেননি? ওই জানলা দিয়ে দেখো।'

'স্ট্রেঞ্জ!' বলেই অতনু উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারের পিছনের জানলা দিয়ে নিচের গলির দিকে তাকাল। দুটি লোক, একজন বেঁটে মোটা, অন্যজন রোগা লম্বা। একটা সান্ধ্য দৈনিকের মত খবরের কাগজের পাতা লম্বা লোকটা দু হাতে মেলে ধরে আছে। কিন্তু দুজনের কেউই কাগজ পড়ছে এমন মনে হল না। গলির দেওয়াল ঠেসে দাঁড়িয়ে দুজনেই ঘাড় উঁচু করে কৌতূহলী চোখে এই আলো-আঁধারি জানলার দিকেই তাকিয়ে ছিল। শচী বোধহয় ঘরে ঢুকে আলোর সুইচ টিপে দিল। টিউব লাইট বার দুই-তিন চোখখাঁকারি দিতেই অতনু চমকে দেখল ঠিক তাই। নীলচে সাদা আলোয ঘর ঝকমকিয়ে উঠতেই শচী বলল, 'ঠিক বলিনি? দেখলে লোক দুজনকে?'

'দেখলাম কিন্তু—' অন্যমনস্ক অতনু কী বলতে গিয়ে থমকে গেল। চমকে উঠে নিজের মনেই অস্ফুট গলায় বলে ফেলল, 'হাউ স্ট্রেঞ্জ, কী করে তা সম্ভব!' বলেই ঝটিতি জানলার দিকে মুখ ফেরাল।

শচী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বিড়বিড় করে কী বলছ? ঠিক বলিনি তোমাকে?'

'আরে যাঃ।' মুখ না ফিরিয়েই অতনু জবাব দিল, 'ভ্যানিশ! পালিয়েছে!'

শচী এক লাফে জানলার কাছে পৌঁছে জানতে চাইল, 'কে ভ্যানিশ, কে পালাল?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে অতনু বলল, 'তোর দেখে-আসা লোক দুটো। ঘরে আলো জ্বলে উঠতেই বোধহয় আমাকে দেখতে পেয়ে ভেগেছে।'

'ওরা তাহলে তোমার সঙ্গে আসেনি?'

'নিশ্চয়! আমার সঙ্গেই এসেছে, কিন্তু লুকিয়ে। আমি জানতাম না। ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করিনি। অত তাজ্জব হয়ে তাকাবার কিছু নেই, শচী। একটু আগে বেরোবার সময় এই মানিকজোড় লোক দুটিকেই আমাদের বাড়ির সামনে পায়চারি কবতে দেখে এসেছিলাম। তখন প্রায় লক্ষ্যই করিনি, গুরুত্ব দেওয়া দূরের কথা। এখানে দেখেও প্রথমে কানেক্ট করতে পারিনি!'

শচীর মুখ যেন ফ্যাকাশে দেখাল। সে থ হয়ে সেকেন্ড দুই তাকিয়ে থেকে বলল, 'হেভি গণ্ডগোলে ব্যাপার মনে হচ্ছে। তোমার কোনও এনিমি? গুণ্ডাটুণ্ডা নয়তো? কী চায়!'

'কাল রাত থেকে অনেক ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে, ভাই। সাংঘাতিক সব কাণ্ড, শুনলে মাথা ঘুরে যাবে তোর।'

দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে শচী, যেন সেই আহিরীটোলা ঘাটের বানের মুখে ঝাঁপিয়ে-পড়া সেই শচী টানটান হয়ে ফিরে এল, বলল, 'তুমি বসো, বাছাধনদের একটু আড়ং-ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করে আসি। নিখরচায় একটু জলযোগ হয়ে যাক।'

যত সময় যাচ্ছিল, শচীর জন্যে ততই উদ্বেগ বাড়ছিল অতনুর। এমনিতে কোনও সাতে-পাঁচে থাকার ছেলে নয়, আত্মভোলা নিরীহ টাইপের। কিন্তু রেগে গেলে গোঁয়ার, একগুঁয়ে আর বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তখন নিজের ক্ষয়-ক্ষতি সর্বনাশের তোয়াক্কা করে না। বিশেষ করে অতনুর জন্যে ও সব পারে। অতীতের দু-চারটে ঘটনায় তার প্রমাণ পেয়েছে বলেই অতনু ওকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু আটকাতে পারেনি। পারেনি বলে আফসোসই হচ্ছিল। আর্মচেয়ারে শুয়ে পড়ে ভেতরে ভেতরে ছটফট করছিল অতনু। দেরি দেখে কেবলই মনে হচ্ছিল, রাস্তায় বেরিয়ে নিশ্চয় কোনও কাণ্ড বাধিয়ে বসেছে। শরীর-স্বাস্থ্যের ওই তো চেহারা, অতনুর বোধহয় ওর সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল।

হঠাৎ পায়ের শব্দ কানে আসতেই অতনু চোখ খুলে ধড়মড় করে খাড়া হয়ে বসেছিল। না, শচীদুলাল না, ওর বড়দি। বড়সড় একটা ট্রে দুহাতে ধরে ঘরে ঢুকলেন। চা করে আনতে গিয়েছিলেন, কিন্তু শুধু চা নিয়ে আসেননি, সঙ্গে টা-ও আছে। টিপয়ের ওপর ট্রে নামাতেই অতনু বুঝতে পেরে গেল ওঁর চা আনতে দেরি হওয়ার কারণটা। মনে হল বাড়ির কোনও ছেলেপুলেকে দোকানে পাঠিয়ে খাবার আনিয়েছেন। সদ্যভাজা মাটন-রোলের গন্ধ পাচ্ছিল অতনু। সেই সঙ্গে মিষ্টিও আছে এক প্লেট।

অতনু সসঙ্কোচে বলল, 'এ কী বড়দি, এ কী কাণ্ড করেছেন আপনি!'

'বাঃ, কী আর এমন, সামান্য। কতকাল পরে এলে, আমার কুপাল দেখো! তোমার সঙ্গে যে দু দণ্ড বসে গল্প করব তার উপায় নেই। এখুনি কলঘরে যাব গা ধুতে, নইলে জল চলে যাবে!' বলেই ঘরের অন্য প্রান্তে তাকিয়ে অবাক হলেন, 'ওমা! লালু কোথায়? একটু আগেই তার গলা শুনলাম যেন!'

অতনু একটু ইতস্তত করে বলল, 'হ্যাঁ, লালুই এসেছিল, এই মাত্র নিচে গেল কী দরকারে।'

'দেখেছ আমার পাগলা ভাইয়ের কাণ্ড! বেরোচ্ছিস তা আমাকে বলে যাবি তো? নিশ্চয় খাবার আনতে গেছে!'

অতনু মাথা নেড়ে বলল, 'না, অন্য দরকারে গেছে। এই এসে পড়ল বলে, আপনি যান, গা ধুয়ে আসুন গে। আমি চা-টা ঢাকা দিয়ে রাখছি।'

বড়দি ডিশ দিয়ে চায়ের কাপ ঢাকতে ঢাকতে নিজের মনে গজগজ করছিলেন, 'জানতাম, গরম খাবার ওর ভাগ্যে নেই। তুমি আবার তা বলে হাত গুটিয়ে বসে থেকো না যেন। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, জানলাটা কি বন্ধ করে দিয়ে যাব?'

অতনু মাথা নেড়ে না জানাতে উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। চা শেষ করে সবে সিগারেট ধরিয়েছে, শচী হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল, 'কোথাও খুঁজে পেলাম না, ভাই। ব্যাটারা শেয়ালের মত ধূর্ত। এ তল্লাট ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে। ধরতে পারলে বরাতে আজ দুঃখ ছিল। পাড়ার ছেলেরা—'

শুনে অতনু স্বস্তিই পেল। 'যাকগে, তুই মুখে-হাতে জল দিয়ে আয়। তোর চা বোধহয় এতক্ষণে জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে।'

হাত-মুখ ধুয়ে আসার ধৈর্য শচীর ছিল না। খাটের তলা থেকে একটা টুল টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল, 'তারপর বলো, গুরু! কাল রাত থেকে নাকি কী সব সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে চলেছে? কই তোমার সুবলদাদা তো আমাকে কিছুই বলল না তখন!'

'আরে সুবলদা থোড়াই জানে। ও কি বাড়িতে ছিল যে জানবে? তাছাড়া—তোকেই প্রথম সব বলব, প্রথম এবং শেষ। কিন্তু তার আগে কথা দিতে হবে।'

বোলে কামড় বসিয়েছিল শচী, মুখ ভর্তি। চোখ ঘুরিয়ে শুধু ভুরু উসকাল, অর্থাৎ কী কথা?

'ব্যাপারটা শুধু তোর আমার মধ্যে গোপন থাকবে, কাকপক্ষীতে যেন—'

খাবার দুরুস্ত করে কথা বলার অবস্থায় আসতে সেকেন্ড দুই-চার সময় লাগল শচীর। বলল, 'কী যে বলো! আমার কাকপক্ষী কোথায়, বুজুম ফ্রেন্ড বলতে শুধু তুমি। তাও অ্যাদ্দিন পর। বাইরের কথা ঘরেও না! বড়দি পর্যন্ত আমার একটা কথা জানে? ঘরে ঢোকার আগে মাউথ ওয়াশ। মুখে কুলুপ, বুঝেছ?'

ওর কথা বলার একটা মজাদার ভঙ্গি আছে, অতনু হেসে না ফেলে পারেনি। বলল, 'বেশ, কিন্তু বন্ধু হয়েও এরকম 'তুমি তুমি' করে কথা বললে আমার কেমন অস্বস্তি লাগে। এখন থেকে 'তুই', কেমন?'

শচী হাত জোড় করল, 'ওটি বলো না গুরু, পারব না। তুমি আর আমি, কিসে আর কিসে! আমি হচ্ছি গিয়ে তোমার থার্ড কেলাস বন্ধু। তোমাকে কী চোখে দেখি জানো না! আজ সকাল থেকে এক ফোঁটাও গলায় ঢালিনি, কেন জানো! শুধু তুমি বলেছিলে বলে। তাই একটু মান্যি তোমাকে নিতেই হবে।'

অতনু স্মিত মুখে তাকিয়ে ছিল। সহাস্যে বলল, 'এ যে ভূতের মুখে রামনাম

শুনছি! করেছিস কী! সকাল থেকে তাহলে স্রেফ র-ওয়াটার চলেছে। স্টমাক নিচ্ছে তো? লিভার ড্যামেজ হলে কিন্তু আমি জানি না বাপু!'

'ঠাট্টা রাখো। তোমার টপ্ সিক্রেট হিস্টিরিটা এবার শোনাও। দাঁড়াও, তার আগে—'

শচী উঠে গিয়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে দিয়ে এসে বসল। অতনু ওর দিকে একটা সিগারেট বের করে দিতে দিতে বলল, 'কোত্থেকে শুরু করব ভাবছি।'

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে শচী বলল, 'আমাকে লাস্ট দেখা হওয়ার পর থেকেই হোক। আগে তোমার পৌঁছা-সংবাদ শুনি!'

শনিবারের রাতের ঘটনার সঙ্গে ম্যানুস্ক্রিপ্ট আর ফিল্ম চুরির ব্যাপারটা জুড়ে দিয়ে সব সবিস্তারে বলার পর অতনু থামতেই আগ্রহে টানটান শচী বলল, 'আজ সক্কালে থালে তুমি কোথায় বেরিয়েছিলে, রঞ্জুপ্রসাদের ওখানে যাওনি নিশ্চয়?'

'ইন ফ্যাক্ট ওখানেই গিয়েছিলাম। আমার গল্পের সেকেন্ড পার্ট আগে শোন। সবচেয়ে বড় রহস্য, ঘটনার ক্লাইম্যাক্স, ওখানেই।'

চোখে-মুখে গভীর উত্তেজনা আর উদ্বেগ নিয়ে শচী অতনুর কাহিনী শুনছিল। একটাও 'হুঁ-হাঁ-তারপর' করেনি। নিজেকে দমিয়ে রাখতে মাঝে মধ্যে দাঁতে নখ কাটছিল, এই পর্যন্ত।

কাহিনী এসে আহিরীটোলা বাই লেনের তেতলার ঘরে ঢুকে থেমে যেতেই শচী অস্ফুট গলায় বলে উঠল, 'উফ্, কী সাংঘাতিক!'

'সে তো একশোবার। কিন্তু সব শুনে তুই কী বুঝলি? কী মনে হচ্ছে তোর?'

'আমি! আমি আবার কী বলব? সব গুলিয়ে যাচ্ছে মাথার ভেতর। একটা বিরাট জট-পাকানো ধাঁধার চক্কর ছাড়া কী? তবু যে ভগবানের দয়ায় ফাঁদ কেটে বেরিয়ে আসতে পেরেছ—'

'পেরেছি কি?' স্বগতোক্তির মত অতনু অস্ফুট গলায় বলে।

'অ্যাঁ! কী?'

'বলছিলাম তোর কিছু সন্দেহ হয় না?'

একটু চুপ করে থেকে শচী বলল, 'দ্যাখো, আমার মনে হয় রঞ্জুপ্রসাদ লোকটা জালি। ও-নামে কেউ নেই। ওই নিমাই ঘোষ লোকটাও ধোয়া তুলসীপাতা ভেবো না। কিন্তু সবচে মুশকিল কী বলব? তোমার শত্তুর পার্টি যে কটা, আর কারা যে কী চায় সেটাই আমি ঠাওর করতে পারছি না।'

'হুঁ!' বলে অতনু নিজেও কথাটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

শচী বলবে কি বলবে না করে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেলল, 'মেয়েটা কে গুরু? তোমার সঙ্গে খুব দোস্তি মনে হল!'

'ফোনে তোর সঙ্গে কথা বলেছিল, সে? আরে আমি তো তার কথাই জানতে এসেছি। সুবলদা বলল তুই সব জানিস, তোর সঙ্গে কথা হয়েছে।'

'আমার সঙ্গে! কোথায়? মহিলা তোমার সঙ্গে কথা বলছিল, কী ঝাঁজ, বাপস্! কে জিজ্ঞেস করতেই তেতে উঠল। বলল, কী অসভ্য লোক! এভাবে কেউ যায়!'

'তারপর?'

'আমি ঘাবড়ে গিয়ে ভাবলাম তোমার লাভার-টাভার কেউ, আমাকে 'তুমি' বলে ভুল করছে। বললাম—দেখুন আমি—। তা কানেই নিল না, বেধড়ক বলেই চলল—শেষে কিনা পেপারে তোমার অ্যাড দেখে আমাকে জানতে হল! মানুষের মনে কী রকম চাপ—! আমি আর বাড়তে দিলাম না, মাইরি বলছি, নিজেকে চোরচোট্টা মনে হচ্ছিল। তোমাদের লাভ-অ্যাফেয়ার বাবা! ফস করে কী শুনতে কী শুনে ফেলব শেষে। বললাম, দেখুন ম্যাডাম, আপনি কে জানি না, কিন্তু আপনি ভুল করছেন। আমি অতনু না, অতনু একটু বেরিয়েছে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে লাইন কাট্। অতনু, মেয়েটা কে ভাই? তোমার হবু নাকি?'

অতনু মাথা ঝাঁকাল, 'না, তুই যা ভেবেছিস তা না। লাভ-লোকসান কোনও অ্যাফেয়ারই আমি চালাচ্ছি না। পুরো ব্যাপারটাই বুঝতে পারছি ধোঁকা, সাজানো।'

কেমন অবিশ্বাস আর বোকা-বনে-যাওয়া গলায় শচী বলল, 'যাঃ! মেয়েটা তাহলে ফল্‌স দিচ্ছিল?'

'দিচ্ছিল না? আরে বাবা, আমার যদি কোনও মান-অভিমানের পালাই চলবে, তাহলে সকলের আগে তো আমিই জানব। জানব না?'

'সেটা ঠিক।' শচী দোনামনা করে বলল, 'আর চললেও সেটা আমার কাছে গোপন করারই বা কী ছিল! প্রেম-ট্রেম নিয়ে আজকাল কেউ মাথাই ঘামায় না। আমি ভাবছি মেয়েটা আবার কোন দলের? ওভাবে ফোন করার উদ্দেশ্যই বা কী?'

অতনু বলল, 'উদ্দেশ্য-বিধেয় কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না। এই তো, তোর এখানে আসার একটু আগেই অবার ফোন এসেছিল।'

শচী অবাক হয়ে বলল, 'তাই? কী বলল?'

'নাথিং। ফোন তুললাম, কোনও শব্দ নেই। আমি নিজের নাম বলতেই আস্তে করে ফোন রেখে দিল। কী রকম তামাশা তুই ভাব! গলাটাও শুনতে পেলাম না।'

কিন্তু গলা শুনতে পেলেই বা কী লাভ হত? খুব দ্রুতগতিতে চিন্তা করছিল অতনু, আবার সেই বানানো গল্পটাই হয়তো রিপিট করত। তাকে কোনও কথা

বলার সুযোগ না দিয়ে একতরফা বলে যেত, যেমন শচীকে বলেছে। অতনু বড়জোর কথার মাঝখানেই বলে উঠত, এসব কী বলছেন, বাজে কথা, মিথ্যে কথা, কে আপনি? ও-প্রান্ত থেকে তার জবাবে কানেকশনটা কেটে দেওয়া হত সঙ্গে সঙ্গে। তাই তাতে কিছু ফায়দা হত না। সুতরাং বলা না-বলায় ফারাক নেই। তবে কিছু না বলার একটা কারণ থাকতে পারে। একই নাটক দুবার জমানো যায় না। বিশেষ করে তার কথাগুলো যে অতনুর কানে পৌঁছে দিয়েছে তার বন্ধু, এ-বিষয়ে তার সন্দেহ থাকার কথা নয়। আসলে কথাগুলো নিছকই অজুহাত, ছুতো, উপলক্ষ। কিন্তু কিসের উপলক্ষ? এই ফোন আসার ফলে অতনুর মনে একটা প্রতিক্রিয়া হবে, সে চিন্তিত হবে, মাথামুণ্ডু কিছু ভেবে পাবে না। সামান্য সময়ের জন্য বোকা হয়ে যাবে, এই পর্যন্ত। কিন্তু তাতে কার কী উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে? এমন নয় যে অতনু ভয় পাবে, যার কোনও ভিত্তি নেই, তা থেকে ভয় পাবার কী থাকতে পারে? অবশ্য এটা একটা কাকতালীয ব্যাপারও হতে পারে। তাই বর্তমান সমস্যার সঙ্গে এর হয়তো কোনও যোগই নেই। অনেক সচ্ছল ঘরে মানসিক রোগগ্রস্ত মহিলা থাকে যাদের কোনও কাজ নেই, হাতে অফুরন্ত সময় আর সামনে টেলিফোন। ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিযে যাকে পায় তার সঙ্গে কথা বলে। মনোবিজ্ঞানে এক বিশেষ ধরনের রোগীর কথা জানা যায়, যারা নিজেকে অন্য কোনও চরিত্র বলে বিশ্বাস করে। নিজের সত্যিকারের পরিচয় ভুলে গিয়ে অন্য ভূমিকায় তারা নিজেকে বসিযে নেয়। কেউ কেউ নিজেকে ইতিহাসের কোনও বিখ্যাত ব্যক্তিত্বও ভেবে নেয়। একে সজ্ঞানে অজ্ঞান, না অজ্ঞানে সজ্ঞান আচরণ বলবে অতনু? শুধু টেলিফোনেই নয়, দিনের পর দিন পাতার পর পাতা চিঠি লেখারও নাকি নজির আছে। এমনকি মানুষের মুখোমুখি হয়েও তারা কাল্পনিক মনমেজাজ আর কাহিনীর বাসিন্দা হয়ে যায়। এই টেলিফোনের ব্যাপারটা সেরকম কিছু হলে তার আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু তাই বলে ওই মানিকজোড়ের আবির্ভাব সে মন থেকে ধুয়েমুছে ফেলতে পারছে না। ধরে নেওয়া যায়, কেউ বা কারা তার এই পারিবারিক রত্নমূর্তির ইতিহাস লেখা পছন্দ করছিল না। সেইজন্যে মোক্ষম কাজটুকু তারা নিঃশব্দে সেরে ফেলেছে। তার অনেক যত্নে লেখা তথ্যবহুল চ্যাপ্টারগুলো যেন ছেঁকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে মূল্যবান ফিল্মটাও। এখন ডকুমেন্ট হিসেবে আর কিছুই তার হাতে নেই। যা ছিল সবই তো গেছে, এক ধাক্কায় সে পিছু হটে গেছে কয়েক বছর। তবু এখনও কেন তাকে চোখে চোখে রাখা হচ্ছে, বুদ্ধিতে তার ব্যাখ্যা পাওয়া শক্ত। তার কাছে আর কী এমন সামগ্রী আছে যা ওরা হাতাতে পারে? অনেক ভেবেও, আকাশ-পাতাল হাতড়েও তেমন কিছু মনে করতে পারল না।

শচী নীরবে অতনুকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল, একটাও কথা বলেনি। তার নিজের

মাথার মধ্যেও যে এলোমেলো চিন্তা ছুটে বেড়াচ্ছিল না তা নয়, কিন্তু বন্ধুর থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে ভেতরে ভেতরে খুব কষ্ট পাচ্ছিল। নিজের কথা ওর ওপর চাপিয়ে আর ওর বোঝা না বাড়ানোই ভাল। লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে শচী বলল, 'আর ভেবে কী হবে, তোমার যা ক্ষতি হবার তা তো হয়েই গেছে, এগুলো আর উদ্ধার করাও যাবে না। কারণ আমি যা বুঝতে পারছি, পুলিশের সাহায্য তুমি নিতে পারছ না।'

অন্যমনস্কতা ভেঙে ফিরে আসতে অতনুর মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, 'কেন?' তারপর নিজেই মাথা দুলিয়ে স্বীকার করল, 'ঠিক। পুলিশের কাছে আমার যাওয়া চলবে না।'

'তোমাকে এখন থেকে সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। হুটহাট বাড়ি থেকে না বেরোনোই ভাল। চলো তোমাকে আমি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।'

অতনু হাসল, 'কেন, বডিগার্ড হয়ে? দ্যাখ্ শচে, আমি ছেলেমানুষ নই, আমাকে রাস্তা থেকে কিডন্যাপ করে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না, তুই নিশ্চিন্ত থাক। ওরকম দু-পাঁচজন লোকের মহড়া আমি নিতে পারি। স্বচ্ছন্দে।'

শচী বলল, 'তা নয়, আমি তফাত থেকে তোমাকে ফলো করে বাড়ি পর্যন্ত যাব। দেখব ওই লোক দুটো ছাড়াও অন্য কেউ তোমার পিছু নিচ্ছে কিনা। ওদের জালটা কী রকম ছড়ানো সেটা স্বচক্ষে একবার দেখে নেওয়া দরকার।'

অতনু জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, 'না। আমরা দুজনে যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং যোগাযোগ আছে, সেটা বাইরে প্রকাশ না করাই ভাল। এখন কিছুদিন তুই আর আমার বাড়িতে আসিস না, দরকার হলে কোথাও থেকে টেলিফোন করবি। আমি আসব। এই সাতগুষ্টির বাড়িতে আমি কেন আসছি, কার কাছে আসছি, সে জানা শক্ত হবে।'

অতনুর পরামর্শ শচীর খুব মনঃপূত হল না। মুখে সেটা প্রকাশ না করে বলল, 'তা ঠিক, মানিকজোড় বোধহয় আমাকে ঠাওর করতে পারেনি। কিন্তু তোমাকে দেখে ফেলেছে। আসলে দোতলা তিনতলার অন্য জানলাগুলো তো বন্ধ আছে, শুধু তিনতলার এই ঘরের জানলাটাই খোলা ছিল। সেজন্যেই ওরা জানলাটার দিকে নজর রেখেছিল। তারপর আলো জ্বলে ওঠায়, তুমি যখন মুখ বাড়ালে তখন দেখে ফেলল। তুমি জানো না বোধহয়, দিদি কি আর তোমাকে বলেছে যে, সামনের পোরশনের ঘর দুটো এক ডাক্তারখানাকে মোটা টাকায় ভাড়া দিয়ে পেছন বাড়ির এই তিনতলায় আমরা সরে এসেছি। আদ্যিকালের এই এজমালি বাড়িতে মাত্র দেড়খানা ঘর আমাদের ভাগে পড়েছে। তাতে কিছু অসুবিধে হয় না। আমরা তো তিনটি প্রাণী।'

'তোরা তিনজন মানে?'

'বিধবা হবার পর বড়দি মনুর হাত ধরে এখানেই এসে উঠেছিল। মনু আমার ভাগনে। ও তখন একেবারেই ছেলেমানুষ। মাত্তর ক্লাস সিকসে উঠেছে।'

অতনুর এই ইতিহাস জানা ছিল না। বুঝল অনেক ঝড়-ঝাপটা গেছে শচীর ওপর দিয়ে।

দুঃখিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ও এখন কত বড়, কী পড়ছে?'

শচী বলল, 'ছেলেটার খুব মাথা ছিল। ইকনমিকসে অনার্স নিয়ে পাস করে ব্যাঙ্কে ঢুকেছে। আবার নাইটে কী সব পড়ছে।'

'হুঁ।' একটু চুপ করে থেকে অতনু বলল, 'এনিহাউ আমি তোকে আর বিপদের মধ্যে জড়াতে চাই না।'

একটু ইতস্তত করে শচী ম্লান হাসল, 'তুমি না চাইলে কী হবে, মনে হচ্ছে আমিও অলরেডি জড়িয়ে পড়েছি।'

কথাটা খট করে বেসুরো লাগল। অতনু ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ব্যাপারটা কী বল তো শচী? এখন মনে পড়ছে কাল তুই বলেছিলি, কথা আছে। খুব দরকার।'

'সে লং স্টোরি। আজ বাড়ি যাও। পরে সময় করে শুনবে।'

'নারে বাবা না, আজই, এখনই শুনব। তোর কথা শুনব, বেরোবার সময় সেটাও ভাবা ছিল কিন্তু এই উটকো ঝামেলায় ভুলে গিয়েছিলাম। আমার কোনও তাড়া নেই, লংগেস্ট স্টোরি হলেও মন দিয়ে শুনব। বল্!'

শচী একটু চুপ করে থেকে দুম করে বলল, 'বহ্নিদেবী বলে কারও নাম শোনা আছে?'

অতনু চমকাল। শচীর মুখের দিকে সজাগ চোখে তাকিয়ে বলল, 'শোনা আছে, দেখা আছে, জানাও আছে। ফিল্মস্টার তো? নামকরা এ্যাকট্রেস। আমি যতদূর জানি, বম্বের আবিষ্কার। এখানে প্রথমে বিশেষ পাত্তা পাননি। পরে, ওয়ান ফাইন মর্নিং, হিন্দি ছবির দুনিয়ায় সবাই চমৎকৃত হয়ে এই অভিনেত্রীকে রুপোলি পর্দায় প্রত্যক্ষ করল। নাচে-গানে চৌকস এই মেয়েটি যে আদতে বাঙালি সেকথা জানতে কিছু সময় লেগেছে। এখন অবশ্য এখানেও তাঁর খুব ডিমান্ড। রাইট? কিন্তু হঠাৎ বহ্নিদেবী কেন? তোর সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক?' অতনু কথার শেষে ঠোঁট টিপে হাসল।

শচীদুলাল ওর হাসির টিপ্পনী তাকিয়ে তাকিয়ে হজম করল, নিজে হাসল না। গম্ভীর গলায় বলল, 'বহ্নিদেবী আমাকে একটু ফ্যাসাদে ফেলে দিয়েছে, গুরু। গোড়া থেকে না বললে ঠিক বুঝবে না।'

আর্মচেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে অতনু বলল, 'গোড়া থেকে তো বটেই, শেকড় থেকেও শুরু করতে পারিস। তুই বলে যা, আমি শুনছি। ফিল্মইস্টার বলে

কথা, তাও আবার ফ্যাসাদে ফেলে দিয়েছেন—কী জানি শেষ পর্যন্ত রোমাণ্টিকও হয়ে দাঁড়াতে পারে!'

'লেখাপড়া যখন হলই না, দুগ্গা বলে লেগে পড়লাম হাতের কাজ শিখতে। লেগে পড়লাম বললে ভুল হবে, বাবার এক বন্ধুর ইলেকট্রনিক্সের মস্ত সেণ্টার, তিনিই আমাকে হাতে ধরে কাজে লাগিয়ে দিলেন। অনেক মেকানিক আমি এ যাবৎ দেখেছি কিন্তু ওঁর মত যন্ত্রের জাদুকর আমার জীবনে দ্বিতীয় দেখিনি। যে কোনও মেকের সেট তাঁর নখদর্পণে, এক নজরে রোগ ধরে ফেলার আশ্চর্য ক্ষমতা যেমন আছে, তেমনি শিক্ষক হিসেবেও তিনি অসাধারণ। আমি ওঁকে জ্যেঠু স্যার বলে ডাকি। ওরকম দিলওয়ালা মানুষও তুমি এ যুগে আর একটা দেখতে পাবে না। তোমার কথামত আমি কিন্তু শিকড়-বাকড় থেকেই শুরু করেছি। স্যার আমাকে ভূতের মত খাটিয়েছেন, বকেছেন, ভুল করলে চড়-চাপড় পর্যন্ত মেরেছেন। আবার কাছে বসিয়ে, পিঠে হাত বুলিয়ে, বই-পড়া বিদ্যের রাংঝাল দিয়ে পোক্ত করার মেহনত করেছেন। এ সবই প্রথম দিকের ব্যাপার। এক একসময় রাগও হত, কান্না পেয়ে যেত, সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে যাবার কথাও ভাবতাম। ভাগ্যিস পালাইনি। কয়েক বছরের মধ্যেই আমি ওঁর সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠলাম, শেষে নির্ভরযোগ্য শাগরেদ। আমাকে স্বাধীনভাবে এখানে ওখানে কাজ করতে পাঠাতে লাগলেন। আমার সুনাম হতে থাকল, রোজগারপাতি বাড়তে থাকল। টাকাপয়সার ওপর আমার কোনওদিন ভেতর থেকে টান ছিল না। তাই জ্যেঠু স্যারের সেণ্টার ছেড়ে আমি এক পাও নড়লাম না, সেঁটে থাকলাম।

'এবার কয়েক মাস আগের কথা বলি। একদিন সেণ্টারে গিয়ে শুনি জ্যেঠু স্যার আমাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছেন। এক্ষুণি যেন তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। ছুটে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি এক কাণ্ড। স্যার বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছেন। পা মচকে ফুলে ঢোল। একটা ঠিকানা-লেখা চিরকুট আমার হাতে দিয়ে বললেন, এক্ষুণি চলে যাও। ভিসিআর গণ্ডগোল করছে বোধহয়। আমার পার্সোনাল কেস, নিরুপায় হয়ে তোমাকে পাঠাচ্ছি। মুখ থাকে যেন। সত্যি বলতে কী, দায়িত্বটা কাঁধে চাপায় একটু নার্ভাসই বোধ করেছিলাম। রাস্তায় বেরিয়ে চিরকুট খুলে দেখি, যাঁর কল পেয়ে যাচ্ছি তাঁর নাম নেই। শুধু বাড়ির নাম আর নম্বর রয়েছে। নাম লিখতে জ্যেঠু বোধহয় ভুলেই গেছেন। তা হোক, বাড়িটা খুঁজে বের করতে পারলে নিশ্চয় শেষ পর্যন্ত আটকাবে না। কিন্তু আটকাল, ফটকে দরোয়ান পথ আগলে দাঁড়াল। কী জন্যে আর কার কাছ থেকে আসছি বলায় ভেতরে ঢুকতে পেলাম। কাজের লোক আমাকে সঙ্গে করে ওপরে নিয়ে গিয়ে ঘর দেখিয়ে দিল। ঘরের ভেতর পা দিয়েই আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠল। এত চেনা মুখ যে বিশ্বাসই হচ্ছিল না আমি তাঁকেই দেখছি।

অপ্রসন্ন মুখে ভুরু কুঁচকে মহিলা বললেন, আপনি এসেছেন? শ্রীকণ্ঠবাবুর কী হল? ঘটনা বললাম। একটুক্ষণ কী ভাবলেন। শেষে সন্দিগ্ধ গলায় বললেন, ঠিক আছে, দেখুন চেষ্টা করে। আমার দামী সেটটা যেন নষ্ট না হয়। বলেই আঙুল তুলে দেওয়ালের দিকে দেখালেন।'

অতনু মুচকি হেসে বলল, 'বহ্নিদেবী?'

'হ্যাঁ, বহ্নিদেবী। আমি প্রথম দর্শনেই চিনতে পেরেছিলাম। এই বয়সেও (যদিও চোখে অনেক কম মনে হয়) ভদ্রমহিলা রীতিমত রূপসী। কিন্তু সেজন্যে নয়, আমি দ্বিতীয়বার চোখ খুলে ওঁর মুখের দিকে তাকাতে সাহস করিনি। হয়তো ওঁকে চিনতে পারার বেচাল উল্লাস আমার অবাধ্য চোখ দুটোয় ঠিকরে বেরোতে পারে, তা আমি চাইনি। আমি—'

হাত তুলে ইশারায় অতনু ওকে থামিয়ে বলল, 'তোর বর্ণনা শুনে একটা কথা না বলে পারছি না, তোর ভেতর দুটো শচে আছে। একজন সেই ক্লাস এইটের গাব্বু-খাওয়া ছেলেটা, যে মুখ্যু, কথার আড় ভাঙেনি, যে আহিরীটোলার নাবো ঘরানায় আটকে আছে, বাকি আধখানা শচীদুলাল—'

শচী বলল, 'বুঝেছি! এটাও জ্যেঠু স্যারের কীর্তি। আমাকে মানুষ করেছেন, শুধুই মেকানিক না। কেন, তুমি কখনও কলকাতার শিক্ষিত বাঙালদের ঘরের ডায়ালগ শোনোনি। মনে হবে বাইরের চুনোট-করা ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি পরল। যাকগে, শোনো তারপর—আমি স্প্রিংয়ের পুতুলের মত আড়ষ্ট পায়ে ভিসিআর-এর দিকে এগোচ্ছিলাম। হঠাৎ দেওয়ালের দিকে নজর পড়তেই যেন পেরেক-আঁটা পায়ে স্ট্যাচু হয়ে গেলাম। এ আমার কল্পনার বাইরে ছিল। প্রমাণ সাইজের এনলার্জ করা সেই বাঁধানো ফটোটা দেখে আমি চমকে গেলাম না-বলে মচকে গেলাম বলাই ভাল।'

ফটোর কথায় অতনুরও চমক লেগেছিল কিন্তু কোনও প্রশ্ন করে শচীকে আর বাধা দিল না। একটা ঘোরের মধ্যে স্বতস্ফূর্তভাবে ও বলে চলেছে, ওর সে-সময়কার মানসিক অবস্থা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল অতনু। শচী থামেনি, ওর মনের কুয়াশা ক্রমশ কেটে যাচ্ছিল। বলল, 'আমি ভূত দেখার মত ছবিটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, চোখ সরাতে পারছিলাম না। হ্যাঁ, ভূত ছাড়া আর কী, আমার বাবা কবে মরে ভূত হয়ে গিয়েছিল অথচ তার ছবি, সকালবেলার খবরের কাগজের মত টাটকা। ফুলের মালা, চন্দনের ফোঁটা আর দামী ধূপের জ্যান্ত ধোঁয়ার ভেতর থেকে বাবা যেন এই মাত্তর হেসে উঠেছে, এক্ষুণিকার সেই হাসিটা এখনও ঠোঁট থেকে মিলিয়ে যায়নি। মনে পড়ল আমাদের ঘরে বাবার একটা খাটে-শোয়ানো ছবি আছে। ফুলে ফুলে ছয়লাপ শ্মশানঘাটের সেই ফটোতে অচেনা এক মড়ার ছবি, বাবা ছিল না। আর তার পাশে এক জোড়া পায়ের আলতা-ছাপ বরাবরই আমার চোখে বীভৎস

ঠেকত। কেমন ভূতুড়ে অস্বস্তি হত দেখলে। তাই মা মারা যাবার পর এক বিখ্যাত তেল কোম্পানির ম্যাক্সি সাইজের সচিত্র ক্যালেন্ডার দিয়ে ওগুলো ঢেকে দিয়েছি।

'বহ্নিদেবী কখন আমার ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন আমি খেয়ালই করিনি। আমার মাথায় এখন একটা ব্যাপারই চক্কর দিয়ে ঘুরছিল। এরকম একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীর ঘরে আমার বাবার ছবি কেন, ভাবতে গিয়ে সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পিছনে গলা শুনলাম, কী হল আপনার? গলার স্বরে বেশ বিরক্তি আমার কান এড়াল না। আমার মুখ দিয়ে কথা বেরোল না, শুধু আঙুল তুলে ফটোটা দেখালাম। বহ্নিদেবীর এবার অবাক হবার পালা। বললেন, চেনেন নাকি ওঁকে? আমি সংক্ষেপে বললাম, হ্যাঁ। ভদ্রমহিলা হাসলেন, আপনি ভুল করছেন। অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন নিশ্চয়। ছবির মানুষটিকে আপনার চেনার কথাই নয়। কত বয়েস? আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, কার? আপনার। বয়স বললাম। এবং জোরের সঙ্গেই বললাম, চিনি। উনি হেসে ফেলে বললেন, উনি যখন গত হয়েছেন তখন আপনি—হাসি চাপতে গিযে গম্ভীর হয়ে তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন, সে যাকগে...নাম জানেন? আমাব রাগ হল, বললাম, আমি মিথ্যে কথা বলি না, আমার চোখ ভুল করে না। উনি শঙ্কু গোঁসাই, শঙ্কাহরণ গোস্বামী, আমার বাবা! আমি জানতাম না আমার শেষ শব্দটা বোমার মত ফেটেছে। বাবা!—কাঁপা গলায় আমার কথার প্রতিধ্বনি করে বহ্নিদেবী আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন, বোধহয় আমার মুখের আদলটা খুঁটিয়ে দেখার জন্যেই। আমার বাবার চেহারা আমি অনেকখানিই পেয়েছি, ছেলেবেলা থেকেই কথাটা আমি শুনে এসেছি।' দম নেবার জন্য শচী থামল।

অতনু বলল, 'একটা কথা কিন্তু উনি ঠিকই বলেছিলেন। তোর বাবা যখন মারা যান তখন তোর কতই বা বয়স! হার্ডলি চার-পাঁচ কি ছয়? সবে ইজের ধরেছিস। ফটো দেখামাত্র এত নিশ্চিত করে চিনে ফেললি, আমারই আশ্চর্য লাগছে।'

'না, তনু, আমার তখন সাত। বয়স কোনও ফ্যাক্টরই না, যদি চারও হত, ঠিক মনে থাকত। ছেলেবেলার অনেক কিছু ভুলে গেলেও, বাবার মুখ? অসম্ভব। ওই বয়সে উনি আমার মনের কতখানি জুড়ে ছিলেন, কাউকে বোঝাতে পারব না। বছরে তিন-চার মাসের বেশি ওঁকে কাছে পাবার সুযোগ হত না আমাদের, তাই বোধহয় অমন উজাড় করে ঢেলে দিতেন নিজেকে। সত্যি কথা বলব তনু, ওই অপর্যাপ্ত ভালবাসাই আমার কাল হয়েছিল। আদরে আদরে যাকে বলে বাঁদর, তাই হয়ে গিয়েছিলাম।' বাবার স্মৃতির উদ্দেশে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাথা হেঁট করে বসে থাকল শচী। অতনু কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার

আগেই শচী আবার মুখ খুলল, 'হ্যাঁ, আব একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি, দেওয়ালের ওই ফটোর তলায় ছাপার হরফে 'নটরাজ' কথাটা লেখা ছিল। ওটা বাবার উপাধি। শুনেছি ওঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমানের মহারাজা ওই খেতাব ওঁকে দিয়েছিলেন। যাকগে, আসল ব্যাপারটা থেকে আমি বারবার সরে যাচ্ছি, আর সময় নেব না, এবার সংক্ষেপে বলি। এক নিমেষে সব দূরত্ব, সব ব্যবধান ঘুচিয়ে আমাকে একেবারে আপন করে নিলেন বহ্নিদেবী। আমি হয়ে গেলাম ওঁর ভাই, গুরুভাই, আর উনি দেবীদিদি। স্বীকার করতে লজ্জা করছে, বয়সের দোষে আমি যা সন্দেহ করেছিলাম তা নয়। এখনও আমার বাবাকে দেবীদিদি পিতৃতুল্য গুরুর মতই ভক্তি করেন। একেবারে পাখিপড়া করে অভিনয় শিখিয়েছিল বাবা। শুধু তাই না, ওঁর উন্নতির মূলেও ছিল বাবা। বোম্বাইযের যোগাযোগটা বাবার চিঠি ভিন্ন হতই না। অথচ বাবা যখন মারা গেল দেবীদিদি তখন বম্বেতে, একসঙ্গে চারটে ছবিতে শুটিং চলছিল, আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, শহর ছেড়ে এক পা নড়বার উপায থাকলেও লাভ হত না। ডুয়ার্সের চা-বাগানে পালা করতে গিয়ে নটরাজের দেহান্ত হবার খবর দেবীদিদির কাছে পৌঁছল সাত দিনের বাসি হয়ে। তখন সব শেষ। এই আফসোস পুষেই রেখেছিলেন এতকাল। আমাকে পেয়ে যেন বর্তে গেলেন। গুরুঋণ শোধ করার সুযোগ জুটে গেল এইভাবে। আমাদের প্রথম সাক্ষাতের দিনটা আর একটা কারণে স্মরণীয়। ওটা ছিল বাবার মৃত্যুদিন।

'সেই থেকে ও-বাড়ি আমার কাছে অবারিত দ্বার। কাজের ফাঁকে-ফোকরে সুযোগ পেলেই ঘুরে আসতাম। কলকাতার ঐ বাড়িটা ছিল অজ্ঞাতবাসের জায়গা। গোপন ডেরা। কেউ জানত না। আমিও কাউকে বলিনি। এদেশের ভক্তের চেহারা তো তুমি জানো, সিনেমা-থিয়েটারের লোকগুলোও সবাই ভাল না। বিশেষ করে কেচ্ছাখোর চিত্রসাংবাদিক, যারা তিলকে তাল করে তোলে। একদিন দিদিকে খুব উদাস আর চুপচাপ দেখলাম। আমাকে ডেকে বললেন, শোন, এবার আমি রিটায়ার করব ভাবছি। আচমকা কথাটা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়লাম। চাকরিবাকরি থেকে মানুষ রিটায়ার করে, কিন্তু এ তো স্বাধীন জীবিকা। এখনও গ্ল্যামার রয়েছে দেবীদিদি। আমার কথা শুনে উনি কেমন মরা হাসি হাসলেন। বললেন, সব গ্ল্যামার একদিন গোবরজল হয়ে যায় দেখিসনি? তার চে বেলাবেলি নিজেকে গুটিয়ে নেওয়াই ভাল। অনেক বছর তো একটানা কাজ করলাম, আর না। পরের গল্পে বহুৎ ঘরসংসার করলাম, অনেক হল, এবার নিজের মত করে বাঁচতে চাই। শুনে খুব অভিমান হল, কেন হল আমি নিজেই জানি না। দেবীদি আমার নিজের দিদি না, কেউ না। ঘটনাচক্রে একদিনের হঠাৎ আলাপ। আমার রাগ-অভিমানের কি ছিল বলো? এক একসময় এমনি ছেলেমানুষী করে ফেলি। কোনও কথা না বলে চলে আসবার জন্যে পা

বাড়িয়েছিলাম, বললেন, একটু দাঁড়া। আমি—' বাধা পড়ল। দরজায় কেউ আস্তে আস্তে ধাক্কা দিচ্ছে মনে হল। ঠোঁটে আঙুল রেখে শচী ঝট করে উঠে দাঁড়াল। শব্দহীন দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজার পাল্লা খুলে ধরল। অতনু দেখতে পেল শ্যামলা রঙের ছিপছিপে চেহারার একটি ছেলে। শচী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার মনু!'

মনু বলল, 'মা বলে পাঠাল, তোমরা কি আর এক পাট্টি চা খাবে?'

শচী পিছন ফিরে অতনুর দিকে তাকাতে অতনু মাথা নাড়ল। শচী বলল, 'না, থাক। তুই আর কিছু বলবি?'

'তোমার খাটের ওপর আমার লাইব্রেরির বইটা আছে, মামা।'

বই দিয়ে মনুকে বিদায় করে শচী দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল। অতনু বলল, 'তোর নার্ভ টেন্সড হয়ে আছে দেখছি। নর্মাল থাকবার চেষ্টা কর।'

টুলের ওপর বসে পড়ে এক লহমা চুপ করে কী ভাবল। নর্মাল হবার চেষ্টা, নাকি তাল কেটে গিয়ে আগের খেই হারিয়ে ফেলেছে, বোঝা যাচ্ছিল না! একটু পরে নিচু হয়ে খাটের তলা থেকে বাক্স-তোরঙ্গ সব টেনে টেনে বের করতে লাগল।

অতনু বলল, 'কী খুঁজছিস?'

শচী উত্তর দিল না। ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে আবার নিজের কাজে মন দিল। অতনু বুঝল ও কিছু একটা খুঁজছে কিন্তু সেটা কোথায় রেখেছে বোধহয় মনে করতে পারছে না। দরকারী কিছু হলে নিজের রাখা জিনিসের খোঁজে মানুষকে এরকম অন্ধের মত হাতড়ে বেড়াতে হয় না। কোনও কাজে লাগবে না ভেবে হেলায়-ফেলায় ফেলে রাখা জিনিস তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা এখনই এরকম পাগলের মত খুঁজতে হবে? দেবীদিদির কথা বলতে গিয়ে ও আজ একটু বেটাল হয়ে গিয়েছে।

অতনু বলল, 'ও পাবি না শচী, হারিয়েছে।'

শচী প্রায় আর্তনাদের গলায় বলল, 'কে নেবে? এখান থেকে কে নেবে!' বলতে বলতেই একটা ভাঙা তোরঙ্গের ভেতর হাঁটকে একটা ফ্লাস্ক টেনে বের করল। তারপর সেটা ঝাঁকিয়ে পরখ করতে করতে বলল, 'এই তো! তুমি যা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে, গুরু!'

'কী ওটা? ফ্লাস্ক নয় নিশ্চয়! কার্ডবোর্ডের কভারের ভেতরে কি আছে?'

'একটা জিনিস। দেবীদিদির দেওয়া উপহার। দিয়ে বলেছিলেন, আমি তোকে তো কখনও কিছু দিইনি, এটা দিলুম। পরে আর সময় পাব কিনা জানি না, আজই নিয়ে যা। সাবধানে রাখিস। গোপনে। এটা যার কাছে থাকে তার ভাল হয়। তোরও ভাল হবে। হাতছাড়া করিস না, কাউকে বলিস না।'

কিছু একটা আঁচ করে অতনু চমকাল। আর্মচেয়ারের কিনারে খাড়া হয়ে বসে বলল, 'খুব দামী জিনিস নিশ্চয়?'

শচী বলল, 'হতে পারে। তুমি নিজের চোখেই দেখো। ভাল বুঝবে।'

অতনু মাথা নেড়ে বলল, 'না, থাক। উপহারের জিনিস, ভদ্রমহিলার কাছে তোর কথার খেলাপ হবে, ওঁর বিশ্বাসভঙ্গ করা হবে।'

বিরক্ত গলায় শচী বলল, 'কিসের খেলাপ? আমি কোনও কথা দিইনি, সত্যি বলছি, নিতেই চাইনি, উনি জোর করে গছিয়ে দিলেন। তখন আমার মনের যা অবস্থা, ভেতরে সাপ ব্যাঙ কী আছে জানবার কৌতূহলও বোধ করিনি। ঘরে এনে জাস্ট খাটের তলায় ফেলে রেখেছিলাম। দিন তিন-চার পরে হঠাৎ প্যাকেটটা চোখে পড়তেই মনে পড়ল। খুলে দেখেই বুঝলাম কাজটা ঠিক হয়নি। এ বোঝা বয়ে বেড়ানো আমার পক্ষে অকারণ, অর্থহীন, কী জানি ফ্যাসাদেও পড়ে যেতে পারি। আমার চালচুলো নেই, খেটে খাই, অফ্‌টাইমে নিজের খুশিতে মদ্যপান করি, স্বাধীন। কাছে থাকলে ভাল হয়, এই মেয়েলি কুসংস্কার আমার নেই। আমি কেন গেরোয় পড়ি বাবা! প্যাকেটটা ফেরত দিতে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি বাড়ি তালাবন্ধ, নো নিউজ। পাখি উড়ে গেছে।'

শচী ফ্লাস্কের বাক্সর ভেতর থেকে ব্রাউন পেপারের মোড়ক বের করল। মোড়কের ভেতর থেকে কারুকাজ-করা কাঠের বাক্স। চার ইঞ্চি বাই আট ইঞ্চি সাইজ হবে বড়জোর। আড়াই-তিন ইঞ্চির বেশি পুরু নয়। অ্যান্টিক চেহারা। অতনুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে শচী বলল, 'তুমি নিজে হাতে খুলে দেখো।'

অতনু এবার আর আপত্তি করল না, হাতে নিল। চেহারার তুলনায় বাক্সটা ওজনে ভারী। সেটা সলিড কাঠ না ফাঁপা বাক্স, চট করে বোঝা যাচ্ছিল না। লতাপাতা ফুলের ডিজাইনের মধ্যে জোড়ের দাগ যে কোথায় মুখ লুকিয়ে আছে চোখেই পড়ে না। ঘোরাতে-ফেরাতে হঠাৎ কাঁটাপেরেকের মাথার মত একটা পেতলের বিন্দু দেখতে পেল অতনু। নখ দিয়ে তার ওপর সামান্য চাপ দিতেই স্প্রিং-বসানো ফাঁপা ডালা দুটো ঝিনুকের খোলের মত খুলে গেল। ভেতরে, অতনু ঠিকই অনুমান করেছিল, একটা মূর্তি। অনুজ্জ্বল, গায়ে সিঁদুর কিংবা আবিরের হালকা ছোপ লেগে আছে। শচী একদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। কুঁচকে থাকা ভুরুর নিচে অতনুর চোখ যেন পলকের জন্যে জ্বলে উঠল। তারপর আর কোনও ভাবান্তর নেই, খানিকটা সময় চুপচাপ কেটে যাবার পর হঠাৎ যেন ছোঁ মেরে খাপের ভেতর থেকে মূর্তিটাকে বের করে আনল। হাতের তালুতে রেখে বারকতক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বলে উঠল, 'আরে কী আশ্চর্য, এটাই তো সেই নটরাজের মূর্তি—'

'সেই নটরাজ'—কথাটা শচীকে কেমন ধাঁধায় ফেলল। বলল, 'কে নটরাজ?'

অতনু উত্তর দিল না, একটা ছেঁড়াখোঁড়া পুঁথির পৃষ্ঠা তাকে অন্যমনস্ক করে

ফেলেছিল। শেষ দশায় পৌঁছানো এক পড়তি জমিদারবাড়ির আস্তাবলে পুঁথিটা যখন সে আবিষ্কার করে তখন সেটা আর আস্ত ছিল না। অর্ধেক বা তারও বেশি অংশই লোপাট। বঙ্গজ সংস্কৃতে লেখা 'রত্নগুপ্তি বিচিত্রিতম' পুঁথিটিই তাকে এ-লাইনে প্রথম পথ দেখায়। পুঁথির লেখক কে ছিলেন জানবার কোনও উপায় ছিল না। হয়তো রচনার শেষে তাঁর নামধাম আত্মপরিচয় যোগ করেছিলেন লেখক, কিন্তু শেষাংশ গরু-ছাগল কিংবা অশ্বেতর কোনও পশুশক্তি চিবিয়ে খেয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। তবে সংস্কৃত ভাষাটা যে পুঁথিকারের হাতে পোষ মেনেছিল তার প্রমাণ ছিল কিছু উদ্ভট শ্লোকের পদ্যে। তার মানে বুঝতে কোনও পণ্ডিতের দ্বারস্থ হতে হয়নি, অনুস্বর বিসর্গের কারিকুরিতে সেই দেশোয়ালী সংস্কৃত বেশ মজাদার হয়ে উঠেছিল। লোকটা সত্যিই শিল্পী ছিলেন। কারণ পুঁথির পাতাজোড়া কয়েকটা দেবদেবীমূর্তির আশ্চর্য ড্রয়িং ছিল সেই সঙ্গে। কলমের আঁচড়ে আঁকা সেই স্কেচগুলো যেন ফটোকেও হার মানায়। এই নটরাজ মূর্তিটাও সে সেখানেই প্রথম দেখেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। নাচের বিচিত্র মুদ্রা দেখে এখন মনে হচ্ছে এই মূর্তি দেখেই কপি করা হয়েছিল। আঙুল দিয়ে ঘষতেই জমে থাকা আবিরের তলা থেকে হীরের দুটো ফুটো বেরোল। একটা নটরাজের ললাটে, তার তৃতীয় নয়ন, অন্যটা মাটি ছুঁয়ে-থাকা বাঁ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে। বুড়ো আঙুলের নখে!

শচী দেখতে পেয়ে বলল, 'ইমিটেশন স্টোন মনে হচ্ছে কিন্তু কী জেল্লা দ্যাখো, ঠিক যেন—'

অতনু বলল, 'যেন নয়, আসলি হীরে! জহুরি বলতে পারবে, তবে মনে হচ্ছে দুটোই বেশ দামী। সে যুগে সোনার খুব দাম ছিল না হয়তো, কিন্তু আজ এই সলিড সোনার মূর্তিটা ফেলে ছড়িয়েও—'

'এটা মনে করো তোমাকেই দিলাম।'

অতনু অবাক চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হেসে উঠল, 'পুনরুপহার! পাগলামো করিস না। শোন, পুঁথি থেকে যতটুকু আমার বোধগম্য হয়েছিল, এই মূর্তিটা আদিতে এক রাজবংশের হেপাজতে ছিল।'

'পুঁথি? কোন পুঁথি? কিসের পুঁথি?'

'সে এক আলাদা গল্প, এখন থাক। মনে কর, আজ থেকে কয়েক শ বছর আগে আমার মতই কেউ, খেয়ালের বশে কিংবা কারও নির্দেশে মূর্তির হিস্ট্রি লিখতে শুরু করেছিল। সেই পুঁথি বলছে, এই নটরাজের মূর্তি কোনও এক বিশেষ রাজবংশের কুলমূর্তি।'

শচী অবিশ্বাসের গলায় বলে উঠল, 'ধ্যাঃ, তা কী করে হবে! দেবীদিদি কি তা হলে সেই রাজবংশের মেয়ে?'

'তার কোনও মানে নেই। গত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কত কী ঘটনা ঘটে

থাকতে পারে। অনেক রাজপরিবারের মত ঝাড়েবংশে উচ্ছন্নে গেছে এমনও হতে পারে। কিংবা লুপ্ত হয়ে না গেলেও মূর্তিটা হাতবদল্ হয়ে অপর কারও দখলে যে চলে যায়নি, তাও বলা যায় না। পুঁথিতে যে পরিবারের কথা আছে তাদের আদিপুরুষ এসেছিল উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। এই ইঙ্গিত থেকে অনুমান করা যায় সেই মানুষটি খুব সম্ভব বাঙালি ছিল না, এদেশে এসে বসতি পত্তন করে, বিবাহসূত্রে মিশে যায়। মুশকিল হয়েছে কি জানিস, এই রাজপরিবারে বংশলতিকার পৃষ্ঠাগুলো আমার হাতে আসেনি। অন্যত্র গত দেড়শো বছরেব যে ইতিহাস খুঁজে পেয়েছি তাতে ওই বংশের কোনও উল্লেখ পাইনি। এই মূর্তির কোনও সংবাদ ছিল না। দৈবক্রমে একটা মিসিং লিঙ্ক পেয়ে গেলাম।'

ব্যাপারটা শচীর মাথায় ঢুকল না। সে মাথা চুলকে জিজ্ঞেস করল, 'তার মানে?'

অতনু বলল, 'এই দেড়শো বছরের ব্ল্যাঙ্ক পিরিয়ডে অনুসন্ধান করার একটা সূত্র মিলল। তোমার দেবীদিদি সেই লিঙ্ক।'

'বেশ আছ! তাঁকে পাচ্ছ কোথায়? তিনি তো হাওয়া। খোঁজ নিতে গেলে দেখবে ওই বাড়িটা হয়তো তাঁর নিজেব নয়, ভাড়া নিয়ে বাস করছিলেন।'

অতনু দৃঢ় গলায় বলল, 'আমি অত সহজে আশা ছাড়ি না। তোর অ্যাকট্রেস দিদির এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি বের করে ফেলতে পারব এ বিশ্বাস আমার আছে।'

অতনুর ওপর খুব ভরসা পেল না শচী। একটা নিশ্বাস চেপে গিয়ে বলল, 'জানি না কী করে তুমি তা পারবে!'

'খুব কাছের মানুষটাকে তোর চোখে পড়ল না শচে? তোর বাবার বন্ধু জ্যেঠু স্যারকে প্রথমে ট্যাপ করে দেখতে হবে। আমার মনে হয় উনি নিশ্চয় কিছু জানেন।'

অতনু মূর্তিটাকে কাঠের খাপে ভরে ডালা দুটো চেপে বন্ধ করে দিল। তারপর ব্রাউন পেপারে প্যাক করে কার্ডবোর্ডের বাক্সে ভরে ফেলে বলল, 'ইস, ক্যামেরাটা যদি সঙ্গে থাকত তাহলে গোটা দুই ছবি নিয়ে যেতে পারতাম এক্ষুণি। কাল কিংবা পরশু আমি চলে আসব, তুই সন্ধের পর বাড়ি থাকিস। আজ চলি, আর রাত করব না, সুবলদা একটু বিগড়ে আছে।'

টিপয়ের ওপর মূর্তির বাক্সটা রেখে দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াল অতনু। শচী আহত হয়ে বলল, 'এটা রেখে যাচ্ছ যে, তুমি তা হলে নেবে না? আমার উপহার তুমি রিফ্যুজ করলে? বেশ!'

অতনু ওর কাঁধ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'নারে পাগলা, দুঃখ করিস না। পরের জিনিস আমি কোনওদিন নিইনি, নিতে পারব না।'

'স্যরি! আমি বুঝতে পারিনি। ঠিক আছে, আমার জিনিস তোমাকে নিতে

হবে না।' শচী বাক্সটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, 'শুধু একটা অনুরোধ করব, রাখবে?'

'আগে শুনি?'

'ফটোটা তুলে এটা কাল ফেরত দিয়ে যেয়ো না হয়।'

'ওরে ব্বাবা! কোন সাহসে? শনিবারের রাতের ঘটনা এরই মধ্যে ভুলে গেলি! আমার বাড়ির কোনও সেফটি নেই। চুরি হয়ে গেলে তখন? খুব রিস্কি ব্যাপার হবে।'

'আরে কিস্যু হবে না। কেউ জানে? একটা রাতের তো মামলা। আর যদি হয়, বুঝব অ্যাকসিডেন্ট, সে তো আমার ঘর থেকেও হতে পারে। হলে অবিশ্যি বেঁচেই যাই, আমার ঘাড় থেকে বোঝা নামে। সত্যি বলছি।'

থেমে দাঁড়িয়ে অতনু কথাটা ভেবে দেখল। শচীকে চুরি হয়ে যাবার ভয় দেখালেও সত্যি বলতে কী, সে সম্ভাবনা নেই। একটা রাত আর একটা বেলার তো ব্যাপার, জিনিসটা কাছছাড়া না করলেই হবে। অতনু রাজী হয়ে গেল। শচী একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, চলো, আমি অনেকটা তফাতে থেকে তোমার চারপাশ নজর রাখব।'

বাড়ির বাইরে পা দিয়েই ঠাণ্ডাটা টের পেল। গঙ্গার দিক থেকে কনকনে শীতের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এই সন্ধে রাতেই দোকানপাট বন্ধ হযে গেছে এ-পাড়ায। টিভি সিনেমার কল্যাণে গলি ফাঁকা। জাযগায় জায়গায আলো-আঁধারি। সতর্ক নজর রেখে অতনু বড় রাস্তার মুখে এসে দাঁড়াল। সন্দেহজনক কাউকে চোখে পড়ল না। মোড়ের পান-সিগারেটের দোকানে ক্যাসেটে চটুল হিন্দিগান বাজছে। আয়না দেখে এগিয়ে গেল সিগারেট কিনতে। আয়নার ভেতর দিয়ে রাস্তার যতটা দেখা যায় দেখে নিল। শচীকে দেখতে পেল না। তবে শচী আছেই, অনেকটা পিছনে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে ও নিশ্চয় আছে। থাক, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। ট্যাক্সির সন্ধানে চারপাশে তাকাল কিন্তু রাস্তার এমুড়ো ওমুড়ো ফাঁকা। হাওড়া স্টেশন-ফেরত একটা বাস আসছিল, খুব ভিড়, ফুটবোর্ডে গাদাগাদি, দাঁড়াল না। একটা অটো-রিকশা স্ট্যান্ডে এসে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল এই মাত্তর। অতনু হাতের ইশারায় ডাকল, এল না। বোধহয় শাট্‌ল ট্রিপের রিকশা, লাইনের প্যাসেঞ্জার হলে তবে ছাড়বে। অগত্যা শাট্‌ল রিকশার দিকেই পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল অতনু। চালক নেই, জরুরি প্রয়োজন সারতে বোধহয় দ্রুত কোথাও অন্তর্ধান করেছে। গাড়ির ভেতর আলোয়ান মুড়ি দিয়ে এক বৃদ্ধ প্যাসেঞ্জার কাঁপা গলায় শুধোল, 'আপনি এঁকা?'

অতনু বলল, 'কেন বলুন তো?'

'আরও লোঁক না হলে ছাঁড়বে না বঁলেছে।' শীতকাতুরে বুড়োমানুষটি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে অন্ধকার সরু গলিটার দিকে দেখাল, 'ওই যেঁ—'

ভুঁইফোঁড়ের মতই মস্তান টাইপের ছোকরাটি আচমকা সামনে এসে দাঁড়াল। হাতে চায়ের ভাঁড়, আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট। অতনুকে প্রায় অগ্রাহ্য করে গাড়ির ভেতরে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে-থাকা খোনা গলার বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে রুক্ষ গলায় বলল, 'এই যে দাদু, নেমে আসেন, আমি গাড়ি গ্যারেজ করে দেব, ঢের হয়েছে।'

ঘাপটি মেরে বসে-থাকা মানুষটার তরফ থেকে না কোনও শব্দ হল, না নড়াচড়ার চেষ্টা। চায়ের ভাঁড়ে শেষ চুমুক দিয়ে সেটাকে সামনের পাঁচিলেব গায়ে পটকার মত ছুঁড়ে মারল ড্রাইভার, 'কই কী হল, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি মোশাই?'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে অতনু ওদের রকম-সকম দেখছিল, এবার মাঝে পড়ল। 'আপনার গ্যারেজ কোন দিকে?'

একটু থতিয়ে গিয়ে ছেলেটা বলল, 'বাগবাজারে গিরিশ ঘোষের বাড়ির কাছে, স্যার।'

'আমিও ওদিকেই যাব, আর একটু এগিয়ে। চলুন, যা ভাড়া লাগে দেব।'

ভেতরের প্যাসেঞ্জার এবার সজাগ হল, 'দেখলে তো বাবা ব্যাভারটা। এতক্ষণ বসিয়ে রেখে শেষে বলে কিনা নেমে যাও। রুগী মানুষ, কী বাতাস ছেড়েছে বাপ। তার উপ্‌রি রাতকানা মানুষ।'

এতক্ষণে বুঝি লোকটার গলা থেকে ভূত নামল। শব্দের মাথায় চড়ে-থাকা চন্দ্রবিন্দুগুলো মুছে যাওয়ায় স্বস্তি। ভরসা দেবার গলায় অতনু শুধোল, 'যাবেন কোথায় আপনি?'

'ওখেনেই নামিয়ে দিও বাবা। টুকুন পথ ঠিক চলে যাব।'

ভেতরে উঠে বসতেই অটো বাঁইবাঁই করে ছুটল। মাটি কামড়ে, এঁকেবেঁকে, গোঁত্তা খেয়ে। কলকাতার তামাম রাস্তা যে এত বেহাল সে কেবল অটোয় চাপলে বোঝা যায়। অজস্র গর্ত, গাড্ডা, রাস্তা বোজানো ঢিপি, আবর্জনা। অতনু অস্বস্তি বোধ করছিল। ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপট বাঁচাতে লোকটা একেবারে গায়ের কাছে সেঁটে এসেছে। আলো-আঁধারিতে ভাল দেখা যাচ্ছিল না। র‍্যাপারের মোড়কের ভেতর থেকে শুধু ঝুপড়ি গোঁফ, নাকের ডগা আর কালসিটে-পড়া চশমার আধখানা দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। কেতরে যাওয়া গাড়ির ঝাঁকুনিতে বেটাল হয়ে গায়ের ওপর ঢলে পড়ছিল থেকে থেকে। অতনু বুঝল গোড়াতেই ভুল করেছে। গাড়ির সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটে তার বসা উচিত ছিল। মন্দের ভাল, এই ঘিনঘিনে অস্বস্তি বেশিক্ষণ ভোগ করতে হল না। গলির সামনে গাড়ি থামাতে বলে অতনু নেমে পড়ল। ভাড়া চুকিয়ে আর পিছনে তাকাল না, তার মাথায় তখন অন্য চিন্তা ভর করেছে। সে চলে যাবার পরেও গাড়িটা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। অটোচালক তার যন্ত্রপাতি নিয়ে

কি সব খুটখাট করল। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে যখন ফিরে গেল সেই জরদগব রাতকানা প্যাসেঞ্জারকে আর দেখতে পাওয়া গেল না।

ভোরবেল বাজাতেই সুবলসখা তড়িঘড়ি এসে দরজা খুলে দিল। পথ আগলে দাঁড়িয়ে ওর কানের কাছে মুখ তুলে ফিসফিস করে বলল, 'বাব্বা, বাঁচালে! দেখসে কিনি এসে বসে আছেন!'

বিরক্ত মুখে অতনু হাতঘড়ির দিকে একনজর তাকিয়ে শুধোল, 'এখন আবার কে এল?'

'আস্তে! শুনতে পাবে যে। সে কি এখন? অনেকক্ষণ।'

'কে বলবে তো! আগের কথা পরে, পরের কথা আগে, এই তোমার এক দোষ!'

'আর কে! সেই মেয়েমানুষটি নিক্‌ঘাত। আমার শরীলে আর কিছু নাই। পেশ্নর পর পেশ্ন করে এক্কেরে ঝাঁজরা করে দিয়েছে।'

ঠিক এরকম একটা ঘটনার জন্যে অতনু প্রস্তুত ছিল না একেবারেই। মূর্তির থলেটা শক্ত করে ধরে সে থমকে গেল। উল্টোপাল্টা নানা চিন্তা তার মাথায় ভিড় করে এল একসঙ্গে। সুবলদা মনে হয় ঠিকই অনুমান করেছে, টেলিফোনের মেয়েটাই নিশ্চয়। কিন্তু ওরকম একটা ফিশি ক্যারেক্টর, চোখের আড়ালে থেকে রহস্য সৃষ্টি করাই যার উদ্দেশ্য বলে মনে হয়েছিল, সে হুট করে একেবারে বাড়িতে চলে এল? এটাই অতনু হিসেবে মেলাতে পারছিল না। হরেক চিন্তার মধ্যেও এক অদম্য কৌতূহল অতনুকে বসার ঘরের দিকে টানছিল।

একটুও শব্দ না করে অতনু পর্দা সরিয়ে ভেতরে উঁকি মারল। সেন্টার টেবিলের ওপর ঝুঁকে চায়ের কাপে যে চুমুক দিচ্ছিল তার মুখ দেখা গেল না। একমাথা ঘন কোঁকড়া বব-করা চুলের তলায় সুডোল গ্রীবা আর অর্ধেক পিঠখোলা ব্লাউজের দাক্ষিণ্যে মসৃণ টানটান মাজা ফর্সা রংটা প্রথমেই নজর কেড়ে নেয়। সঠিক বয়স আন্দাজ করা শক্ত, তবে তরুণী এবং যুবতী তাতে সন্দেহ থাকে না!

'আমি অতনু, অতনু মজুমদার।'

আচমকা পিছনে গলা শুনে চমকে ওঠাই স্বাভাবিক ছিল কিন্তু সেরকম কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। যেন জানা ছিল, এবং অপেক্ষাই করছিল সে। হাতে চায়ের কাপ নিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে তাকাল। এক সেকেন্ড, দু সেকেন্ড, তিন সেকেন্ড একেবারে নিঃস্পন্দ। অতনু যেন আপাদমস্তক জরিপ হচ্ছে। পলকের জন্যে মেয়েটির বাঁকা ভুরু কপাল ছুঁয়ে আবার স্বস্থানে নেমে সরল হয়েছে। অচেনা মুখ, বয়স তিরিশের ওপরে-নিচে কোথাও, ধরা যায় না। ছমছমে রূপসী মোটেই না, কিন্তু সব জড়িয়ে চেহারায় আঠা আছে। গভীর থেকে উঠে আসা চোরা টানও হতে পারে।

হাতের কাপটা নামিয়ে রেখে ফিরে দাঁড়াল। হাসল। সপ্রতিভ গলায় বলল, 'আর পাঁচ মিনিট দেখতাম।' যেন কত দিনের চেনা, অন্তরঙ্গ, সহজ।

অতনু কি বলবে ভেবে না পেয়ে অকারণে একবার হাতঘাড়র দিকে তাকিয়ে নিয়ে অদ্ভুত গলায় বলল, 'হ্যাঁ—'

এক অক্ষরের শব্দটা এক ঢিলে দুইযের মত শোনাল। মানে, হ্যাঁ, একটু দেরিই হয়ে গেল বা হ্যাঁ, কী ব্যাপার—যা বোঝার বুঝে নাও।

একটা চাপা হাসি গালে টোল খেল, 'আমি রানু।'

রানু! অতনুর মনে পড়ল না নামটা কখনও শুনেছে বলে। অস্বস্তি নিয়ে মাথা নাড়ল।

'কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে।'

অতনু অবাক হয়ে বলল, 'মানে?'

'মানে আমি ভুলিনি, দেখার সঙ্গে সঙ্গেই চিনেছি, কিন্তু—যাকগে, চলি এবার।' সেন্টার টেবিলের ওপর থেকে হাতব্যাগটা তুলে নিতে দেখেই অতনু দ্রুত পায়ে রানুব সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'না! এভাবে যাওয়া চলবে না।' অতনুর গলার স্বর কঠিন হল, 'কোথাও ভুল হচ্ছে নিশ্চয়, সেটা ভেঙে দেওয়া দরকার।'

'ভুল!' রানুর গলায় শ্লেষ। যেন ফুঃ বলে কথাটা অতনুর দিকে উড়িয়ে দিতে চাইল।

'ঠিক আছে, কিন্তু দুপুরের টেলিফোনটা তো ভুল নয়। ওটা কে করেছিল?'

'কেন, আমি।' রানুর কণ্ঠস্বর কেবল সুরেলা নয়, মনের ভেতর অব্দি আচমকা ছুঁয়ে দেয়।

'তবে—' মন ঝাড়া দিয়ে অতনু নিস্পৃহ হয়ে ওঠে। মেয়েটার সরল স্বীকারোক্তি কেমন বিভ্রান্ত করে।

'কী তবে?' নিরীহ ভঙ্গিতে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে রানু সোজা হয়ে দাঁড়াল। ব্যাগের ফিতেটা কাঁধে সেট করতে করতে আহত কৌতুকের চোখে তাকিয়ে থাকল।

অতনু নিজের ভেতরে উত্তেজনা টের পাচ্ছিল। বলল, 'ড্যাম লাই, ডাহা মিথ্যে। ওরকম একটুকরো জলো নাটক করে কিছু লাভ হল?'

'যদি বলি মজা করছিলাম, বিশ্বাস হবে না তো? না, মজা করিনি। কিছু ব্যাপার থাকে যা নিয়ে মজা করা চলে না। তবে যদি নাটকই হয়, বলতে বাধ্য হচ্ছি, তার দরকার ছিল।'

দরকার ছিল। এ বলে কি। অতনু অবাক, 'কেন?'

'কেন? বাঃ! আসার আগে সিওর হতে হবে না? একনামে তো দুজন মানুষ থাকতেই পারে।'

'আর এক চেহারার দুটো মানুষ?' মুখ ফসকে কথাটা কেন বলে ফেলল অতনু নিজেই জানে না।

'তাও হয়। এক চেহারার মধ্যেও হয়। দেখলাম তো।' ঠোঁটে ঝাপসা হাসি।

অতনুর এতক্ষণের সতর্কতা ক্রমশ অর্থহীন মনে হচ্ছিল নিজের কাছেই। এ যে তার প্রতিপক্ষ নয়, কোনও মতলব নিয়ে এখানে উদয় হয়নি সেটা অনুভব করে খানিকটা স্বস্তি আর হালকা বোধ করছিল। রানুর কথার মধ্যে কোথাও একটা সরল সত্যি নিশ্চয় আছে যেটা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না। এই প্রথম অতনু সহজ গলায় হাসল, 'এক অতনু মজুমদারের ভেতর আর এক অতনু মজুমদার, তাই না?'

একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে রানু বলল, 'ঠিক তাই। ভুলেই গিয়েছিলাম কাল কিংবা পরশু, না একটা যুগই চলে গেছে ইতিমধ্যে। আঁচলে গেরো দিয়ে কি আব সময়কে বেঁধে রাখা যায়! সেই কলেজ-হাসপাতালের দিনগুলো কবেই তো চুকে-বুকে গেছে।'

অতনু একেবারেই তৈরি ছিল না। আচমকা ধাক্কাটা তার বুকে এসে লাগল। রানু তাকে সত্যি সত্যিই দুহাত দিয়ে ঠেলে দিয়েছে কিনা ঠাওর করতে পারল না। পলকে তার চোখের সামনেব সবকিছু যেন তালগোল পাকিয়ে দুলে উঠল। ভেতরের-বাইরের টাল সামলাতে গিয়ে কখন যে অতনু হাত বাড়িযে রানুর একটা হাত শক্ত মুঠোয় ধবে ফেলেছিল খেযাল ছিল না। রানু ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নিতেই কেমন অভিভূত গলায় অতনু বলে উঠল, 'সুপর্ণা? সুপর্ণা মিত্র!'

রানুর চোখে বাষ্প জমতে শুরু করেছিল। হাতের পিঠ দিয়ে চোখ কচলে নিয়ে অতনুর মুখের দিকে তাকাল, 'যাক, চেনা গেল শেষ পর্যন্ত!'

'চেনা গেল, তবে অনেক কষ্টে!'

'কেন, অনেক কষ্টে কেন?' সুপর্ণা বলল, 'রানু আমার ডাকনাম।'

'সেটা অবশ্য আমার জানা ছিল না।'

'জানি। জানি বলেই ভাল নামটা চেপে গিয়েছিলাম।'

'বেশ করেছিলে, তবে নামে কী আর যায় আসে! আসলে সেই চেহারা এখনও মনের মধ্যে গেঁথে আছে। সেই বয়স, সেই সালোয়ার কামিজ, ছুটন্ত ছিপছিপে গড়ন। যেন পিঠের ওপর থেকে দুই চাবুক পড়ছে, দুই লম্বা বেণী।'

নিজের চেহারার বর্ণনা শুনে সুপর্ণা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হেসে কূল পায় না। অপ্রস্তুত অতনু চটে-মটে বলে, 'এত হাসির কি আছে?'

'আমাকে নিয়ে এই প্রথম কবিতা শুনলাম কিনা! আমার হাতে সিরিঞ্জ

দেখলে এখন কিন্তু অনেক লোকের মুখ শুকিয়ে যায়।'

অতনু হঠাৎ চোখে সুপর্ণার মুখের দিকে তাকাল। ওর চোখের পাতা কি পলকের জন্যে কাঁপল? প্রথম নিড্‌ল পুশ করার মুহূর্তে সুপর্ণার অভিজ্ঞ আঙুল যেমন স্পর্শকাতর পেশীর কাঁপন টের পায়। কথাটা বলে ফেলা ঠিক হয়নি মনে হতেই সুপর্ণা দ্রুত গলায় বলে উঠল, 'ওরে বাবা, আর না! এবার যেতে হবে। ইস, রাত হয়ে গেল।'

নিজের অজান্তে ফুরিয়ে যাওয়া খালি প্যাকেটের দিকে যেমন হতাশ চোখে তাকিয়ে থাকে কোনও কোনও রাতে। নেশা ফুরনো জব্দ মানুষের মত অতনু চাইছিল সুপর্ণাকে সে আরও কিছুক্ষণ, অনেকক্ষণ তার কাছে ধরে রাখে। তার কথা তো এখনও ফুরয়নি, ফুরনো দূরে থাক, শুরুই হয়নি, অথচ এরই মধ্যে বিদায়। এত বছরের ঘুমিয়ে-থাকা কয়েকশ কথা জেগে উঠে যেন কোলাহল শুরু করে দিয়েছিল তার ভেতরে। কিন্তু অতনু অনেক পোড় খেয়ে শক্ত অতনু মুখে কোনও ভাবান্তর দেখাল না। মনের চাঞ্চল্য দমন করে সে গলা চড়িয়ে হাঁক দিল, 'সুবলদাদা!'

প্রায় দরজার গোড়া থেকেই সুবলসখা বলে উঠল, 'এই যে গো।'

পর্দা সরিয়ে অতনুর দিকে এগিয়ে এল সুবলদা, হাতে চায়ের কাপ, মুখে সবজান্তার হাসি। চায়ের তেষ্টা মনেও ছিল না অতনুর, হাত বাড়িয়ে কাপটা নিতে নিতে বলল, 'তুমি এই ভদ্রমহিলাকে বড় রাস্তায় বাসে চাপিয়ে দিয়ে এসো তো সুবলদাদা।'

'বাসে কে যাবে?'

'তবে? গাড়ি আছে নাকি সঙ্গে?'

'না। হেঁটেই যাব। আমার সঙ্গে কাউকে যেতে হবে না। পাঁচ মিনিটেরও রাস্তা না।'

'অ্যাঁ! কোথায়?'

সুপর্ণা হাসল, 'এই পাড়ার ভেতরেই কোথাও। এত কাছ থেকে ফোন করেছিলাম শুনলেও লোকে হাসবে।'

অতনু শুকনো গলায় বলল, 'তাহলে ঠিক আছে।'

দরজার কাছে গিয়ে সুপর্ণা ফিরে দাঁড়াল, 'যে জন্যে এসেছিলাম—অনেক অনেক দিন ধরে বয়ে বেড়ানো একটা জিনিস'—অন্যমনস্ক হাতে একবার ব্যাগের চেন খুলল, ফের বন্ধ করল, 'রেখে গেলাম।'

'জিনিস! কী জিনিস!' অতনু খোঁজার চোখে সেন্টার টেবিল আর সোফাগুলোর দিকে একঝলক তাকাল।

'জিনিস না বলে কৃতজ্ঞতাই বলতাম, কিন্তু বড্ড কেতাবি শোনাত।' বলেই সুপর্ণা আর দাঁড়াল না, অনাবশ্যক দ্রুত পায়ে চলে গেল। সদর পেরিয়ে সিঁড়ির ধাপিতে তার জুতোর শব্দ ঝাপসা হতে হতে মিলিয়ে গেল।

রাতের খাওয়া মিটিয়ে অতনু নিজের ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করল। খাটের কিনারে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে নিয়ে বড় আলো নেবাল। সুপর্ণা তার অনেকটা সময় এলোমেলো করে দিয়ে গেছে, আর না। নিজের অতীত নিয়ে এখন তার মাথা ঘামাবার সময় নেই। লুকনো জায়গা থেকে প্লাস্টিকের ব্যাগটা বের করে নিয়ে সে বিছানায় বসল। সময় নিয়ে ধীরে-সুস্থে মূর্তিটাকে আর একবার দেখে নেওয়া দরকার। ছবি তোলার ব্যাপারটা পরে হলেও চলবে, হাতে এখনও অনেক সময়। থলে থেকে কার্ডবোর্ডের বাক্সটা টেনে বের করতেই তার সঙ্গে একটুকরো কাগজ বেরিয়ে এল। শচের ব্যাগের ভেতরে নিশ্চয়ই কোনও দরকারী কাগজ ওভাবে থাকবে না। বাজারের চিরকুট কিংবা দোকানের ক্যাশমেমো যেমন লাগবে না জেনেও হেলাফেলা করেও আমরা শেষ পর্যন্ত ফেলি না, সেই রকম বাজে কাগজ ভেবে ছুঁড়ে ফেলে দিতে গিয়েও দিল না। এই একটা ব্যাপার ওর স্বভাবে নেই, ট্রামবাসের টিকিটও পকেট থেকে ফেলে দেবার আগে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে। সেই বরাবর অভ্যাসেই লম্বালম্বি ভাঁজ করা কাগজের টুকরোটা আলোর তলায় খুলে ধরল। সাদা কাগজে তাড়াহুড়ো করে একছত্র লেখা। ছত্র না বলে ছত্রভঙ্গ লেখা বলাই ঠিক। ডটপেনে লেখা ভাঙাচোরা লাইন। অতনুর ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল। শচেটা মহাফিচেল তো! লিখেছে—আরও একটু হুঁশিয়ার কিন্তু! শচে ভেবেছে খুব মজা হবে, মূর্তিটা বের করতে গিয়ে অতনু চমকে যাবে ওর গলা শুনতে পেয়ে। প্রতিটা অক্ষর জ্যান্ত হয়ে উঠবে ওর কণ্ঠস্বর পেয়ে।

ঠোঁটের হাসিটা হঠাৎ মিলিয়ে গেল অতনুর। সে মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের মনেই বলে উঠল, না, শচী সেই টাইপের ছেলে না। অন্তত আমার সঙ্গে সে কখনই মজা-মস্করা করতে যাবে না। তবে কি মূর্তিটা হাতছাড়া করে সে পুরো ভরসা রাখতে পারেনি, তাই সতর্ক থাকতে বলেছে?

এই যুক্তিটাও অতনুর মনঃপূত হল না। এটা তো সে অতনুকে দিয়ে দিতেই চেয়েছিল। অতনু রাজী না হওয়ায় সে এমন কথাও বলেছিল দৈবাৎ খোয়া গেলেও তার ক্ষোভের কোনও কারণ থাকবে না। সুতরাং এটা আদৌ শচীর হাতের লেখা নয়।

আর শচী'র যদি নয়, তাহলে অন্য কেউ, অচেনা কেউ লিখেছে তাতে ভুল নেই। কিন্তু সে যেই হোক তার লক্ষ্য অতনু, দুর্ভাবনাটা সেখানেই। সতর্ক

চোখে অতনু লেখাটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। স্পষ্টই দেখতে পেল কথাগুলো এক লেভেলে নেই, লাইন ভেঙে যে শব্দ উঠেছে নেমেছে তাই নয়, হ্রস্বকার আর হ্রস্বকারের টুকরো দুটো একেবারেই জায়গা-ছুট হয়ে হাস্যকর দেখাচ্ছে। র এবং য়-র ফুটকিগুলো তলচ্যুত হয়ে অন্যত্র ছিটকে গেছে। এরাই প্রমাণ, যে লিখেছে, সে অন্ধের মত চোখ বন্ধ করে লিখেছে। অন্ধকারে আন্দাজমাফিক লিখতে গেলে ঠিক যে রকমটা হয়।

অন্ধকারে! হঠাৎ অন্ধকারে অতনু যেন তার গায়ের পাশের সেই লোকটাকে দেখতে পেল। অটোরিকশার মধ্যে গায়ে ঢলে পড়ার ছুতো করে এই হাতসাফাইটা তাহলে হয়েছে! অতনু রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কাগজটাব দিকে তাকিয়ে বসে থাকল। এই হুঁশিয়ারির উদ্দেশ্য ধরতে পারল না। এটা কি তাহলে শত্রুপক্ষের একটা নতুন চ্যালেঞ্জ, না অন্য কিছু?

চিন্তিত, কিছুটা বা আতঙ্কিত হয়েই অতনু প্যাকেটের ভেতর থেকে মূর্তিটাকে দ্রুত হাতে বের করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। যাক, আসল জিনিসটা খোয়া যায়নি শেষ পর্যন্ত। যদিও তার হাতের থলের ভেতর থেকে মূর্তিটাকে হাপিস কবে দেওয়া যে অসম্ভব ব্যাপার ছিল সে কথা মন জানলেও পুরোপুরি ভরসা রাখতে পারেনি শেষতক।

টেবিল ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোয় নিরিবিলিতে অনেকক্ষণ ধরে উলটে-পালটে দেখল মূর্তিটাকে। সাধারণ ছাঁচে ঢালাই করা মূর্তি যেমন আকচার বাজারে দেখতে পাওয়া যায়। ব্রোঞ্জ কিংবা পিতল-কাঁসায় ঢালাই নটরাজ, ঘর সাজানোর দোকানে বিক্রি হয়। এমনকি কালো মাটির পালিশ করা এরকম দেবদেবীর মূর্তিও ঝুড়ি ঝুড়ি মেলায় আনে কুমোররা। হীরের ফুল দুটো ছাড়া সত্যিই কোনও বিশেষত্ব নেই, আর অন্য কোনও ধাতুর না হয়ে মূর্তিটা সোনার এই যা। ছাঁচের জোড়ের দাগটা ওপর থেকে নিচে সরলরেখায় নেমে এসেছে। দাগটা সরু সুতোপ্রমাণ উঁচু হয়ে আছে, আঙুল বুলোলে টের পাওযা যায়। মূর্তিটা নিরেট না ফাঁপা, ফাঁপা হলে কতটা ফাঁপা, হাতের ওজনে সেটা ধরা শক্ত। আকারে ছোট হলেও ভারীই আছে। সলিড হওয়া আশ্চর্য না। টিপে, টেনে ঝাঁকিয়ে অনেক চেষ্টা করল। ফুল দুটোর ওপর চাপ দিয়েও কোনও ফল হল না, নিছকই মূর্তি, ভেতরে কোনও প্যাঁচপোঁচ রহস্য নেই।

একটু বুঝি হতাশই হল অতনু। ক্ষীণ হলেও মনের মধ্যে বোধহয় একটু অন্যরকম প্রত্যাশাই ছিল। ক্যামেরা আনতে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই হঠাৎ থমকে গেল। মনে পড়ে গেল ফিল্ম নেই, কাল দিনের বেলায় ছাড়া ছবি তোলা যাবে না।

মূর্তিটাকে আবার যথাস্থানে লুকিয়ে রেখে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল অতনু।

অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে ঘুমিয়েও পড়ল একসময়। কিন্তু ঘুম গাঢ় হল না, সারারাত শুধু ছেঁড়া-ফাটা উদ্ভট স্বপ্নের মধ্যে সুপর্ণাকে দেখল।

তাড়াহুড়ো করেই ফিল্ম কিনতে বেরিয়েছিল অতনু কিন্তু ফেরার পথে ছোট ভাইয়ের শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় দেরি হয়ে গেল। পিলে চমকানো জান্তব হর্ন শুনে মুখ ফেরাতেই দেখতে পেল ভদ্রলোক গাড়ি থামিয়ে নেমে আসছেন। প্রায় হাফ-সেঞ্চুরি আগের হুডখোলা মডেল, যে কোনও কার র‍্যালিতে দর্শনীয় বস্তু হিসেবে দাঁড় করানো, দৌড় করানো চলে।

'এই যে বাবাজি, তোমার দেখা পেয়ে গেলাম, ভালই হল। ওদিকের খবর শুনেছ তো?'

ওদিকের মানে দিল্লির। অতনুর ফিরে আসার আগে এ-বাড়ির দেখ্‌ভালের দায়দায়িত্ব বর্তেছিল এই মানুষটির ওপরেই। দু দুটি বিধবা আর একটি নাবালিকার রক্ষণাবেক্ষণ করা, সুবিধে অসুবিধে দেখা, বাড়ির ট্যাক্স-ফ্যাক্স নানান ঝুটঝামেলা সামলানো—এইসব উনি প্রায় উপযাচক হয়েই করতেন। ঝানু মনুষ্য। অতনু ভেতবে ভেতরে খুব একটা পছন্দ করে না ভদ্রলোককে।

উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞেস করল, 'কোন দিকের কথা বলছেন? কী হয়েছে?'

'তোমার মা আর পিসিমা কলকাতায় ফিরে আসছেন বলে চিঠি পাঠিয়েছেন, হাতচিঠি, তোমার নামে। তুমি আবার ব্যস্ত মানুষ, তা হোক, যেতে আসতে দশ মিনিটও লাগবে না। চলো আমার সঙ্গে।'

ব্যস্ত মানুষ, কথাটার মধ্যে হয়তো একটা সূক্ষ্ম খোঁচা ছিল, অতনু গায়ে মাখল না। চুপচাপ গাড়িতে গিয়ে বসল।

দরজা খুলে দিয়ে সুবলসেখা একগাল হাসল, অন্যমনস্ক অতনু তাকিয়েও দেখল না।

'তিনি আবার আসছেন! কেমন, হল তো?

নিজের চিন্তায় বিভোর অতনু বলল, 'জানি।'

'জানো! বললেই হল?' সুবলদা বলল, 'কী আশ্চর্যি! এক মিনিটও হয়নি ফোনে—'

'ফোনে?' অতনু চমকে তাকাল, 'ফোনে কে তোমাকে বলল?'

'তোমার গিয়ে কি যেন নাম, সুর্পণা, হ্যাঁ! সন্ধের পর বাড়িতে থাকতে বলেছে।'

অতনু চমক খেয়েও হেসে ফেলল, 'সুর্পণা না শূর্পণখা?'

'ঠাট্টা কচ্ছ করো, মেয়েদের হাল ফ্যাশানের নাম বাপু আমার গুলিয়ে যায়। কিন্তু ঠিক বলেছিলাম কিনা যে, আসবে, আবার আসবে।' বলে সবজ্ঞের হাসি হাসল সুবলসখা।

'তুমি আমাকে বলেছিলে একথা? কখন? মনে মনে নয়তো, সুবলদাদা?' কৌতুকের চোখে অতনু তাকাতেই সে আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল।

'আমার একটা কথাও তুমি সিকিকান দিয়ে শোনো কখনও? কাল রাত্তিরে যখন মেয়েটা হুড়মুড়িয়ে চলে গেল, তুমি চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে, আমি বললাম না কথাটা?'

অতনু আর কথা বাড়াল না। সুবলদাকে কড়া করে এককাপ চা করে আনতে বলে খবরের কাগজ নিয়ে বসল। হেডিংগুলোর তলায় দু-চার সেন্টিমিটার তক চোখ বুলিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ দুইয়ের পাতায় একটা খবরের হেডিংয়ে চোখ পড়তেই অতনু চমকে গেল। 'ঝিল রোডে খুন' এই শিরোনামে স্টাফ রিপোর্টার লিখেছেঃ 'গতকাল রবিবার সকাল দশটা নাগাদ দক্ষিণ কলকাতার ঝিল রোডে সন্দীপ সর্বাধিকারী নামে ত্রিশোর্ধ্ব এক তরুণ তাঁর নিজের বাসভবনে অতি নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। স্থানীয় থানায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টেলিফোনে খবর যায়। থানার ও.সি. তৎক্ষণাৎ সদলবলে অকুস্থলে হাজির হন। পুলিশের বিবরণে জানা যায়, শেষ নমস্কার নামের ওই বাড়ির বর্তমান মালিক সন্দীপবাবু দ্বিতলে একাই থাকতেন। কয়েক বছর আগে অল্পকালের ব্যবধানে তাঁর পিতামাতার মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ একতলাটা ভাড়া দিয়ে তিনি দোতলার একাংশে বসবাস করছিলেন। সর্বাধিকারী অকৃতদার এবং একা ছিলেন। নিরীহ, নির্বিরোধ কিন্তু কেমন নিঃশব্দ। পাড়ায় মেলামেশা ছিল না। সপ্তাহান্তে ফি শনিবার কর্মস্থল থেকে ফিরে সেই যে ঘরে ঢুকতেন আর তাঁকে দেখা যেত না। আবার সোমবারে কোন কাকভোরে উধাও।'

এক ঝোঁকে খবর পড়ার তালটা কেটে গেল ব্র্যাকেটে হোঁচট খেয়ে। খবরের কাগজের এই ধড় মুণ্ডুর খেলা অতনুর পছন্দ হয় না। হাড়িকাঠের এপাশে মুণ্ডু পড়েছে তো ওপাশে ধড়, হাত-পা ছুঁড়ে ছটফটাচ্ছে, গরজ থাকে তো হাত বাড়িয়ে ধরো। পাঁচের পৃষ্ঠাটা প্রায় গোটাটাই ডাম্পিং গ্রাউন্ড, পাতা উল্টে সাত-সতেরোর মধ্যে গুঁজে দেওয়া কাট্-নিউজটা খুঁজতে খুঁজতে আগের কথাগুলোর রেশ ফিকে হয়ে আসে।

অতনুর মাথার মধ্যে কেবলই সন্দীপ সর্বাধিকারী পাক খাচ্ছিল। তার ডুপ্লিকেট, দু নম্বর। কাল সকালে টিভি-ঝলসানো ঘরের মেঝেয় যে ছিল মুখ ফিরিয়ে পড়ে-থাকা একদম বোবা ডেডবডি মাত্র, তাকে এবার যেন কিছুটা ধরতে-ছুঁতে পারা যাচ্ছে, অন্তত নামে। নাম মুছে দিলে যে কোনও মানুষই থার্ড পার্সন, 'সে' ছাড়া কিছু না। ঘণ্টা বারো আগে অতনুর চোখে সন্দীপও তাই ছিল। অতীত বর্তমান মোছা একটা মানুষ, চেহারার নাটকীয় সাদৃশ্য ছাড়া জীবনের কোনও গল্প, কোনও ঘটনাই তার গায়ে জড়ানো ছিল না।

ছাপা শেষ অংশটা একটু খুঁজতেই চোখে পড়ে গেল অতনুর। 'এই শনিবারও সন্দীপবাবু যথারীতি যে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন তা ভাড়াটেরা বুঝতে পেরেছিলেন। নিশ্চুপ দোতলার ফ্ল্যাটটা তার সাপ্তাহিক ঘুম ভেঙে আবার জেগে উঠেছিল। এ-ঘর থেকে ও-ঘরে চলাফেরার পরিচিত আওয়াজ, টিভি চলার শব্দ, থেকে থেকে খুটখাট হরেক রকমের ধ্বনি প্রতিধ্বনি যেমন স্বভাবতই কানে আসে, আসছিল। অন্য দিনের তুলনায় কোনও তফাত মনে হয়নি। তালাখোলা একতলার সিঁড়িব মুখেব দরজাটা যেমন ভেতব থেকে বন্ধ থাকে তেমনি। না, কিছুই অস্বাভাবিক মনে হয়নি। আসলে ভাড়াটে বাড়িঅলার সম্পর্কটা মাসান্তে রেভিনিউ স্ট্যাম্পের ওপরে একটা সইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। না খিটিমিটি, না অকাবণ ভদ্রতা-সৌজন্যের কথাটথা, না কোনও কৌতূহল। তাই পরদিন সকালে মহাভারতের অনুষ্ঠান দেখতে তাঁরা সবাই যখন মশগুল তখন ওপরতলার ঘরে ভাবী কিছু পড়ে যাওযাব শব্দ শুনে, কে যেন সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, ওপবে পা স্লিপ কবে কেউ পড়ে গেল বোধহয। ব্যস, ওই পর্যন্তই, আর কেউ ও নিয়ে মাথা ঘামাযনি। মহাভাবতেব তখন জম্পেশ মুহূর্ত চলেছে, সবার মনোযোগ তখন সেইদিকে সাঁটা। পুলিশের জেবাব উত্তবে ভাড়াটেবা সকলেই একবাক্যে হলপ করেছে, না, কোনও আর্তনাদ বা চিৎকার তাঁদেব কানে আসেনি। সন্দীপবাবু যদি এক-আধবাব চেঁচিযেও থাকেন সে আওযাজ টিভির ডামাডোলেব ভেতব চাপা পড়ে গিযেছিল নিশ্চয়। তবে সেই সকালে সন্দীপবাবুব কাছে অতিথি-অভ্যাগত কেউ এসেছিল একথা তাঁদের মনে হয়েছিল। কিন্তু রহস্য এখানেই যে থানায় ফোন করে জানানোর কথা কেউ স্বীকার করেনি। পুলিশের ধারণা ব্যাপারটা চেপে যাওয়া হয়েছে। পুলিশে ছুঁলে আঠার ঘা, এ দুর্নাম তো নতুন নয়। তাই সাধ করে কে আর অকারণ ঝঞ্ঝাটে জড়াতে চায়। এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বটে তবে তদন্তের কাজ থেমে নেই, অনেকটাই এগিয়েছে। পুলিশের হাতে এমন কিছু জোরালো সূত্র প্রমাণ এরই মধ্যে এসে গেছে, ঘরময় ছড়ানো খুনীর হাতের রক্তছাপ ছাড়াও কিছু পাথুরে প্রমাণ, যা দিয়ে তাকে খুঁজে বের করতে হয়তো খুব বিলম্ব হবে না। এখন তাঁরা পোস্ট-মর্টেম আর ফরেনসিক রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করে আছেন।'...

নতুন করে ধাক্কা খেয়ে অতনু কেমন মনমরা হয়ে বসে থাকল। যেন কাঁটাটা ভেতরে কোথাও বিঁধেই ছিল, এতক্ষণ টের পাওয়া যায়নি, এবার নাড়া খেয়ে পুরনো ক্ষতে নতুন করে রক্তক্ষরণ হল। বিগত কয়েক ঘন্টার উল্টোপাল্টা ঘটনায় প্রায় ভুলেই ছিল ব্যাপারটা। এবার মনে হল, এক নির্মম সাঁড়াশি তার দিকে ক্রমশ নির্ভুলভাবেই এগিয়ে আসছে। এখনও দেখা যাচ্ছে না বটে কিন্তু তার

আগ্রাসী হাঁ-মুখ স্থির লক্ষ্যে হয়তো কাছে এসে গেছে, খুবই কাছে, আর বোধহয়—

অতনুর কেঁপে-যাওয়া হাত থেকে খবরের কাগজটা মেঝের ওপর খসে পড়ল। ভেতরের ঘরে টেলিফোন বেজে চলেছে। ছুটে গিয়ে ধরল। ওপিঠে শচীর গলা। অতনু হেসে ফেলল।

'হাসছ যে?'

'আমার জন্যে দুশ্চিন্তায় রাতে তোর ভাল করে ঘুম হয়নি তো?'

'ধরেছ ঠিকই, একটু চিন্তায় ছিলাম। যাক, নিরাপদে পৌঁছেছ তাহলে!'

'তা পৌঁছেছি।'

'পিছনে ফেউ-টেউ?'

'পিছনে?' এক মুহূর্ত শক্ত চোয়ালে চুপ করে থেকে অতনু বলল, 'না, পিছনে না। তুই কোত্থেকে?'

'ইলেকট্রো-সেন্টার।'

'ফোন করে ভালই করেছিস। আজ বিকেলে তোর কাছে যাচ্ছি। বাড়িতে থাকিস।'

শচী কি যেন ভাবল। উত্তর দিতে দেরি হল তাই, 'আজ বাদ দাও। ওটা ফেরত দিতে তো? ও কালটাল হবে, কিংবা পরশু।'

'মুশকিলে ফেললি, আচ্ছা, ঠিক আছে। ভাল কথা, সেই মিসিং লিংক, মনে আছে তো? তোর জ্যেঠু স্যারের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাই, ব্যবস্থা করিস।'

'বেশ। কাল এই সময় আবার ফোন করব। ও-ক্যে।' অতনু ফোন নামিয়ে রাখার শব্দ পেল।

ফোন রেখে দিয়ে অতনু আবার অস্থির পায়ে বসবার ঘরে ফিরে এল। মাটি থেকে কাগজটা কুড়িয়ে নিয়ে সোফায় বসল। খবরের শেষ ক-টা লাইন তখনও পড়া হয়নি। সংবাদদাতা লিখেছেন, 'সন্দীপবাবুর মৃত্যু হয়েছে ছুরিকাবিদ্ধ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু তাঁর মৃতদেহটি কী উদ্দেশ্যে হাত দুই-তিন তফাতে ঘরের সদর দরজার দিকে টেনে আনা হয়েছিল সেটা এখনও কুয়াশাবৃত। আরও একটা ব্যাপার, সন্দীপবাবুর স্টিলের আলমারি এবং তার লকার চাবিবদ্ধ করা ছিল না। ভেতরে মূল্যবান কিছুই পাওয়া যায়নি, আলমারির গায়ে কোথাও অবশ্য আততায়ীর হাতের ছাপও পাওয়া যায়নি, সন্দীপবাবুর নিজের আঙুলের ছাপ ছাড়া। তবু এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না কোনও মূল্যবান সামগ্রী কিংবা টাকাকড়ি সরানো হয়েছে কিনা। এ ব্যাপারে পুলিশ অন্য উপায়ে খোঁজখবর

চালাচ্ছে। রাতে লালবাজারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে গোয়েন্দা বিভাগের এক মুখপাত্র জানান, এটা যে কোনও রাজনৈতিক খুন নয় এ বিষয়ে তাঁরা নিশ্চিত। তবে তদন্তের স্বার্থে এ' বেশি কিছু বলতে তাঁরা রাজী নন।'

অতনু খুব বিভ্রান্ত আর নিরুপায় বোধ করছিল। বুঝতে পারছিল জল অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। অনেকটাই বিলম্ব হয়ে গেছে। এখন যেচে পুলিশের কাছে গিয়ে সত্যি কথা বলার অর্থই হবে হাতকড়ার দিকে নিজে থেকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া। তাব কোনও কথাই আর বিশ্বাসযোগ্য হবে না। তার হাতের ছাপই অকাট্য প্রমাণ হয়ে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। এই মুহূর্তে তার কি করা উচিত কিছুই সে ভাবতে পাবছিল না। উদ্বেগ আর অনিশ্চিত আতঙ্কে ভারী মনটা ক্রমশ আরও ভারী হচ্ছিল। নিজের যখন এই শিরে সংক্রান্তি অবস্থা, প্রায় নাকের ডগায় ফাঁসির দড়ি দুলছে, তখন আরও পাঁচটা ব্যাপার এসে ঠিক চারপাশে জুটে গেছে। একেই বলে সোনায় সোহাগা। সব ছেড়েছুড়ে অতনুর কোথাও পালিযে যেতে ইচ্ছে করছিল। থাক পড়ে এই বাড়ি, এই পৈতৃক নিবাস, তার আবাল্যের চেনা কলকাতা। এক যুগ যে-জগৎ ছেড়ে সে দূবে দূরে ঘুরে বেড়িয়েছিল, এখন পা না সরুক, মন নারাজ হোক, আবার ভেসে-পড়া ছাড়া সে গতি দেখতে পাচ্ছিল না। মূর্তিব রহস্য নিযে মাথা ঘামাতে কে তাকে দিব্যি দিয়েছিল! তার নিজের জীবনই যখন বিপন্ন, আসল সমস্যাটাকে যখন দুঃস্বপ্ন ভেবে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না, তখন প্রথম জীবনের এক অস্ফুট, অব্যক্ত, নিষ্ফল ভালবাসাও আতরের ফিকে গন্ধের মত অর্থহীন বিলাসিতা ছাড়া আর কী? সুপর্ণার সঙ্গে এতকাল পবে আর দেখা না হলেই বা কী ক্ষতি হত? কিছুই না। দুটো পুরনো কথা বল্লেই বা কী লাভ! রূপকথা দিয়ে তো জীবন চলে না। তার চেযে যদি এমন কাউকে পাওযা যেত যাকে বিশ্বাস করে সব ঘটনা খুলে বলতে পারত অতনু, পরামর্শ চাইতে পারত তাহলে বোধহয় মনটা হালকা হত। কিন্তু সেরকম মানুষ কোথায়, যে তার কথা বিনা প্রশ্নে অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করবে এবং গোপন রাখবে এবং এই জীবনমরণ সমস্যা নিয়ে তারই মত সমান মাথা ঘামাবে। বুদ্ধি দেবে। ভরসা দেবে। শচীর কথা একবার মনে হল। ঠিক জানে না, শচী তাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করবে কিনা। হয়তো করবে। অতনুকে ও অন্য চোখে, আলাদা চোখে দেখে। সমীহ করে, ভালবাসে। দূরত্ব থাকলেও দূরের নয়। খুঁতখুঁতি থাকলেও সেটা চাপবে, প্রকাশ করবে না। মেনে নেবে। গোপনও রাখবে। কিন্তু কোনও উপায় বাতলাতে পারবে কিনা সন্দেহ। পারমর্শও না। কিন্তু তবু, বলার মত ওই একজন ছাড়া আর কেউ নেই অতনুর। মা নয়, নিজের ভাইয়েরাও না।

অনেক ইতস্তত করার পর অতনু ঠিক করল, বলবে। শচীকেই সব খুলে বলবে, কিচ্ছু লুকোবে না। কিন্তু শচীদুলালকে এখুনি এই মুহূর্তে তো পাওয়া যাবে না। কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তা হোক, সে কিছু না। কাল কেন, পরশু তরশু কি তার পরের পরের দিন হলেও অতনুর অপেক্ষা করতে আর আপত্তি নেই। আশ্চর্য কাণ্ড, শচীকে সব বলবে ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই মনের সেই দমচাপা ভাবটা কেটে গেল। কিছুটা হালকা বোধ করতেই অতনু হাতের কাগজটা ফের খুলল। দুইয়ের পাতার গোড়া থেকে পুরো খবরটা সে আর একবার খুঁটিয়ে পড়তে শুরু করল। সুবলদা চায়ের কাপ সেন্টার টেবিলে আস্তে করে নামাল। অতনু কাগজের ওপর দিয়ে চোখ তুলে দেখল, ছোট একটা প্লেটে ঝালবড়ি ভেজে এনেছে সে।

অনেকখানি জায়গা নিয়ে খুনের খবরটা ফলাও করে ছাপলেও খবরের কাগজের বয়ানে আসল কথার বিশেষ উল্লেখ নেই। রিপোর্টিংয়ের মধ্যে এখন মনে হচ্ছে ধোঁয়াটাই বেশি। নিজের মনে এক দুই তিন চার করে তথ্যগুলো সাজিযে নিচ্ছিল অতনু। মৃতের নাম সন্দীপ সবাধিকারী। বয়স ত্রিশের কোঠায়। অবিবাহিত এবং একলা থাকত। মা-বাবা আগেই মারা গেছেন। নিকট আত্মীয়জন বলতে খুব সম্ভব কেউ নেই। থাকলেও তারা কেউ ধারে-কাছের বাসিন্দা না। নিবাস ঝিল রোড। 'শেষ নমস্কার' বাড়িটার সেই ছিল দখলদার, অর্থাৎ উত্তরাধিকারী, মালিক। ভাড়াটের সঙ্গে সম্পক, খারাপ-ভালো কিছুই ছিল না। ভাড়াটেরা নতুন, সন্দীপের অতীত সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না, বর্তমান সম্পর্কেও। জানলেও মুখ খুলবে বলে মনে হয় না। পাড়াতেও তার মেলামেশা ছিল না, বন্ধুবান্ধব না। ছাত্রজীবন সম্ভবত কলকাতার বাইরে অন্যত্র কেটেছে। কাগজে লেখেনি, তবে পাড়ায় অপরিচিত শুনে সেরকমই অনুমান করা যায়। কর্মস্থল বাইরে, কিন্তু কোথায় এবং কি ধরনের কর্ম তা লেখা হয়নি। উইক এন্ডে বাড়ি আসত, ফি শনিবার। শনির রাত থেকে রবির রাত, বলতে গেলে গৃহবন্দী। আড্ডা হইহল্লা কিছুই না। কেমন যেন নিঃশব্দ রহস্যময়, তাই না? নাকি কোনও আশঙ্কা ছিল, তার প্রাণের আশঙ্কা! শত্রুর চোখে পড়ে যাবার ভয়? কিন্তু গা ঢাকা দিয়েও তো সে বাঁচতে পারেনি। গত শনিবারও যথারীতি এসেছিল, রবিবার সকালেই শেষ। কেউ বা কারা তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সকালের দিকে, ভাড়াটেদের সেই রকমই অনুমান। অতনুর কথা কি? পা পিছলে না হলেও সেও তো আছাড় খেয়ে পড়েছিল। তদন্তের কথা পুরোটাই ঝাপসা, কতটা এগিয়েছে, হাতের ছাপ ছাড়াও কী এমন প্রমাণ পুলিশের হাতে এসেছে, তাও নেই। পুলিশ নিশ্চয়ই ভেঙে বলেনি, শুধু বলেছে এটা রাজনৈতিক খুন নয়।

ক্যামেরায় ফিল্ম লোড করতে করতে এই সব যখন অতনুর মাথায় পাক খাচ্ছিল ঠিক তখনই রাস্তার দিকের গোলমালটা তার কানে এল। এক দঙ্গল বাচ্চাকাচ্চার উল্লাসের জিগির, খুদে খুদে হাতের করতালি, বড়দের গলার ধমক-ধামক, কুকুরের তারস্বর ডাক। কি ব্যাপার জানার জন্যে সুবলদাকে ডাকতে যাবে, এমন সময় তার গলা শোনা গেল সদরের দিক থেকে। সে মহা চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। অতনু বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই বলল, 'দেখো তো কি ঝামেলা, কোত্থেকে এক ঘেয়ো পাগলা এসে জুটেছে, নড়বার নাম নেই! আর একটু হলেই ভেতরে ঢুকে পড়ত।'

অতনু দেখল তাদের সিঁড়ির ধাপির সঙ্গে প্রায় লেপটে রয়েছে একটা লোক। মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল, মাথায় রুক্ষ চুলের বোঝা, লাল কাপড়েব পাড় দিয়ে কপালে ফেট্টি বাঁধা। ময়লা, ছেঁড়া প্যান্টুলন আর গেঞ্জি। দুটো হাতেই অনেকটা জায়গা জুড়ে ব্যান্ডেজ। ব্যান্ডেজ মানে মাছি-বসা নোংরা ন্যাকড়াব ফালি জড়ানো। লোকটা ভয়ঙ্কর হাসছে, প্রায় হেঁচকি তোলার মত দমবন্ধ কবা অট্টহাসিই হবে, কিন্তু শব্দ নেই। হাই তোলার পরে শ্বাস ছাড়ার মত বড়জোর। হাসির তোড়ে তার দুচোখ গড়িয়ে জল। ছোট ছোট ঢিল এসে পড়ছে গায়ে, গায়ের চারপাশে। লোকের তাড়া, কুকুরের দাঁত খিঁচনো চিৎকার। এপাশে সুবলদা কখন ছুট্রে গিয়ে আধবালতি জল নিয়ে এসে গায়ে ঢেলে দেবার হুমকি দিচ্ছে কিন্তু পাগলার কোনও পরোয়া নেই। সে জ্বলজ্বলে চোখে ঝকঝকে দাঁতে তাদের দিকে তাকিয়ে নন-স্টপ হেসে চলেছে।

অতনু একেবারে সামনে এসে পড়ায় ছেলের দলের হাত থমকে গিয়েছিল। ফটোগ্রাফারের বিষয়টা কেমন লেগে গেল। ইশারায় সুবলদাকে থামতে বলে অতনু ঝট করে হাতের ক্যামেরা খুলে পোজিশন নিচ্ছিল। পাগলের বোধভাষ্যি বোঝা শক্ত। বন্দুক না পিস্তল সে কি ঠাওরাল কে জানে! সে চমকে উঠল। হাসি থেমে মুখে কেমন ভয়ের ভাব ফুটল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চোঁ-চাঁ দৌড় মারল। পাগলার মুখোমুখি পড়ে গিয়ে ছেলের দল দুভাগ হয়ে এ ওর গায়ে হুমড়ি খেল। যে কুকুরটা লম্ফঝম্ফ করে বীরত্ব দেখাচ্ছিল সেও সময়মত পিছু নিতে দেরি করে ফেলল। সুবলদা হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, 'শাবাস তনুদাদা, ব্যাটা খুব ভড়কি খেয়েছে।'

অতনু কোনও কথা বলল না, বিরক্ত মুখে ভেতরে চলে গেল। সুবলসখা তখনও নিজের মনে হাসছিল। কোলাপ্‌সিবল গেট বন্ধ করে দিতে দিতে বিড়বিড় করে বলল, 'শালা পাগলেরও দেখছি মাথার ঠিক নেই!'

'শিব ঠাকুর?'

অতনু কিছু ভাবছিল। কথাটা কানে যেতে মুখ ফিরিয়ে দেখল সুবলদা। তার প্রতিদিনের বরাদ্দ দিবানিদ্রার মেয়াদ শেষ করে এরই মধ্যে উঠে এসেছে। একটু তফাতে, ঝুঁকে দাঁড়িয়ে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে কেমন ভক্তি গদগদ দৃষ্টি। অতনু সহজ হয়ে যাবার চেষ্টা করে বলল, 'হ্যাঁ, তবে তোমার ভোলেবাবা না। নটরাজ, নাম শুনেছ?'

হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে সুবলদা বলল, 'জানি। অতড়া মুখ্খ্যু ভেবো না।'

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে সুবলদা শুতে গেলে অতনু ভেতরের ঘরে মূর্তিটা নিয়ে বসেছিল। গোটা তিনেক শট নিয়েও মনের খুঁতখুঁতিটা ঠিক যাচ্ছিল না। নটরাজের গা থেকে আবির মুছে ফেলার পরেও এক ধরনের সবজে রং জায়গায় জায়গায় গা-কামড়ে রয়েছে। এক ধরনের পেন্ট বলেই মনে হয়। বিশেষ করে হীরের ফুল দুটোর খাঁজে খাঁজে পুটিংয়ের মত জমাট বেঁধে বসে আছে। ছবি খুব পারফেক্ট আসবে না।

'আহা, কি বন্ন, য্যানো সোনার গৌরাঙ্গ! কোথা পেলে? আগে তো কখনও—'

'হ্যাঁ, যেন সোনার!' অতনু হাসল, 'চকচক করলেই কি সোনার হয় গো? দেখছ না রং করা।'

'উরি বাবা! আবার দুইখান দামী পাতর আছে দেখি। হীরে নাকি?'

'হীরে না হাতি! ঝুটো পাথরও চেনো না, কাঁচ। একজনের জিনিস, ফটো তুলে দিতে বলেছে। ভাল কথা, বাড়িতে সন্না আছে? পাকাচুল তোলার চিমটে? না থাকলে সেফ্‌টিপিন কি ছুঁচটুচ কিছু একটা আর খানিকটা ফর্সা ন্যাকড়া নিয়ে এসো তো। ক্লিনিং লোশনের শিশিটাও দিয়ো পাশের ঘরের তাক থেকে। ঠাকুরের গা-গতর একটু সাফা করে দিই।'

ভালই হল। সুবলদার কাছে মূর্তির ব্যাপারে সহজ হয়ে যেতে পেরে অনেক স্বস্তিবোধ করছিল অতনু। আর লুকিয়ে-চুরিয়ে বেড়াতে হবে না। ফরমাশমাফিক জিনিসগুলো দিয়ে সুবলদা চায়ের জল চাপাতে চলে গেল। ও নিজের কাজ নিয়ে বসল। নটরাজের গা থেকে সবুজ রংটা উঠে যেতে বেশি দেরি হল না। কিন্তু সন্না দিয়ে খোঁচাতে গিয়ে হীরে দুটো কেমন নড়বড়ে হয়ে গেল। ভয় হচ্ছিল খুলে না যায়। নখের ডগায় ন্যাকড়া বিঁধিয়ে মুছতে গেলেই ঘুরে যাচ্ছিল। দোষটা অতনুর নিশ্চয় না, আসলে পাথর সেটিংটাই ভাল ছিল না। কাল রাত্তিরে সেটা বোঝা যায়নি। সুবলদা আর এক চক্কর ঘুরে গেল। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে ওর হাতের কাজ দেখল। তারপর বলল, 'ডিমের বড়া ভাজি, চায়ের সঙ্গে খাবে তো?'

মুখ তুলে দেখার সময় ছিল না অতনুর। হাঁ না কি জবাব দিল সে নিজেই

জানে না। সুবলদা বিড়বিড় করে কি বলে ঘর থেকে চলে গেল। একটু পরেই ডোরবেল। অস্বস্তি নিয়ে অতনু ঘড়ির দিকে তাকাল। বুঝতে পারছিল এই অসময়ে তার কাছে কেউ আসার নেই, যেই আসুক, সুবলদার ব্যাপার, সুবলদা সামলাবে, তবু কাজে মন বসাতে পারল না। প্রথম বার বাজার পরে একটু অপেক্ষা করে, থেমে থেমে আরও দুবার বাজল বেলটা। সুবলদা করছেটা কি! অতনু হাঁক দিল গলা চড়িয়ে, কিন্তু কিচেনের দিক থেকে কোনও সাড়া নেই, লোকটা যেন বোবা-কালা সেজে বসে আছে। বিরক্ত অতনু নিজেই চলল দরজা খুলে দিতে।

দরজা খুলে একেবারে থ, ঠিক এখন এখানে দেখবে ভাবতেই পারেনি, টাল সামলাতে গিযে ভেতরে যেন রক্তোচ্ছ্বাস টের পাচ্ছিল। আপনি-তুমির প্যাঁচ কাটিয়ে দ্রুত গলায বলে উঠল, 'আরে! কী ব্যাপাব?'

আসলে ব্যাপার কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে, নইলে সন্ধের পর বাড়িতে থাকতে বলে এই দুপুব ফুরতে না ফুরতেই এসে হাজির হবে কেন! সুপর্ণা কেমন পাংশু হেসে বলল, 'খুব বিরক্ত করলাম তো? অসুবিধে থাকলে আজ না হয়—'

'না না, সেকি কথা!' নিছক কথার কথাই হয়তো, বলতে হয তাই বলা, মুখে যেন তাপ-উত্তাপ নেই।

'তাহলে একটু ভেতরে বসব।' বলে আড়চোখে তাকিয়ে সুপর্ণা ওকে বোঝার চেষ্টা করল।

'এই দেখো-দেখুন, ছি-ছি, আমি যেন আজকাল কি রকম হযে যাচ্ছি'—বলে অতনু দরজার মুখটা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। 'দেখো-দেখুন'—খিচুড়ি সম্বোধনটা সুপর্ণার কান এড়ায়নি, স্বাভাবিক অবস্থা থাকলে নিশ্চয হেসে ফেলত, কিন্তু আজ এখন হাসতে পারল না। ঘুরেফিরে কালকের কথাই মনে পড়ছিল বারবার। সত্যি বলতে কি, ঝোঁকের মাথায় অতনুকে ওরকম আঘাত সে না করলেই পারত। এসেছিল অন্য মন নিয়ে, হঠাৎ কথায়-কথায় কী যে হয়ে গেল! পুরো ব্যাপারটাই ভুল বোঝাবুঝির ফলে অন্য দিকে ঘুরে গেল।

বসার ঘরে এনে সুপর্ণাকে বসিয়ে অতনু বলল, 'তারপর? আমি এক্সপেক্টই করিনি, সন্ধের পর আসার কথা ছিল না?'

'ছিল। কিন্তু আমি তখন...আসলে আমি এখানে এক বিয়েবাড়িতে এসেছি, সন্ধের পর হয়তো আটকে যাব।' সুপর্ণা একটু থামল। আহত অতনু তাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে পাছে সন্ধের পর না থাকে সেই জন্যেই যে সে এত আর্লি চলে এসেছে সেকথা চেপে গিয়ে, সরাসরি বলেই ফেলল, 'কালকের ব্যাপারটায় কিন্তু আমার খুব—'

'মনে লেগেছে।' অতনু কথাটা পূরণ করে দিয়ে অল্প একটু হাসল, বলল, 'খুব স্বাভাবিক। আমার উচিতই হয়নি তোমাকে—স্যরি, স্লিপ অব টাং—আসলে হঠাৎ কেমন ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম। মনের মধ্যে অনেক কথা এমন—'

সুপর্ণা অভিভূতের মত কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই পিছনের দরজার পর্দা সরিয়ে সুবলদা উঁকি মারছে দেখে থমকে গিয়ে হেসে ফেলল। অতনু ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখতে পেয়ে গেল।

'ছিলে কোথায় এতক্ষণ?'

'একটু দোকানে গিয়েছিলাম। দু-একটা জিনিস ফুরিয়ে গিয়েছিল, খেয়াল ছিল না। ভাবলাম পাঁচ মিনিটের ব্যাপার, খিড়কির দোরে তালা দিয়ে—'

'ঠিক আছে, এসো, আমরা একটু কথা বলছি।'

'এখন আমার ছুটি, এই তো?' সুবলদা ফিক করে হেসে বলল, 'এখন তাহলে কিছু দিচ্ছি না তো! চা কিন্তু হয়েই গিয়েছিল।'

হেসে ফেলে জিজ্ঞাসু চোখে সুপর্ণাব দিকে তাকাল অতনু। সুপর্ণা অনেক স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল, যেন পলকে আবহাওয়া বদলে গেছে চারপাশে। বলল, 'ওনলি টি সুবলদা, অবেলায় খেয়ে উঠেছি।'

সুবলদা ভেতরে রেডি হয়েই ছিল, চা দিয়ে গেল এক মিনিটের মধ্যেই। দুজনেই তখন কেমন চুপচাপ, আগের খেই হারিয়ে গেছে। চায়ে চুমুক দিয়ে সুপর্ণা হঠাৎ বলল, 'আমাকে কাল কিন্তু 'তুমি'ই বলেছিলে।'

'কি বলেছিলাম?'

'কেন 'তুমি'। আজ আবার স্লিপ অব টাং হল কেন?'

অতনু হেসে বলল, 'বেশ, তাই। তুমি বলা আর আচমকা হাত ধরে ফেলা নিশ্চয় এক ক্যাটাগরির অন্যায় নয়!'

'তুমি তো বেশ হুল ফোটাতে শিখেছ, অতনু!'

মুচকি হেসে অতনু কি যেন বলতে গিয়েছিল, তার আগেই চমকে উঠল। ভেতরের ঘরে একটা ধাতব শব্দ উঠল ঝনঝন করে। মূর্তির কথাই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল অতনুর। এক লাফে উঠে গিয়ে সে ভেতরের ঘরে উঁকি মারল। তার উদ্বেগের পরিমাণ আঁচ করে সুপর্ণাও অতনুর পিছন পিছন ছুটল। ঘরের মধ্যে খাটের কিনারে, কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে ছিল সুবলদা। অতনুকে দেখে প্রায় ডুকরে উঠল সে, 'সর্বনাশ হয়েছে তনুদাদা! আমি পাপী। আমার হাত থেকে পড়ে ঠাকুর দু টুকরো হয়ে গেলেন।'

অতনু দেখল, সত্যিই মেঝের ওপরে নটরাজের মূর্তিটা দু টুকরো হয়ে পড়ে আছে।

এমন একটা দৃশ্য দেখবে, ছুটে আসার মুহূর্তেও কল্পনাও করতে পারেনি

অতনু। খাটের পাশে দাঁড়িয়ে সুবলদা কাঁচুমাচু মুখে নিচু হয়ে মূর্তির টুকরো দুটো কুড়োতে যাবে, তার আগেই অতনু ছুটে গিয়ে ছোঁ মেরে তুলে নিল। এক নজরেই ও বুঝে নিয়েছিল, সুবলদা যা ভেবেছে মোটেই তা নয়, কোনও সর্বনাশই ঘটেনি। ভাঙেনি এটা, জোড় বরাবর খুলে গেছে মাত্র। কাল রাত থেকে এই জোড়ের ব্যাপারটাই তার মাথায় কেবল ঘুরছিল। মনের মধ্যে এমন একটা সন্দেহ থেকে থেকে খোঁচা মারছিল যে, মূর্তিটা হয়তো আদৌ নিরেট নয়, ফাঁপা। ছাঁচে ঢালাই করা দুটো আধাআধি অংশকে খুব সম্ভব নিপুণভাবে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও খোলার কৌশলটা ধরতে পারেনি।

এখন অবশ্য তাকিয়ে দেখার, খুঁটিয়ে দেখার সময় নেই। আপাতত তার প্রয়োজনও নেই। সে সব পরে দেখা যাবে। সুবলদার থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে হাল্কা গলায় হাসল অতনু, 'তুমি বড্ড উতলা হও, কিস্যু হয়নি, তোমার ঠাকুর সুস্থই আছেন। যাও এবার চা-ফা দাও দিকি আমাদের।'

পিছন ফিরে না তাকালেও অতনু সুপর্ণার পায়ের শব্দে বুঝতে পেরেছিল সেও সঙ্গে সঙ্গেই আসছে। হয়তো পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে এখনও। তাই পিঠের আড়াল রেখেই হাত বাড়িয়ে বালিশের তোয়ালে ঢাকনাটা টেনে নিল তাড়াতাড়ি। মূর্তিটা তাতে জড়িয়ে আলমারির দিকে এগিয়ে গেল লকারের ভেতর তুলে রাখার জন্যে। সুপর্ণা অবশ্য আর দাঁড়িয়ে থাকেনি। ব্যাপারটা মারাত্মক কিছু নয় বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার নিঃশব্দে ফিরে গিয়েছিল নিজের জায়গায়।

বসবার ঘরে ফিরে এসে অতনু সহজ করে দিল ব্যাপারটা, 'ভেবেছিলাম কি না জানি! আসলে আমার একটা পোর্ট্রেট মডেল সুবলদার হাত ফসকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।' বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাসল।

সুপর্ণা নিরীহ গলায় বলল, 'ওঃ, এই ব্যাপার?' তাল কেটে যাওয়ায় পুরনো কথার খেই হারিয়ে গিয়েছিল। দুজনের কেউই আর ছেড়ে-যাওয়া প্রসঙ্গটা মনে করতে পারল না। নতুন করে কথা শুরু করতে তাই একটু যেন বেশিই সময় লাগল। অতনুই প্রথম কথা বলল, 'তোমার চেহারা কিন্তু যাই বলো অনেক বদলেছে। সেই রানুটি নেই।'

'জানি, কিন্তু নিজেরই আর মনে থাকে না। এই, সত্যি বলবে, বিশ্রী রকম মুটিয়ে গেছি, তাই না?'

'আগের মত স্লিম নেই, শরীরে কিছুটা ভারী-ভরাট হয়েছ এ তো সত্যি কথাই। তার চেয়েও বড় কথা, ছাঁদ বদলে তোমার চেহারায় একটা স্থায়ী ক্যারেকটার এসে গেছে। তবে যদি বলো বিচ্ছিরি কিনা—সে তোমার শত্তুরেও বলতে পারবে না। ইউ আর রিয়্যালি চার্মিং।'

'এই তো! স্তোকবাক্যি বেরোচ্ছে মশাইয়ের গলা দিয়ে। পুরুষরা ইটারনাল লায়ার এক একটি।'

'পাক্কা ফেমিনিস্টের মতন কথা বললে।' ছদ্ম-গম্ভীর গলায় মাথা নেড়ে অতনু বলল, 'এর পর, ভগবান না করুন, প্রেম নিবেদন করতেও ভয় করবে।' বলেই দরাজ গলায় হেসে উঠল সে। সুপর্ণাও। মনের মধ্যে জমে-থাকা বন্ধ বাতাস যেন দুজনের হাসির তোড়ে বেরিয়ে গেল। অতনু নিজেও ভাবতে পারেনি স্রেফ কথার পিঠে কথার টানে সে এতখানি সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলে ফেলতে পারবে কথাটা। হয়তো একসময় তার অবচেতন মনের মধ্যে সুপর্ণার প্রতি একটা ক্ষীণ দুর্বলতা দানা বাঁধার উপক্রম করেছিল কিন্তু কলেজের ওই আকস্মিক দুর্ঘটনার ধাক্কায় সেটা বুদ্‌বুদের মতই কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তবে সুপর্ণার কথা তার ভেসে বেড়ানো জীবনে মাঝে মাঝে খচখচ করত অন্য একটা কারণে। তার থেকে থেকেই মনে হত এভাবে গায়ে পড়ে ঝাঁপিয়ে-পড়া সুপর্ণা কি চোখে দেখেছে কে জানে! ভাবতেই পারে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মাবার জন্যেই বাহাদুরি দেখাতে গিয়েছিল অতনু। কেউ তো তাকে রেসকিউ করার জন্যে ডাকেনি। প্রফেসারকে যতটুকু জানত, সুপর্ণাকে তো তার সিকির সিকি জানা হয়নি কখনও। কলেজের মুখচেনা এক ছাত্র ছাড়া অতনুর কোনও পরিচয়ই সুপর্ণাব রাখার কথা নয়। মাঝ থেকে তাকে বিপদের মধ্যে জড়িয়ে দিয়ে নিজে সে দিব্যি পালিয়ে চলে এসেছে। একটি মেয়ের কেরিয়ার নষ্ট হতে খুব বেশি কিছুব তো দরকার হয় না। রাস্তার বখাটে মস্তানের চেয়ে, বিকৃত রুচির ভিলেনের চেয়ে তার ইমেজ খুব একটা উজ্জ্বল ছিল না।

'অসভ্যতা রাখো।' সুপর্ণা হঠাৎ অন্য গলায় বলল, 'আবার কবে পালাচ্ছ সেই কথা একটু শুনে রাখি মশাই।' বলে অতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন সবজান্তার হাসি হাসল।

অন্যমনস্ক থাকায় ভীষণ চমকে উঠেছিল অতনু। মেয়েটা তার মনের কথা কি পড়ে ফেলার বিদ্যে জানে? তারপরেই বুঝল, না। নিছক মজা করেই কথাটা বলেছে সুপর্ণা, কোনও গভীর ইঙ্গিত এর তলায় নেই। মুচকি হেসে জবাব দিল, 'পালাব, পালাব, এত ব্যস্ত হবার কি আছে! তার আগে একটু তোমার কথাই শোনা যাক। তুমি ডাক্তার, ঠারেঠোরে সেটা আমার জানা হয়ে গেছে। কিন্তু আছ কোথায়?'

সুপর্ণা বলল, 'যাক এতক্ষণে কিছুটা প্র্যাকটিক্যাল মানুষের মত কথা বলেছ। কলকাতা থেকে অনেক দূরে এক অদ্ভুত জায়গায় আছি। পসার জমাতে পারিনি এখনও।'

'অন্য কিছু জমাতে পারোনি?' অতনু আধবোজা চোখে হাসল।

সুপর্ণা স্পষ্ট চোখে তাকাল, 'তুমি কি জানতে চাইছ বুঝেছি কিন্তু সেটা আপাতত উহ্য থাক। যদি কখনও আমাদের ওদিকে যাও, আমার গেরস্থালি নিজের চোখেই দেখে এসো। ইন ফ্যাক্ট আজ তোমাকে নেমন্তন্ন করে যাবার সুযোগটুকুই নিচ্ছি। হয়তো গায়ে পড়েই নিচ্ছি।'

অতনু বুঝল, সুপর্ণা নিজের সুরক্ষার গণ্ডিটুকু বেশ কৌশলের সঙ্গেই টেনে দিল। কোনও কারণ নেই, তবু কেমন ধাক্কা খেল। কথা বলতে পারল না। তার কথার অপেক্ষায় অবশ্য সুপর্ণা সেই মুহূর্তে বসে ছিল না। সেদিনের মতই অন্যমনস্ক হাতে একবার ব্যাগের চেন খুলল, বন্ধ করল, আবার খুলল। তারপর ভেতব থেকে প্রেসক্রিপশন প্যাডের মত কিছু বের করল। বলপেনের মাথা টিপে এক মুহূর্ত কিছু যেন চিন্তা করল। অতনু মনে মনে নিজেকে শুনিয়ে হাসল, নাও ব্যাচেলার মানুষের দাওযাই আসছে, তৈরি থাক।

সুপর্ণা প্যাডের কাগজে খসখস করে কি সব লিখে চলল দ্রুতগতিতে।

সব শুনে শচীদুলাল তার চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে থাকল। অতনু একটা নিশ্বাস ফেলে ধীরে-সুস্থে তার প্যাকেট খুলে সিগারেট বের করল।

'সিগারেট চলবে?'

শচী কোনও উত্তর দিল না। অতনু আর ওকে ডিস্টার্ব করল না। আগাগোড়া ঘটনা শুনে শচী যে খুব নাড়া খেয়েছে, ভেতরে ভেতরে বিচলিত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। অতনু জানে, শচী এখন তার সমস্যাকে নিজের সমস্যা করে নিয়েছে। এক বিন্দু অবিশ্বাস করা দূরে থাক, ও যেন আগ বাড়িয়ে তার প্রতিটি কথা লুফে নিচ্ছিল। মুখে কিছু না বললেও ওর চোখ, ওর মুখের রেখা ওর ভেতরের উৎকণ্ঠাকেই প্রকাশ করছিল।

অনেকক্ষণ চোখ বন্ধ করে থাকার পর শচী চোখ খুলল।

'দাও একটা সিগারেটই দাও।'

অতনু সিগারেট, আগুন যুগিয়ে বলল, 'বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিলাম। এবার বল্।'

'তোমার কেস খুব গোলমেলে।'

'হুঁ, সে আর কে সন্দেহ করছে!'

'আমি কোনও ওয়ে আউট দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমিও।'

'ফেঁসেছ। নিজের বোকামিতে ফেঁসেছ।' শচী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমার মনে হয় ফারদার বোকামি করার কোনও মানে হয় না।'

'ফারদার বোকামি? কী বলছিস তুই!'

'পালাও। কলকাতা ছেড়ে দূরে কোথাও কিছুদিন গা ঢাকা দাও। কারণ পুলিশে

ছুঁলে আঠারো ঘা। ছোঁবার আগেই তোমাকে সাবধান হতে হবে।'

অতনু আর কোনও জবাব দিচ্ছে না দেখে শচী বোধহয় একটু অসন্তুষ্টই হল। বলল, 'কী? চুপ মেরে গেলে কেন? আমার পরামর্শ বুঝি মনে ধরল না! গরিবের কথা কিন্তু বাসি হলে ফলে।'

'না, তুই বোকামি বলছিস কেন?'

'বোকামি নয়? কাজটা কি ঠিক হয়েছিল এখনও বলতে চাও? নিশির ডাক শুনে যে সাড়া দেয়, আগু-পিছু না ভেবে দৌড়য়, তাকে কী বলব? কে না কে এক রঞ্জুপ্রসাদ, যার নামটাই তুমি জীবনে শোনোনি, কোথায় না কোথায় ঝিল রোড যেখানে জন্মে কখনও পা রাখোনি, তোমার একবারও মনে হল না সেখানে তোমাকে ফাঁদে ফেলার ষড়যন্ত্র চলেছে?'

'না, হয়নি। হয়নি, তার একটা কারণও আছে। রঞ্জুপ্রসাদ কে তা না জানলেও ঝিল রোড, ঝিল রোডের ওই বাড়ি আমার অজানা নয়। কি জন্যে তা আর মনে নেই, তবে খুব ছোট্টবেলায় বাবার হাত ধরে যে ওই শেষ নমস্কার-এ গিয়েছিলাম সেটা স্মৃতির মধ্যে আবছা ছবির মত এখনও লেগে আছে। আর তাও একবার নয়, বার দুই তো নিশ্চয়ই, তিনও হতে পারে।'

অবাক চোখে অতনুকে দেখছিল শচী। বলল, 'ঠিক বলছ, কোনো ভুল হচ্ছে না তোমার? অন্য কোনও জায়গার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছ না তো, ভেবে দেখো!'

'ঝিল রোডকে গুলিয়ে ফেলা কিছু আশ্চর্য ছিল না। কিন্তু শেষ নমস্কার? না।'

উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে বসে দাঁতে নখ কাটছিল শচী, অর্ধদগ্ধ সিগারেট অ্যাশট্রের মধ্যে গুঁজে দিয়ে মন্তব্য করল, 'এ যে রহস্যগল্পের মত ঠেকছে। ইস, এমন একটা ঘটনা তুমি চেপে রেখেছিলে ব্রাদার!'

'উঁহু! চেপে যাইনি, চাপা পড়ে গিয়েছিল বলতে পারিস। সব কথা কি বলা হয়ে ওঠে, নাকি দরকারী মনে হয়? তবে তুই ঠিকই বলেছিস, একটা গভীর রহস্য—'

'রহস্য অ্যান্ড রোমাঞ্চ বলো—'

'তাহলেই ভেবে দেখ, এই রহস্য যদি ভেদ করতে হয়, আমার ঠাঁইনড়া হলে চলবে না। শেষ নমস্কার-এর পুরনো রেকর্ড খুঁজে বের করতেই হবে। আর এ ব্যাপারে হয়তো তোর সাহায্যও দরকার হবে।'

একটু চুপ করে থেকে শচী বলল, 'বেশ, আমার সাহায্য তুমি পাবে। যা বলবে, যেমন বলবে আমি সাধ্যমত সে হুকুম তামিল করতে চেষ্টা করব কিন্তু একটা শর্তে।'

'কী শর্তে?'

'তুমি ওপাড়ার ধারে-কাছে যাবার চেষ্টা করবে না। ও-বাড়িতে তোমাকে ঢুকতে বা বেরোতে যদি কেউ নাও দেখে থাকে তবু একটা ব্যাপার তুমি ভুলে যেয়ো না, সন্দীপের সঙ্গে তোমার চেহারার আশ্চর্য মিল আছে। আর সেটা ও-বাড়ির ভাড়াটে কিংবা পুলিশ কারুরই নজর এড়াবে না। তুমি ধরা পড়ে যাবে। যেচে যদি হাড়িকাঠে গলা বাড়াতে চাও, আমি এর মধ্যে নেই।'

'ঠিক আছে, আমি প্রমিস করছি।' বলে অতনু ঝোলার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ফ্লাস্কের বাক্সটা বের করে শচীর হাতে দিল, 'এটা আবার জায়গামত রেখে দে।'

'তুমি সেই ফেরত না এনে ছাড়লে না।' শচী হাসল, 'ভবী ভোলবার নয়। ঘুরে-ফিরে সেই আমার ঘাড়েই এসে পড়ল।'

অতনু বলল, 'রাখ, রেখে দে। কোনও দুর্দিনে কাজে লেগে যেতেও পারে। সোনা বলে কথা।'

একটা বিরক্তির শব্দ করে শচী চেযার ছেড়ে উঠল। খাটের তলায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে খুটখাট কি করতে করতে বলল, 'তুললে ছবি?'

'হ্যাঁ, তুললাম। মূর্তিটা এখনও আমার কাছে ধাঁধা। সব তোকে খুলে বলা দরকার।'

'তার আগে একটু খাবারের ব্যবস্থা করি।' খাটের তলা থেকে বেরিয়ে শচী বলে, 'একটু জমিয়ে বসে শুনব। সিগারেট লাগবে কিনা বলো?'

অতনু তার চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বলল, 'আনিস এক প্যাকেট। সিগারেট ফুরিয়ে এসেছে।'

শচী বেরিয়ে যেতে চোখ বন্ধ করে অতনু স্মৃতি রোমন্থনে ব্যস্ত হল।

সুপর্ণা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ আবিষ্ট হয়ে বসেছিল অতনু। সব কেমন যেন এলোমেলো করে দিয়ে গেল মেয়েটা। নতুন করে কোনও কাজে আর মন বসছিল না। তবু শচী তার বাড়িতে কাল নিশ্চয় অপেক্ষা করে থাকবে। মূর্তির ব্যাপারটা আজই সেরে রাখা ভাল। ভেতরের ঘরে গিয়ে অতনু যখন আলমারি থেকে তোয়ালে জড়ানো মূর্তিটা বের করে নিয়ে বিছানায় বসল, সুবলদা এগিয়ে এল পায়ে পায়ে।

'কোনও ক্ষতি হয়নি বলছ তো তনুদাদা? ঠিক তো?'

'হ্যাঁগো হ্যাঁ, কিস্যু হয়নি, বলেছি না!'

'আসলে আমি ভেবেছিলাম তোমার কাজটা একটু এগিয়ে রাখি। তাই মুছতে গিয়েছিলাম। প্রথমে বুঝতে পারিনি, পরে খেয়াল হল। দেখলাম ঘষতে গিয়ে পাথর দুটো ঢিলে করে ফেলেছি। তুমি দেখলে রাগ করবে ভেবে তাড়াহুড়ো

করে যেই টাইট করতে গেছি অমনি হাত ফসকে—'

অতনু বলল, 'ঠিকাছে, অতবার করে বলতে হবে না। তুমি বরং আমার জন্যে বেশ কড়া করে আদা দিয়ে লিকার করে আনো।'

দুটো আধলা মূর্তির টুকরো হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে অতনু চমকে গেল। হীরের ফুল দুটো আসলে কেবল মূর্তির শোভা বৃদ্ধির জন্যে বসানো হয়নি। ওটা স্প্রিংযের লক খোলা-বন্ধর চাবি ছাড়া কিছু নয়। কাঠের খাপটির মতই, তবে এখানে পদ্ধতিটা, মানে মেকানিজমটা একটু অন্য রকমের। ফাঁপা ভেতবটা শূন্য, কিছু নেই। কিন্তু নেই কেন? কিছু লুকিযে রাখার জন্যেই নিশ্চয কারিগরকে দিযে মাথা খাটিযে বের কবা হযেছিল। চিন্তিত মুখে অতনু আবার একটু চেষ্টা করতেই মৃদু শব্দ করে মূর্তিটা জুড়ে গেল। এবার দেখে কেউ ভাবতেই পারবে না, এটা অখণ্ড নয়, নিরেট মূর্তি নয়, জুড়ে দেওযা হযেছে।

চোখ বন্ধ কবে এখনও মূর্তিব রহস্যটাই ভাবছিল অতনু। শচীর জেঠু স্যার কযেক দিনেব জন্যে নাকি বাইবে গেছেন। না ফিরলে আসল মালিকের বিষয়ে কিছু অনুসন্ধানও সম্ভব নয়। শচীর সেই দিদিটি আপাতত ভ্যানিশ করে গেছেন। তাঁর অতীত সম্পর্কে একটা না একটা সূত্র পেলে তা ধরে হয়তো কিছুটা এগোতে পারা যাবে। এই সব সাত-পাঁচ ভাবছিল, এমন সময় শচী ফিরে এল। বলল, 'বলো ব্রাদার, এবার আমি রেডি।'

মনস্থিব কবতে অতনুর একটু সময লাগছিল। সেটা চাপা দিতে সে ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরাল। ভাবল মূর্তিব সব কথাই সে বলবে। সেদিন অটোর ঘটনাও বাদ দেবে না। কিন্তু সুপর্ণাকে আপাতত আড়ালে রাখাই ভাল। সুপর্ণার ব্যাপার, তার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। শচী না বুঝেই লম্ফঝম্ফ করবে, ঠাট্টা করবে। ছেলেমানুষের মত বলবে, বিয়ে করে ফেলো তনু, দিস ইজ হাই টাইম।

অতনু ধীরে ধীরে সুপর্ণাকে আড়ালে রেখে সমস্ত ঘটনাই খুলে বলল।

শচী মাথা নেড়ে বলল, 'হুঁ! রহস্যটা যে এরকম জম্পেশ হয়েছে, আমি জানতাম না। কতজন প্লেয়ার খেলছে কে জানে? সেই টেলিফোনের মেয়েটার কথাও ভাবো। সেদিন খামোকা একটা নাটক করে দিব্যি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। অতনু, খুব সাবধান ভাই।'

অতনু ওর মুখের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'সাবধানের মার নেই যেমন, মারেরও সাবধান নেই। বিপদ থেকে পালিয়ে কি বাঁচা যায়!'

বেশ রাত করে বাড়ি ফিরল অতনু। যতটা সতর্ক হয়ে চারপাশে নজর রেখে চলা উচিত ছিল, তার কিছুই সে করল না। আজ যেন সে একেবারেই বেপরোয়া। দরজা খুলে দিয়ে সুবলদা বলল, 'তোমার একটা জিনিস আছে তনুদাদা।'

অতনু চমকে উঠে বলল, 'কেউ এসেছিল? কই দেখি?'

'কেউ আসেনি তো! খাটের তলা পরিষ্কার করতে গিয়ে পেলাম। মনে হচ্ছে তোমারই দরকারি কিছু হবে।'

একটা সরু পাকানো তুলোট কাগজ সুবলদা তার পকেট থেকে বের করে অতনুর হাতে দিল। ঠিক এই জিনিসটার জন্যে বুঝি অতনু প্রস্তুত ছিল না।

তা প্রস্তুত তো ছিলই না। পেন্সিলের আকারে সরু করে পাকানো খুব ফিনফিনে তুলোট কাগজের পাক খুব সাবধানে খুলতে গিয়ে অতনু ধাঁধায় পড়ে গেল। হলদেটে রঙের, আঁশ-জমানো-দেখতে জিনিসটা বোধহয় কাগজ নয়, অজানা কোনও গাছের বাকল বা টিসু, কিংবা কোনও বন্য প্রাণীর ছালচামড়া হওয়াও বিচিত্র নয়। কাগজের চেয়ে অনেক মজবুত, টেকসই এবং অ্যান্টি-ক্রিজ। শুধু কোনও রাসায়নিক পদ্ধতিতে, কি কৌশলে সেটা বানানো সম্ভব হয়েছে তা অতনুর অজানা। আপাতত তা নিয়ে সে মাথা ঘামাচ্ছিল না। প্রথম হাতে নিয়েই তার চমকে ওঠার কারণ অন্য ছিল। প্রথম থেকেই কেমন ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, যত সামান্য পরিমাণেই হোক মূর্তিটা ফাঁপা, এবং অকারণে ফাঁপা নয়। তার ভেতরে মূর্তি-সংক্রান্ত কোনও-না-কোনও সূত্র নির্ঘাত পাওয়া যাবে। জোড় খুলে যাবার পর, ভেতরটা শূন্য দেখে সে হতাশ হয়েছিল। এই ফক্কিকারির কোনও অর্থই তার বোধগম্য হয়নি। মন থেকে সমস্ত প্রত্যাশা যখন মুছে গেছে তখন নাটকীয়ভাবে পাকানো টুকরোটা হাতে এল। নিচু ইংলিশ খাটের তলায় টুকরোটা ছিটকে চলে গিয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। টুকরোটা ভেতরে আছে না জেনেই অপস্তুত অতনুর মনটা নেচে উঠেছিল। খুব সাবধানে একটু একটু করে পাক খুলে ফেলার পর অতনু দেখল জিনিসটা চওড়ায় সামান্য কম হলেও লম্বায় একটা ফুলস্ক্যাপ সাইজের সমান। কিন্তু একেবারেই শূন্য পৃষ্ঠা, কোথাও একটা কালির আঁচড় কিংবা ফুটকি পর্যন্ত নেই। এই দ্বিতীয়বার বোকা বনে গিয়ে হতবাক অতনু যখন সাদা পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে আছে ঠিক তখনই খেয়াল হল তার সামনে দাঁড়িয়ে সুবলদা দু হাত কপালে ঠেকিয়ে কি বিড়বিড় করছে।

লোকটার এই অন্ধ ধর্মভাবের বাড়াবাড়িতে এবার অতনু সত্যিই বিরক্ত হল। বলল, 'তুমি সবসময় ছেলেমানুষী কোরো না তো! যাও ভাগো। আমি মরছি নিজের জ্বালায়—'

অতনুর উষ্মা সুবলসখা গায়েই মাখল না। গদগদ গলায় বলল, 'ইটা ঠাকুরের গভ্যে ছিল না?'

'হ্যাঁ, গভ্যেই ছিল! বুদ্ধির অন্ত নেই দেখছি।'

'তবে?'

'কী তবে?'

'পাঁচালি-পুঁথির পাতা নেশ্চয়?'

'তোমার মুণ্ডু!'

'ঠাকুর-দেবতা নিয়ে আছরেদ্ধা ভাল না, তনুদাদা!'

অতনু ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'পুঁথিপত্তরের জ্ঞান আবার তোমার কবে থেকে হল, বাপু?'

'বাঃ, সে তো তুমিই বলেছ! এরকম গাদাগাদা পত্তর তুমি পড়তে না একসময়? ছবি তুলতে। বলেছিলে, সুবলদাদা, এগুলো হচ্ছে পুঁথির পাতা। খুব পুরনো জিনিস।'

'ঠিকাছে, ঠিকাছে, এখন যাও তো সুবলদাদা।'

'তা যাচ্চি। কিন্তু পেত্যয় না হয় নিজের চোকেই দ্যাখো একবার।' বাঁ হাতে ডান হাতের কনুই ছুঁয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে কাগজটার দিকে আঙুল তুলে কি দেখাতেই অতনু চমকে উঠল। দু হাতে টানটান করে মেলে ধরে পাতাটার ভেতরের পৃষ্ঠাটাই এতক্ষণ তার চোখের সামনে ছিল। উল্টো পিঠে কিছু থাকতে পারে একবার মনেও হয়নি। একচক্ষু হরিণের মত মানুষ এক একসময় বুঝি এরকমই বোকা হয়ে যায়। সুবলদা অবশ্য আর দাঁড়ায়নি। অভিমানী মানুষ, কথাটা তার খুব মনে লেগেছিল বুঝি বা। কিন্তু সেটা লক্ষ্য করার মত মনের অবস্থা তখন অতনুর ছিল না। পাতাটা ঘুরিয়ে ধরতেই সে একেবারে থ হয়ে গেল।

তখন সকাল সাতটাও বাজেনি। শচীদুলাল অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। এক একজন মানুষের শোয়া খুব খারাপ। ঘুমের মধ্যে তারা বিছানায় প্রায় ভ্রমণ করে বেড়ায়। শচী সেইরকম। গায়ের চাদরটা অর্ধেক তার বুকের তলায়, অর্ধেক ভুঁয়ে লুটোচ্ছে। মাথার বালিশ সরে গেছে অন্য দিকে। চটকানো পাশবালিশের ওপর দু হাঁটু মুড়ে কুঁকড়ে-মুকড়ে শুয়ে আছে শচী। আর একটি প্রাণী, বোধহয় মনু, এই খাটে শোয়, মাতুলঘটিত ঝুঁকি নিয়েই নিশ্চয়। সে কখন উঠে গেছে।

অতনুর হাতের বার কয়েক নাড়া খেয়ে শচী ধড়মড় করে উঠে বসল। ঘুমের বোঁটা থেকে চটকা ছিঁড়ে আসায় তার চেতনা ঠিক দিশে পাচ্ছিল না। ভ্যাবলা চোখে অতনুর দিকে তাকিয়ে ছিল সে।

অতনু খুশির গলায় বলে উঠল, 'ইউরেকা শচে, ইউরেকা!'

শচী চোখ কচলে অতনুর মুখের দিকে তাকাল। কী ইউরেকা, কিসের ইউরেকা কিছুই তার মাথায় ঢুকল না। ব্যাজার মুখে সে বলল, 'এই কাকভোরে এসে কী হেঁয়ালি শুরু করলে তনু!'

হাঃ হাঃ করে হেসে অতনু বলল, 'কাকেদের ভোর হয়েছে অন্তত ঘন্টা

খানেক আগে, ঘড়ির দিকে তাকালেই বুঝতে পারবি। রোদ্দুরে ভেসে যাচ্ছে চারপাশ। যা চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে আয়, তোকে একটা দারুণ জিনিস দেখাব।'

'কই, কি জিনিস দেখি?' ঘুমের রেশ ফর্দাফাই হয়ে গিয়েছিল চোখ থেকে, আর যেন তর সইছিল না শচীর। জবাবে অতনু মাথা দোলাল, অর্থাৎ না। অগত্যা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শচী।

শচী ফিরে আসতেই অতনু বলল, 'এই দ্যাখ্‌, তোর মূর্তির ভেতর থেকে এটা বেরিয়েছে।'

শচী অবাক, বল্‌ল, 'যাঃ, মূর্তি তো আমার কাছে!'

'কথাটা শোন আগে। কাল রাতে তোর এখান থেকে ফিরে যেতেই সুবলদা এটা আমাকে দিল। বলল, খাটের তলা ঝাঁট দিতে গিয়ে পেয়েছে। বুঝলাম মূর্তিটা পড়ে যাবার পর ছিটকে চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিল।'

সেন্টার টেবিলের ওপর পাতাটা মেলে ধরল অতনু। দু পাশে চিত্রবিচিত্র নকশার বর্ডার দেওয়া পাতাটার মাঝখানে সরু কালির আঁচড়ে অনেকখানি লেখা।

'কী এটা?'

'কী মনে হয়?'

'বাংলা হরফে সংস্কৃত শ্লোক মনে হচ্ছে, অনুস্বর বিসর্গ দেখে বুঝতে পারছি। আমার দৌড় ওই পর্যন্তই। সংস্কৃত! ওরে বাপ! গ্রিক হিব্রু ল্যাটিনের মতই আমার কাছে ফোরেন ব্যাপার। কী লেখা আছে ওতে? গুপ্তভাণ্ডারের নকশা-ফকশা কিছু?'

'আমিও ভাল বুঝি না। তবে জয়দেব মার্কা বঙ্গজ সংস্কৃত, দন্তস্ফুট করা যায় না এমন কুলীন পণ্ডিতি ভাষা নয়। দুশো বছরের বংশ পরম্পরার ইতিহাস বলেই আমার মনে হল।'

ঠোঁট উল্‌টে শচী বলল, 'ব্যস, এই? এই তোমার ইউরেকা?'

'হ্যাঁ। কিন্তু 'ব্যস, এই' কেন বলছিস? কয়েক পুরুষের রাজারাজড়ার কাহিনী, এই কুলদেবতার হাত বদলের সংকেতও বোধহয় পাওয়া যাবে। আরও খুঁটিয়ে দেখতে হবে, তবে এখন পর্যন্ত যেটুকু বলতে পারি তা এই।—যে মানুষটি এই শ্লোকগুলোর রচয়িতা তিনি কেবল ধাঁধা রচনায় সিদ্ধহস্তই ছিলেন না, ছিলেন চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী। দুপাশের জ্যামিতিক অলঙ্করণ, যা প্রথম দর্শনে নিছক ডেকোরেশন মনে হবে তোর, আমার সন্দেহ তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে।'

শচীর ভেতরে কৌতূহল টানটান হচ্ছিল। দমবন্ধ চাপা গলায় শচী বলল, 'তুমি যা বলছ তার...তার কোনও প্রমাণ আছে?'

'আছে। প্রমাণ এই কালি।'

'কালি!' শচী হুমড়ি খেয়ে নকশা আর লেখার দিকে তাকাল। কোনও বিশেষত্বই তার চোখে পড়ল না। হলদে পৃষ্ঠার ওপরে কুচকুচে কালো যেন কেটে বসেছে। মাথা নেড়ে শচী বলল, 'দূর! এ তো চাইনিজ ইংক। আজকের দিনের একটা শিশুও বলে দিতে পারে।'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল অতনু, 'দ্যাখ্ শচে, এই লেখা আর আঁকা কত দিন আগের আমি বলতে পারব না। কিন্তু লোকটি যে অসাধারণ বর্ণবিজ্ঞানী ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। দু ধরনের কালি তিনি এখানে ব্যবহার করেছেন। একটা স্থির, তার নড়ন-চড়ন নেই, জমি কামড়ে পড়ে আছে। অন্যটা ডাইনামিক, চলে বেড়ায়। এয়ারপোর্টের লুমিনাস সাইনের মত, আলো পড়লে ঠিকরে দেয়।'

বেশ একটু সময় সন্দিগ্ধ চোখে ঝুঁকে থেকে দুঃখিত গলায় বলল শচী, 'সত্যি তোমার মাথাটার—'

'অনেক দাম রে শচী, আমার মাথাটার অনেক দাম।' নিজের প্রশংসায় নিজেই হেসে উঠে গলা থেকে ঠাট্টার সুর মুছে ফেলল অতনু, 'এরকম ফ্ল্যাট অবস্থায় দেখতে পাবি না। রোদ্দুরের কাছে গিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখ্ তো কিছু চোখে পড়ে কিনা।'

শচী তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েই আবার চেপে সিট-ডাউন হল। শচীর বড়দি ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই হেসে উঠলেন, 'কী ব্যায়াম হচ্ছে, না অন্য কিছু? কোনও ষড়যন্ত্র নয় তো, সকাল থেকেই কেবল ফিসফাস শুনছি!'

অতনু হেসে ফেলল, 'যারা বেলা অব্দি ঘুমোয়, ঘুমের মধ্যে বিছানাময় চলে বেড়ায় তাদের ঘুম ভাঙাতে আমার ভাল লাগে। আপনার এই ভাইটি দিদি একেবারে যাচ্ছেতাই। বলে কিনা এটা কাকভোর!'

'ওর কথা আর আমাকে বোলো না।' বড়দি সহাস্যে বেরিয়ে যেতেই শচী পুবের জানলার কাছে ছুটল।

অতনু চায়ের কাপে গোটা দুই চুমুক দিয়ে আরাম করে একটা সিগারেট ধরাল। চোখ বন্ধ, ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটার পর শচীর গলা দিয়ে বিস্ময়ের একটা অব্যক্ত ধ্বনি বেরোল। নির্লিপ্ত গলায় অতনু প্রশ্ন করল, 'কী হল?'

'এ যে ভুতুড়ে কাণ্ড মাইরি!' শচীর গলায় উত্তেজনা, 'ভুল দেখছি না তো?'

'ভুতুড়ে না অদ্ভুতুড়ে? কী দেখছিস, সেটা বল্।'

'একটু এপাশ-ওপাশ, উঁচু-নিচু করতেই কোনও কোনও জায়গা যেন সিকি ইঞ্চি লাফিয়ে উঠছে।'

চোখ খুলে শচীর দিকে তাকাল অতনু। বলল, 'চোখের বিভ্রান্তি তো বটেই। একে বলে থার্ড ডাইমেনশন। মনে হবে ফ্ল্যাট ছবি নয়, যেন মূর্তি, পাশ থেকে তলা অব্দি অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। ইউরেকা কেন বলেছিলাম বুঝতে পারছিস তো? আয়, চা-ফা জুড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু।'

দুদিন প্রায় একনাগাড়ে লেগে থেকেও খুব কিছু সুরাহা করতে পারল না অতনু। বংশলতিকার পাশাপাশি যে একটা সাংকেতিক মানচিত্রও এর মধ্যে লুকনো রয়েছে সেটা অনুমান করতে অবশ্য দেরি হয়নি তাব। এই রাজপরিবার, সিংহবাবুদের আদিপুরুষ এই রাজ্যে এসেছিলেন বিকানীব থেকে। তিনি বাঙালি ছিলেন না, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন বঙ্গনারী। এই প্রদেশের সীমান্ত অঞ্চলে তিনি বসতি স্থাপন করেন। বৈবাহিক সূত্রে সিংহবাবুরা ক্রমশ বাঙালিদের সঙ্গে ওতপ্রোত মিশে যান। পরে আর সিংহবাবুদের কোনও উল্লেখ নেই, তাব বদলে অন্য পদবী এসে গেছে। তাব মানে মূর্তির হাতবদল ঘটেছে। তবে এই হস্তান্তর বৈধ না অবৈধভাবে হযেছে, তা জানবার কোনও উপায় নেই। ছলে-বলে-কৌশলে গুপ্তঘাতী দুর্ঘটনার ভেতর দিযে যদি ব্যাপারটা না ঘটে থাকে, তাহলে একটি মাত্র সম্ভাবনাই বাকি থাকে, অতনু যাকে বৈধ আখ্যা দিতে পারে। সিংহবাবু-পরিবারেব বংশ লুপ্ত হলে, পুত্রসন্তানের অভাবে মূর্তিটা হযতো কন্যাপক্ষে বর্তায। একটা আশ্চর্যেব ব্যাপার এই, বংশলতিকায কোথাও কোনও কন্যাসন্তানের উল্লেখমাত্র নেই, পদবী বদলের পরেও। এই উদ্ভট শ্লোকের পদ্য খুঁটিযে লক্ষ্য করলে একটা জিনিস বোঝা যায়, বংশের কুলদেবতা হলেও নটরাজ সবসময়ই জ্যেষ্ঠ পুত্রের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে। কিন্তু অতকাল আগের নামগুলোকে আজ আর শনাক্ত করার উপায় নেই, সময়েব হিসেব কষাও শক্ত। গুণবাচক বিশেষণ আর তৎকালীন কিছু ঘটনার তলায সব চাপা পড়ে আছে। অতনু বুঝতে পারছিল এভাবে হবে না। সে তাই নতুন উদ্যমে আবার কাজ শুরু করেছিল। তার ছাপা লেখার ফাইল আর ছেঁড়াখোড়া 'রত্নগুপ্তি বিচিত্রম' পুঁথিটা নিয়ে বসেছিল। সেই সঙ্গে পুরনো ডায়েরি, যার মধ্যে নানান সূত্রে পাওয়া টুকরো-টাকরা তথ্য এলোমেলোভাবে নোট করা আছে।

পাশাপাশি রেখে দেখতে গিয়ে অতনুব কেমন মনে হল রত্নগুপ্তি বিচিত্রম আর এই ছালটের ওপর লেখাটা সম্ভবত একই লোকের। কিন্তু সে কি করে সম্ভব? পুঁথির হরফে মিল অবশ্য থাকতেই পারে, কারণ পুঁথির অক্ষর-লিখনশৈলী বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একই ধাঁচের হয়ে থাকে কিন্তু সংস্কৃতের এই বাঙালিয়ানা, এই নাটুকে, হালকা স্টাইল—এ কি করে মিলে যাচ্ছে! একই লিপিকরের, একই রচযিতার যদি না হয় তবে ধরে নিতেই হবে ওই পুঁথির প্রভাবে, পুঁথির অনুকরণেই পরবর্তীকালে এটি লেখা হয়েছিল।

সুবলদা ঘরে ঢুকল আচমকা। উত্তেজনায় একটু যেন হাঁপাচ্ছিল, কথা বলতে সেটা টের পাওয়া গেল। বলল, 'এই যে তুমি এই ঘরেই আছ—'

অতনু মুখ তুলে তাকাল, 'কেন, কি হয়েছে? তুমি কি রোজ একটা করে নাটক করবে সুবলদাদা?'

'নাটক না, ভয়ানক কাণ্ড। থানা থেকে এই মাত্তর একজন লোক, সাদা পোশাকের পুলিশই মনে হল—'

'পুলিশ! থানা থেকে পুলিশ?' ঘটনার আকস্মিকতায় অতনু ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেল, মুখ ফ্যাকাশে, মুখ দিয়ে এর বেশি আর কথা সরল না। পুলিশ একদিন না একদিন আসতে পারে, হয়তো আসবেও কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সে ভাবেনি।

অতনুর চুপসে-যাওয়া সুবলদা অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিল। অতনু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় সে? ঘরে এনে বসিয়েছ নাকি?'

'মাথা খারাপ! সে আমি বিদায় করে দিয়েছি।'

অতনু হাঁ। এত সহজে সঙ্কট কেটে যাবে যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। সুবলদার মুখ থেকে একে একে সব শুনল। বাজার নিয়ে ফিরে এসে সুবলদা সবে সদরের তালা খুলতে যাচ্ছে এমন সময় লোকটা এল। পরিচয় দিতেই সুবলদা তার কর্তব্য স্থির করে নিয়েছিল। দুদিন ধরে ছেলেটা তার নিজের কাজে ডুবে আছে, এখন পুলিশ মানেই ঝামেলা, অনেকটা সময় শুধুমুদু নষ্ট হবে। সে বলে দিল এখন বাড়িতে কেউ নেই। তালা খুলতে দেখে সেরকমই আন্দাজ করেছিল লোকটা। তাই কয়েকটা মামুলি প্রশ্ন করেই চলে গেল লোকটা। কিন্তু যতক্ষণ না চলে যাচ্ছিল, সুবলদা খুবই উদ্বেগের মধ্যে ছিল। বলা যায় না, অতনু যদি বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে আসে তা হলেই চিত্তির! উত্তেজনায় সুবলদা তখন কেন হাঁপাচ্ছিল বোঝা গেল এতক্ষণে।

সুবলদা আর দাঁড়াল না, রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। কিন্তু অতনুর কপালে ভুরুর ভাঁজ একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকল। তাল কেটে গেছে, নতুন করে আর কাজ শুরু করার উৎসাহ ছিল না। পুলিশের আগমন-রহস্য তার ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। পুলিশের করা প্রশ্নগুলো সে উল্টেপাল্টে খতিয়ে দেখছিল যদি তা থেকে উদ্দেশ্যটা একটুও অনুমান করা যায়। কিন্তু প্রশ্নগুলো এতই সামান্য, সাধারণ যে তা থেকে কিছু আন্দাজ করা যায় না। গোলমাল রয়ে গেছে অন্য জায়গায়। লোকটা কোন থানা থেকে আসছে এই মোক্ষম কথাটাই সুবলদা বোধহয় জিজ্ঞেস করতে সাহস পায়নি। লোকটাও বলে যায়নি সে আবার আসবে কিনা।

এই সাত-পাঁচ ভাবনার মধ্যে ফোন বেজে যাচ্ছিল পাশের ঘরে। খেয়াল হতেই কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। সুপর্ণা যে নয় সেটা নিশ্চিত। পরদিনই

সে ফিরে গেছে নিজের জায়গায়। একবার মনে হয়েছিল শচী হতেও পারে। উঠতে গিয়েও আবার বসে পড়ল অতনু। কে বলতে পারে পুলিশ নয়? সন্দেহবশত বাজিয়ে দেখছে না? ফোন থেমে গিয়েছিল। সুবলদা এসে জানাল কে এক লালু তার সঙ্গে কথা বলতে চায়, বিশেষ দরকার। ঝোঁকের মাথায় কিছু বলতে গিয়েছিল অতনু, একটা কথা ভেবে সামলে নিল। কোনও কারণে নিশ্চয় নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চায় শচী, নইলে সুবলদাকে অন্তত ওই নাম বলত না।

'তনু বলছি। কী ব্যাপার?'

শচীর গলায় উত্তেজনা, 'গিয়েছিলাম ওখানে।' অতি সংক্ষেপে, আভাসে-ইঙ্গিতে, সতর্কতার সঙ্গে কথা বলছিল, 'বাড়িটা পৈতৃক নয়, ব্যাচেলার জ্যাঠা ওকে লিখে-পড়ে দিয়ে গেছেন। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে নামটা নোট করে নিয়ে এসেছি। নৈবেদ্য ছাড়া এখন আব কাজ হয় না, বুঝলে? তা ও-বাড়ির অবস্থা শোনো। এক দূরসম্পর্কের ভাইপোব উদয় হয়েছে। কেয়ারটেকার হিসেবে সে-ই এখন দেখাশোনা করছে। তবে ধোপে টিকবে না বোধহয়। নিজের দুই দিদি আছেন আমেরিকায়। ওর অবর্তমানে ন্যায্যত তাঁরাই...উইলে নাকি সেই রকমই বয়ান আছে—' একেবারে বলার স্টাইলটাই বদলে গেছে শচীর।

'কিন্তু তাঁদের ঠিকানা?'

'পাওযা গেছে। কিন্তু মুশকিল হযেছে তাঁদের সঙ্গে কনট্যাক্ট করা যায়নি। বাড়ি বন্ধ। বোধহয় কোথাও বেড়াতে গেছেন।'

'কিন্তু ফিরবে তো একদিন। ভাইপোটা তাহলে কিসের আশায়—'

'আর বোলো না। ছোঁড়াটার ধারণা এই ধ্যাদ্ধেড়ে গাঁইয়া জায়গায় বাড়ি নিয়ে ওঁরা মাথাই ঘামাবেন না।'

'বাব্বা, এত খবর তুই?' অতনুও শচীর মাপে কথা বলছিল।

'আমি কি আর? তেনারা!'

'কাদের কথা বলছিস?'

'তেনারা বুঝতে পারো না? ব্যাঙ্কের বইফই, দরকারী কাগজপত্র সব নিয়ে তেনারা আলমারি সিল.করে রেখে গেছেন।'

'যাক, অনেক খবরই যোগাড় করেছিস তাহলে?'

'এখনই কি, আরও আছে।' শচীর গলা উত্তেজনায় ফুটছিল, 'ঢুকেছিলাম ওই বাড়িতে।'

'অ্যাঁ!' অতনু হতবাক, স্তম্ভিত।

'ওই ঘরটার মধ্যেও। সত্যি বলব, গা-টা কেমন ছমছম করছিল। দেওয়ালে এখনও বুঝলে, কালো কালো দাগ, শুকিয়ে আছে!'

'গেলি তুই!' শচীর নির্বুদ্ধিতায় অতনু আতঙ্কিত হল। গলায় রীতিমত ঝাঁজ ফুটিয়ে বলল, 'কী বলে গেলি ওখানে!'

উত্তেজনায় শচী ঠাওর করল না। নিছক প্রশ্ন ভেবে সহজ গলায় উত্তর দিল, 'কেন, খুব সহজে। ছোঁড়াটার সঙ্গে দেখা করে বললাম একতলার বাকি ছাদটা আমি কিনতে চাই। শুনে অরাজী হল না, মাস তিনেক পরে দেখা করতে বলল। নাম-ঠিকানা রেখে দিল।'

'ছি ছি, এটা তুই কি করলি?'

'ফল্‌স দিয়েছি, বুঝলে না?'

'ওরে ইডিয়েট! আমাব সঙ্গে তোকে যদি কেউ দেখে থাকে, কি কখনও দেখে—'

হাঃ হাঃ হেসে শচী বলল, 'পাচ্ছে কোথায? আমার জঙ্গল সাফ, এখন দেখলে তুমিই চিনতে পাববে না।'

এক মুহূর্ত থমকে থেকে অতনু ব্যাপারগুলো ভাবল। না, শচী মোটেই ইডিযট না। অনেক তলিযে ভেবে বেশ সাবধানেই সে পা ফেলে এগিযেছে। তার এত সাধের দাড়ি-গোঁফ পর্যন্ত কামিযে নির্মূল করেছে। এতটা তাব নিজেরই কখনও মাথায় আসত না। একটা নিঃশ্বাস ফেলে অতনু বলল, 'কিন্তু একটু আগে বাড়িতে পুলিশ এসেছিল।' লাইনটা কেটে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

পুলিশ আর শচী দুযে মিলে অতনুর নিশ্চিন্ত মনোযোগ একেবারে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে। পুলিশের হঠাৎ আসা আর চলে যাওযা দুটোই কেমন সন্দেহজনক ঠেকছিল। লোকটা যে আবার এসে উদয হবে না, তার কোনও গ্যারান্টি নেই। দুশ্চিন্তা হচ্ছিল শচীব জন্যেও। বিশেষ করে লাইনটা ওভাবে কেটে যাওয়ার জন্যে। শচী যেখান থেকেই ফোন করুক, ও যে খুব সন্ত্রস্ত ছিল, যতদূব সম্ভব চাপা গলায় আর ইঙ্গিতে কথা বলছিল তা বুঝতে কোনও অসুবিধে হয়নি। তাহলে কি ও কোনও বিপদে পড়ল? অতনু ওর সাহায্যে কিছু খবব যোগাড় করতে চেযেছিল ঠিকই কিন্তু সত্যিকারের কোনও বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চায়নি বন্ধুকে। শুধু বন্ধুকে কেন, কাউকেই সে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়াতে চায়নি কখনও, এখনও চায় না। কিন্তু শচী যে একেবারে অকুস্থলের ঘাঁটিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে, দুঃসাহসে ভর করে ষড়যন্ত্রের গুহার মধ্যেই মাথা গলিয়ে বসবে এ তার কল্পনায়ও আসেনি।

শচীর প্রতিটা পদক্ষেপ নানা দিক থেকে ভেবে দেখার চেষ্টা করল খানিকটা। কোথাও ও কোনও ব্লান্ডার করে বসল কিনা কিছুই চট করে মাথায় এল না। অসাড়ে বসে না থেকে হাতের কাগজপত্র, ফাইল, নোটবই, পুঁথি সব গুছিয়ে তুলে রাখল। মনে হল এ অবস্থায় আর এভাবে এগোনো যাবে না।

মূর্তিরহস্য পুরোপুরি খুলতে হলে অন্যভাবে অন্যদিক থেকে এগোতে হবে। সেই অন্য দিকগুলোর একটা বহ্নিদেবী, শচীর দেবীদির্দি, যিনি কর্পূরের মত উবে গেছেন কলকাতার জগৎ থেকে। তাঁর সম্পর্কিত কিছু সূত্র হয়তো যাঁর কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারত তিনিও এখন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। কবে ফিরবেন নিশ্চিত করে জানা যাচ্ছে না। কিন্তু এই সময়টা চুপচাপ হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে সে পাগল হয়ে যাবে। আইডল ব্রেন সব সময় তো শয়তানের কারখানা নয়, শাস্তির কারখানাও হযে ওঠে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা ভয় স্থির পুকুরের পানার মত ঘন হয়ে মাথার ভেতরটা ছেযে ফেলতে থাকে। সুতরাং কাজ চাই, নিজেকে ব্যস্ত রাখতে, ভুলিয়ে রাখতে যে কোনও রকমের কাজ চাই। অতনু হাতের কাছেই কাজ পেয়ে গেল। বিজ্ঞাপনের জবাবে আসা পুরনো চিঠির গোছা নিয়ে বসল। টেবিলের ড্রয়ারে অনেক দিন এগুলো রবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা অবস্থায় অবহেলায় পড়ে ছিল। এখন অবশ্য তার কাছে এই চিঠিপত্রের প্রযোজন একরকম শূন্যের কোঠায। নতুন করে গবেষণার পথ বন্ধ, শত্রুদের হুমকি তাদের কাজের ভেতর দিয়েই অতনুকে সমঝে দিয়েছে। এই একতরফা চিঠিগুলোর কোনওটারই বোধহয় জবাব লেখা হয়নি, এক ছত্র শুকনো ধন্যবাদ, তাও না।

অনেকটা বেশি সময় এনগেজড থাকার জন্যে প্রতিটা চিঠিই সে খুব ধীরে-সুস্থে খুঁটিযে দেখবে স্থির করল। কোনও-কোনওটা তো একেবারেই রদ্দি, ধানাই-পানাই, ছিটেফোঁটা ইনফরমেশনও নেই। না থাক, দ্রষ্টব্যের অভাব নেই। কাগের ঠ্যাং বগের ঠ্যাং হাতের অক্ষর আছে, আজগুবি বানান আছে, যাকে ভুল বললে কমিয়ে বলা হয়। তারিখ আছে, ঠিকানা আছে, ডাকঘরের সিলমোহর আছে। দেখতে চাইলে দেখার বস্তুর কিছু কমতি নেই। খান তিনেক চিঠি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতেই বোধহয় আধঘণ্টার বেশি সময় চলে গিয়েছিল। আবার ফোন। অতনু এবার আর থমকে গেল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফোন তুলল।

'লালু বলছি।'

'হ্যাঁ, কী ব্যাপার? তখন লাইনটা—'

'কেটে না দিয়ে উপায় ছিল না। এখন অন্য জায়গা থেকে আবার ট্রাই করলাম। শোনো, আমার মনে হয় ওটা ঝিল রোডের ব্যাপারে না, এত তাড়াতাড়ি তোমাকে ট্রেস করা অসম্ভব। আর আমি তো ধরাছোঁয়ার মধ্যেই আসিনি এখনও যে আমার জন্যে তুমি জড়িয়ে যাবে!'

'তাহলে? লোকটা কি আমাদের বাড়ির দরজা ইস্তক মর্নিং ওয়াক করতে এসেছিল?'

'এই দ্যাখো, তা কেন? অন্য কোনও ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসেছিল নিশ্চয়। দ্যাখগে হয়তো তোমার লোকাল থানা থেকেই পুলিশ এসেছিল।'

অতনু চটে গেল, 'বোকার মত কথা বলিস না। অন্য কোনও ব্যাপার আবার কী? আমি কি ব্যাঙ্ক ডাকাতির নায়ক না অন্য কিছু যে হুলিয়া নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? যত্ত সব—'

'তোমাকে বোকা বানানোর ফল্‌স কেসও হতে পারে। যে এসেছিল সে আদৌ পুলিশ নয়, এইটাই আমার মন বলছিল। গোড়া থেকেই।'

'পুলিশ নয় তো অবতার পুরুষটি কে? এ ব্যাপারে তোর মন গোড়া থেকে কি বলছে? পাবলিক স্টেজে কাটা সৈনিকের পার্ট করতে এসেছিল?'

'তুমি গুরু আজ সকাল থেকেই ধানি হয়ে আছ। এত ঝাল, কি ব্যাপার?'

অতনু হেসে ফেলে, 'স্যরি, লালু। মাথাটা গরম হয়েছিল, তাই তোকে ফর নাথিং কথা শুনিয়েছি, কিছু মনে করিস না ভাই।'

'ঠিকই ধরেছি। মাথা ঠাণ্ডা থাকলে বুঝতে ইদানীং তোমার শুভাকাঙ্ক্ষীর অভাব নেই। তারা তোমাকে একটু পুলিশের ভয় দেখিয়ে রাখল।'

'ব্ল্যাকমেইল?'

'এক হিসেবে তাই। তুমি যে স্রেফ লেখার জন্যেই মূর্তিফুর্তির ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলে, নানা জায়গা থেকে খোঁজখবর করছিলে এটা ওরা বিশ্বাসই করতে পারেনি। আমি কেবল ভাবছি ওটার কথা, ওরা কি করে জানল? দেবীদিদি কোত্থেকে পেয়েছিলেন আমি জানি না, তবে ভাবসাব দেখে মনে হয়েছিল অনেকদিন থেকেই জিনিসটা ওঁর হেফাজতে রয়েছে। ওটা ওঁরই প্রপার্টি। চোরাই মাল দিয়ে কেউ অন্তত গুরুদক্ষিণা দেয় না। ওটা তো উনি আমাকে দেননি, শঙ্কু গোঁসাইয়ের ছেলেকেই দিয়েছিলেন।'

'হুঁ।' অতনু এই কথাটাই ভাবছিল, বলল, 'আমরা যা ভাবছি, হয়তো দেখা যাবে মোটেই তা নয়। আমার ঘর তছনছ করে ওরা অন্য কিছু খুঁজেছিল এমনও হতে পারে। নটবাজকে ওরা হয়তো চোখেও দেখেনি, ওটার বাজারদর সম্পর্কেও কোনও ধারণা নেই।'

'কথাটা মন্দ বলোনি, ভাবতে হচ্ছে। আচ্ছা গুরু, পরে আবার হবে।' বেশ লাইট মুডে কথাগুলো বলেই আসছে বছর আবার হবে কায়দায় ফোনটা রেখে দিল শচী।

ঠোঙার কাগজটার দিকে তাকিয়ে বহুকাল আগের একটা মজার ঘটনাই প্রথমে মনে পড়ে গিয়েছিল অতনুর। কীর্তিটা শচীর বলেই, এবং এইমাত্র শচী বেশ হালকা মেজাজ ছড়িয়ে ফোনটা রেখে দিল বলেই বোধহয় হঠাৎ কবেকার কথাটা স্মরণে এসে গেল। ক্লাস এইটেই হবে নিশ্চয়, হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় 'সংবাদপত্রের উপকারিতা' বিষয়ে রচনা লিখতে গিয়ে শচীদুলাল একটা মোক্ষম পয়েন্ট তুলে সমস্ত ক্লাসের হাসির খোরাক যুগিয়েছিল। আমাদের জীবনে খবরের কাগজ

যে অপরিহার্য তার অন্যতম প্রমাণ খবরের কাগজ থেকে ঠোঙা হয়। মানব সভ্যতার অন্যতম অবদান ঠোঙা কেবল আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বহন করেই আনে না, ঠোঙা আমাদের সাধারণ জ্ঞান আর পাঠাভ্যাস বাড়ায়। অনেক পুরনো টুকরো খবর ঘরে ঘরে বয়ে এনে স্মৃতিশক্তিকে উসকে দেয়। ঠোঙা তৈরির এবং ভাঁজ করে রাখার এক বিশেষ কৌশল আছে। ইহা নানা আকৃতির এবং প্রকৃতির হয়।

কথাগুলো মনে পড়তে, সুবলদার রেখে যাওয়া মুড়ির ঠোঙাটার দিকে কৌতুকের চোখে তাকাতে গিযেই খবরটা চোখে পড়ল। এবং সে চমকে উঠল। 'বহ্নিবালার পুনরভিনয়' হেডিংটা তাকে পলকে আকর্ষণ করল। অভিনেত্রী বহ্নিদেবীর খবর যে এত সহজে হাতের গোড়ায় এসে যাবে তা কে ভেবেছিল! ঠোঙাটা টেনে নিযে খবরে চোখ বুলতে গিয়ে কিন্তু ততটাই নিরাশ হল। বহ্নিবালা কোনও অভিনেত্রীর নাম নয়, একদা জনপ্রিয় একটি নাটকের নাম, স্টার থিয়েটারে সেটি নতুন উদ্যমে অভিনীত হবার খবর ছাপা হযেছে 'রূপমঞ্চ' নামের এক বিখ্যাত পত্রিকার পৃষ্ঠায়। আর ঠিক তখনই 'রূপমঞ্চ' পত্রিকার পুরনো ফাইল ঘেঁটে দেখার কথা মনে হল। কিন্তু কাগজটা তো বন্ধ হয়ে গেছে কবেই, কালীশবাবুও হয়তো নেই। হাতের কাছে চৈতন্য লাইব্রেরি অবশ্য আছে, চেষ্টা করে দেখলে হয়। সে সময়কার কোনও খবর যদি—।

'আমি কিন্তুক এই ভয়ই করছিলাম।' বৈকালী চায়ের কাপ হাতে করে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সুবল ব্যাজার মুখে বলল, 'খাইদাই পক্ষীটি, বনের দিকে চক্ষুটি—এরই ভিতর তয়ের হযে গেছ? তা বুড়োর হাতের চা নিদেনপক্ষে গিলে যাও।'

অতনু কোনও জবাব না দিয়ে ছেলেমানুষের মত মুখ করে শুধু একটু হাসল। আগুন-গরম চা ডিশে ঢেলে কয়েক চুমুকে সাবাড় করে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

দীর্ঘ পণ্ডশ্রমের ঝুঁকি আছে জেনেও বেশ কয়েক বছরের বাঁধানো খণ্ড নিয়ে বসেছিল অতনু। কিন্তু কপাল ভাল, বছর দুইয়ের পাতা ওল্টাতেই ওর দৃষ্টি আটকে গেল একটি খবরে। 'মঞ্চে নতুন মুখ' এই শিরোনামটির দিকে সম্মোহিতের মত তাকিয়েছিল সে। ভেতরে কেমন একটা শিহরন, এ বহ্নিদেবীর প্রসঙ্গ না হয়েই যায় না। পড়তে গিয়ে কিন্তু রীতিমত হতাশই হল। স্টেজে নবাগত কয়েকজন অভিনেতাকে নিয়ে এই আলোচনাটি ফাঁদা হয়েছে। এঁদের মধ্যে একজন আবার সেই যাত্রার রমরমার যুগের রেওয়াজ অনুযায়ী স্ত্রী ভূমিকায় নামতেন, ভুবনবিহারী সেন, নামটাকে ছেঁটে-কেটে বিজ্ঞাপনে ভুবনরানী হয়ে গিয়েছিলেন। ভুবনবিহারী গা ঢাকা দিলে, মানে গায়ে মেয়েলি পোশাক আর মেক-আপ উঠলে, তাঁর ঢং-ঢাং আর চেহারা দেখে মেয়ে নয় বলে ধরা শক্ত ছিল। তার উপর গলার

স্বর শুনলে চমক খেয়ে মনে হত ঈশ্বর বোধহয় ওকে মেয়ে করে গড়বেন বলে আগে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরও কখনও কখনও কথার খেলাপ করেন।

নিজের আশা পূরণ না হলেও লেখাটার মধ্যে বেশ টান ছিল, বিশ্লেষণ আর যুক্তি এমন অকাট্য আর আকর্ষক যে অতনু ছাড়তে পারছিল না, বিশেষ করে এই সমালোচকের নামটি দেখার লোভে শেষ পাতা অবধি না এসে, এবং ভাগ্যিস শেষ পাতায় সে এসেছিল, নইলে শেষ চমক থেকে সে বঞ্চিতই হত। লেখক দেবনারায়ণ দাস সেকালের এক ডাকসাইটে স্টেজ ক্রিটিক। নাট্যতত্ত্ব ও রঙ্গালয়ের ইতিহাস বিষয়ে তাঁর দুখানা মূল্যবান বইয়ের বিজ্ঞাপন একদা প্রায়ই দেখা যেত। যাই হোক, এই লেখাটির পরিশিষ্টে তিনি বহ্নিময়ী অগ্নিহোত্রী নাম্নী এক নবাগতার বিরূপ সমালোচনা করেছেন। হাল্কা চালে গূঢ় কথাটুকু বলে দেওয়াই দেবনারায়ণবাবুর স্টাইল। বলেছেন, মেয়েটির বয়স অল্প। নামের সামনে পেছনে, যাকে বলে আদ্যন্তে আগুন, তবু পুরো ব্যাপারটাই ধোঁয়া ছাড়া কিছু নয়। বাঙালি মেয়ের ওই অবাঙালি পদবীর মতই। ভেতরে প্রবল ইচ্ছাশক্তি রয়েছে, কায়মনোবাক্যে অভিনয় করার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষা—একে যদি আগুন বলা যায় তো আগুন। চেহারায় আঁচ আছে। কণ্ঠ উত্তম কিন্তু ব্যবহারের ক্ষমতা নেই। আসলে থিয়েটারের জ্ঞানগম্যি না থাকলে যা হয়। যাত্রায় আর মঞ্চে অনেক ফারাক, শেঁকো গোঁসাই আর শিশির ভাদুড়ীতে যেমন।

শচীর বাবার নামের চতুর উল্লেখে অতনু সচেতন হল। এই অগ্নিহোত্রী মেয়েটিই কি তা হলে বহ্নিদেবী? শচীর দেবীদির্দি? সময়ের হিসেবে সেই রকমই সন্দেহ হয়, কিন্তু তা কি করে সম্ভব! ওই অবাঙালি প্যাটার্নের বহ্নিদেবী নামটা মনে হয় পরবর্তীকালের পিক-আপ, হিন্দি চলচ্চিত্রের আমদানি। সে যে কলকাতায় হতাশ হয়ে বোম্বাই যাবার পর, নামটার বম্বেটে ছাপ দেখেই খানিকটা আন্দাজ হয়। তাছাড়া অগ্নিহোত্রীর প্লাস পয়েন্ট হিসেবে দেবনারায়ণবাবু কণ্ঠস্বরের উল্লেখ করলেও নাচ-গানের কথা বলেননি অথচ দুটো ব্যাপারেই দেবীদির্দি হিন্দি নায়িকাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছেন একদিন। নামের সাদৃশ্য থাকলেও তবে কি দুজন আলাদা ব্যক্তি? কলকাতায় দেবীদির্দির আসল নাম তাহলে অন্য কিছু ছিল, পরে যা বরাবরের মতই মুছে যায়? এসব প্রশ্নের জবাব চৈতন্য লাইব্রেরির রেকর্ডে, খাতায় নেই। রূপমঞ্চ পত্রিকাও কবেই বন্ধ হয়ে গেছে।

লাইব্রেরিয়ান অতনুর মুখের দিকে একটুক্ষণ ঘুম-ঘুম চোখে তাকিয়ে থেকে হঠাৎই যেন পুরোপুরি জেগে উঠলেন, 'নামটা কি বললেন—দেবনারায়ণ দাস? দাঁড়ান, দাঁড়ান, এ ব্যাপারে আমি বোধহয় আপনাকে একটু হেল্প করতে পারব। অথরদের নাম-ঠিকানা আমরা সাধ্যমত টুকে রাখি। তাঁরা আমাদের পেট্রন তো

বটেই। নেপেনবাবু একসময় আমাদের লাইব্রেরিতে খুব আসতেন, ঝোলা ভর্তি করে দরকারী বইপত্তর নিয়ে যেতেন। নেপেনবাবু বুঝলেন তো? নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। শুধু নেপেনবাবুই না, আরও অনেকে এসেছেন, দেবুবাবুও...'

কথা শেষ না করেই ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে ভেতরের দিকে কোথায় চলে গেলেন। একটা বাঁধানো একসারসাইজ খাতা হাতে করে ফিরে এলেন একটু পরেই। পাতা ওলটাতে ওলটাতে বললেন, 'এই দেবুবাবু লোকটা একসময় আমাদের খানকয়েক বই প্রেজেন্ট করেছিলেন। তার আগে ঠিক বুঝতেই পারিনি উনি একজন লেখক। আসতেন যেতেন এই পর্যন্ত...এই যে পেয়ে গেছি।'

পাতিপুকুরের একটা ঠিকানা লিখে দিয়ে লাইব্রেরিয়ান বললেন, 'অনেককাল আর ওঁর খবর জানি না। দেখা হলে আমাদের কথা বলবেন কিন্তু।'

ঘাড় নেড়ে অতনু তক্ষুণি বেরিয়ে পড়ল। পাতিপুকুরের ঠিকানা অবশ্য কোনও কাজেই লাগল না। সাবানের কারখানা তলায় নিয়ে সেই দোতলা বাড়িটায় এখন সব অন্য মানুষ। তারা কেউ দেবনারায়ণবাবুর খবর রাখে না। হতাশ হয়ে ফিরেই আসছিল, একজন বুদ্ধি খাটিয়ে পাতিপুকুর নাগরিক সমিতির নাম বলল। ওরা যদি কোনও হদিস দিতে পারে!

কেমন জেদ চেপে গিয়েছিল অতনুর। তাছাড়া আর দেরি করতে ভরসাও পাচ্ছিল না। এমনিতেই অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। বাড়ির নম্বর পাওয়া মাত্র লেক টাউনে ছুটল।

দরজা খুলে দিল অল্পবয়সী একটি বউ।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অতনু বলল, 'দেবনারায়ণ দাসমশাইকে একটু খবর দেবেন? বিশেষ দরকার।'

বউটি সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল, 'আপনি কোথায় থাকেন? কোত্থেকে আসছেন?'

'আমি নর্থ ক্যালকাটার চৈতন্য লাইব্রেরি থেকে আসছি।'

'আশ্চর্য! আপনারা ওঁর খবর জানেন না? ক বছর আগে তো পেপারে উঠেছিল।'

অতনু বুঝল এবার সত্যিই সে ব্লাইন্ড লেনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এবার শীতটা বোধহয় জাঁকিয়েই পড়বে। আগাম নোটিসেই রাস্তায় লোকজন কমে আসছে সন্ধের পর। পুলওভার গায়ে দিয়েও অতনু হিমেল হাওয়ার ছোঁয়া টের পাচ্ছিল ভেতরে। এর সবটাই যে আবহাওয়াঘটিত তেমন নাও হতে পারে। ট্রাউজার্সের পকেটে হাত ডুবিয়ে অতনু চিঠিটা বের করে শেষবারের মত চোখ বুলিয়ে নিল। তার চিঠির বান্ডিলের সংক্ষিপ্ততম চিঠি। না-খোলা অবস্থাতেই পড়ে ছিল এতদিন। আজ খুলেই চমকে গেছে। কথায় কম কিন্তু ওজনে ভারী। উড়িয়ে দেবার মত নয়। ইনল্যান্ড লেটার, ভেতরে তারিখ নেই, ওপরে দু-তরফা

ডাকঘরের জেবড়ানো ছাপ আছে কিন্তু পড়া যায় না। পোস্ট অফিসের নাম, মায় ডেট পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঝাপসা। সামান্য কাঁপা হলেও অক্ষরগুলো গোটা গোটা, পরিষ্কার। যে-কোনও সন্ধ্যায় এলে বলতে পারি। অবনী কর্মকার। রাস্তার নাম আর নম্বর আছে নামের তলায়। ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে এসেছিল, চারপাশে সতর্ক নজর রেখে। এখন শেষবার পড়তে বুকের ভেতর একটা সন্দেহ দুলে উঠল। ফাঁদ নয় তো? তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার নতুন কৌশল। আরও একবার বোকার মত পা বাড়াতে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে? কিন্তু ভেতরের একবগ্গা ভাবটা ওকে ফিরতে দিল না। এসে পড়েছে যখন শেষ দেখবেই।

নম্বর মেলাতে গিয়ে বোকা বনে গেল। বাড়িটার এই দশা দেখবে ভাবেনি। রাস্তার ওপর খুঁটো পুঁতে দড়ি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। বাড়ি ভাঙার কাজ বেশ খানিকটা এগিয়েছে। সামনের অংশটা লোপাট, দরজা-জানলাহীন পিছনের দিকটা ধ্বংসস্তূপের মত দেখাচ্ছে। ছাদ উড়ে গেছে, আধলা চেহারার দেড়তলার ঘরে কড়িবরগাসুদ্ধ রাবিশের ধস নেমেছে। কনট্রাকটারের লোকজন এখন ধারেকাছে নেই, দিনমানে কাজ সেরে চলে গেছে। লাল কাচের একটা কুপি লণ্ঠন সামনে বসানো।

রাস্তার এই অংশটার দুপাশেই দোকানপাট হরেক রকমের। পান সিগারেট সোডার গুমটি থেকে শুরু করে, কুটিরশিল্প না কুটির কারখানা ইস্তক। লেদ মেশিন, স্যাকরার দোকান, বটতলার বই, ব্যাপারির গোডাউন, হ্যানাত্যানার মধ্যে সদর ভেজানো এক বসতবাড়ির দরজায় টিনের ওপর লাল অক্ষরে লেখা: গৃহস্থ বাড়ি। পানের দোকানদার তার বসন্ত খোদাই মুখে ভয়ঙ্কর ট্যারাচক্ষু মেলে তাকিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত মাথা নাড়ল। কালি ঝুলি-মাখা লেদ কারখানার এক ছোকরা চায়ের কেটলি আর একগোছা মাটির ভাঁড় নিয়ে ফিরছিল, নামটা শুনে ভেতরে জিজ্ঞেস করতে গেল। মালিক বেরিয়ে এলেন একটু পরেই। বললেন, 'ও-বাড়ি তো ভাঙা হচ্ছে, কেউ থাকে না।'

'জানি। লোকজন সব কোথায় উঠে গেছে যদি বলতে পারতেন—'

'কী জানি, কেউ তো আর ঠিকানা রেখে যায়নি।'

'অবনী কর্মকারকে চিনতেন?'

'অবনী? না মশাই। কি করে, কত বয়স, কেমন দেখতে বলতে পারেন?'

এবার অতনুর মাথা দোলাবার পালা।

'তাহলে এ তো মশাই খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজা। নো হোপ।'

'কে অবনীবাবু মশাই?' পাশ থেকে একটা নতুন গলা। অতনু তাকিয়ে দেখল লুঙ্গির ওপর হাতাগুটোনো সোয়েটার পরা এক ছোকরা দুহাতের দশ আঙুলে গুটি আষ্টেক মুখখোলা মুড়ির ঠোঙা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বোধহয়

কোনও স্যাকরার দোকানের টিফিন যাচ্ছে একটু লেটে, চানাচুর, বেগুনি আর কাঁচা লঙ্কার বোঁটা উঁকি দিচ্ছে প্রত্যেকটি থেকে।

'চেনো নাকি?' অতনু যেন একটু আলো দেখতে পেল।

ছেলেটি শুধোল, 'ব্লক-মেকার তো? বয়স্ক মানুষ?'

চিঠির কাঁপা কাঁপা অক্ষরের কথা খেয়াল হল অতনুর।

'হ্যাঁ, তাই হবে। কোথায় পাব ওঁকে?'

ছেলেটি বলল, 'কোম্পানিবাগান চেনেন? ওই যে একটু আগে, বিডন ইসকোয়ার যাকে বলে। তার উল্টোদিকে নতুন বাজারের ওপরে বসেন। দোতলা না তিনতলায়, কাঠের অক্ষর তৈরির দোকানে খোঁজ করবেন। চলে যান, পেয়ে যাবেন।'

ধন্যবাদ জানিয়ে অতনু নতুন বাজারের দিকে হাঁটা দিল। এ অঞ্চল তার অচেনা নয়। নতুন বাজারের গেটের দু-পাশেই ব্যারাক বাড়ির মত দুখানা বিশাল বাড়ি টানা চলে গেছে। একতলায় কাঁসার বাসন ইত্যাদির দোকান। ওপরে তাকাতেই কাঠের অক্ষরের সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। অতনু দ্রুত পায়ে সিঁড়ি ধরল। সেটা পাহাড়ে ওঠার মত খাড়াই উঠে গেছে ওপর দিকে। ওপরে যাত্রাপার্টির অফিস। তারই মধ্যে কাঠের অক্ষরের দোকানটি চোখে পড়ল। ভেতরে মাঝবয়সী একজন বসে ছড়ানো কাগজপত্র দেখে অর্ডার মেলাচ্ছিল। চশমার ওপর দিয়ে অতনুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী চাই আপনার?'

অবনী কর্মকারের নাম শুনে বলল, 'কেন বলুন তো? খুব জরুরি কোনও দরকার?'

'হ্যাঁ, উনি আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন।'

সন্দিগ্ধ চোখে একটু তাকিয়ে লোকটি বলল, 'তা এখানে? উনি তো আজকাল এখানে আর আসেন না।'

হতাশ অতনু কি করবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েই থাকল। লোকটা কি বুঝল কে জানে! বলল, 'গণেশ টকির পেছনের রাস্তায় গিয়ে দেখুন একবার। তবে মনে হয় না দেখা করবেন।' বলেই বাড়ির নম্বরটা বলে দিল। নম্বরটা মনে মনে জপ করতে করতে অতনু সাবধানে সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগল।

প্রথম দর্শনে মনে হয়েছিল এ-বাড়িটারও বুঝি নোটিস পাবার বয়স হয়ে এসেছে। এখান থেকেও আবার অবনীবাবুকে হয়তো পাততাড়ি গুটোতে হবে হঠাৎই একদিন। গরানহাটার মতই অবনীবাবুর জীবনেও গড়ানভাটার পালা শুরু হয়েছে, নিতান্তই পড়তি দশায় পড়ে গেছেন ভদ্রলোক, ভেবে মনে মনে কেমন সমবেদনাই বোধ করল অতনু।

একতলার প্রবেশপথেই এক ঠোক্কর খাধা পেল আচমকা। সিলিং-এ চল্লিশ

ওয়াটের একটা লালচে বাল্‌ব ধোঁয়ার ময়লায় এক কোট খেয়ে মিটমিট করে জ্বলছিল। অন্যমনস্ক অথচ বেগবান অতনু কিছু ঠাওর করার আগেই এক বিশাল দেহের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে হাত দিয়ে সামলে নিল। বিদ্যুৎগতিতে পূর্বস্মৃতির শক্ ফিরে এসেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু না, কোনও ডেড-বডি নয়, রীতিমত জ্যান্ত ব্যাপার। একটি পাটকেলি রঙের ষাঁড় সটান শুয়ে সান্ধ্য আলস্যে জিরেন কাটছিল, অতনুর গায়ে পড়া স্বভাবে সে বিরক্তি আর তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল গলার ভেতর থেকে একটা মিনি গর্জন উগরে দিয়ে। তিন পাশ বন্ধ জায়গায় সেই আওয়াজটা বোধহয় চতুর্গুণ জোরে শোনাল। একটু তফাতে ঢাকা বারান্দার একপাশে বসে এক বিহারি প্রৌঢ়া আগুনের মালসা সামনে নিয়ে লিটি ভাজছিল আর তাকে ঘিরে বসেছিল দেশোয়ালি বালখিল্যের দল। খিলখিলিয়ে হেসে উঠল সবাই। প্রৌঢ়া ওদের ধমকে থামিয়ে সিঁড়ি দেখিয়ে দিল।

বত্রিশ জাতের ভাড়াটের ছত্রিশ রকমের কিস্‌সা-কাহিনীসুদ্ধ হোল্ড অল টাইপের বাড়ি থাকে এক একটা, তার ভেতর যা ঢোকানো যায় তাই ধরে যায়। সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠতে উঠতে অতনুর সেই রকমই মনে হয়েছিল যেন। নেপালি স্ত্রীলোক, পঞ্জাবি পরিবার, কাশ্মিরি শাল ব্যবসায়ীও চোখে পড়ে গেল তার। দরজায় নেমপ্লেট আর ডোর বেল দেখতে পেয়ে বোতাম টিপতেই একজন দরজা খুলে মুখ বাড়াল। লোকটা খুব বেঁটে আর মোটা, ঝাঁটা গোঁফ, গোল গোল সন্ধানী চোখ। অতনু কিছু বলার আগেই বলে উঠল, 'ভেতরে আসুন। উনি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।'

এরকম অভ্যর্থনা কল্পনার বাইরে ছিল। বুকের ভেতরটা এক মুহূর্তের জন্যে গুড়-গুড় করে উঠল।

অভ্যথনা নাটকীয় তো বটেই, ফ্ল্যাটের ভেতরের চেহারা দেখেও সে কম অবাক হল না। বৃদ্ধের জরাগ্রস্ত ধড়ে তরুণ যুবকের মুণ্ডু সংযোজনের মতই অবাস্তব ঠেকল। মোজাইক টাইলস, দেওয়ালে প্লাস্টিক পেন্ট, বাহারি বাতি, আসবাবপত্রে ঝকঝকে পালিশ, সব মিলে যেন অন্য জগৎ।

লোকটার পিছু পিছু অতনু ভেতরের যে ঘরটায় গিয়ে দাঁড়াল সেটা মাঝারি আকারের একটা শোবার ঘর। উজ্জ্বল আলো থেকে হঠাৎ এসে প্রথমটায় কিছু ঠাওর হল না। শুধু তাপিন জাতীয় কোনও ওষুধের গন্ধ নাকে এসে লাগল। সেই সঙ্গে শ্বাস টানার মত কষ্টকর একটা শব্দ তার কানে ধরা পড়ল। ঝাঁটা গোঁফ, ভাঁটা চোখ লোকটা তার হাত ধরে একটা গদিমোড়া চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে চলে গেল। জ্যোৎস্নার চেয়েও কমা আলোয় চোখ সয়ে যেতেই সে দেখতে পেল তার সামনে খাটের বিছানায় থাক-থাক বালিশে হেলান দিয়ে একজোড়া হাই-পাওয়ার চশমার লেন্স তাকে লক্ষ্য করছে। লম্বাটে ধাঁচের মুখে

উদ্যত তর্জনির মত খাড়া নাক, দাড়ি-গোঁফ কামানো, হনু আর চোয়ালের হাড় যেন জেগে আছে। চওড়া পুরু ঠোঁটে সামান্য হাঁ-মুখ, আতেলা মাথায় কালো কোঁকড়া ঠাস চুল। গলা অব্দি চাদর টানা থাকলেও বোঝা যায়, মাঝারি হাইটের মানুষটা কুঁকড়ে-মুকড়ে এখন যেন এতটুকু হয়ে গেছে।

একটু সময় অপেক্ষা করে বসে থাকল অতনু। কিন্তু লোকটা কোনই কথা বলছে না দেখে ভাবনা হল। শেষে নিজেই আগ বাড়িয়ে বলল, 'আপনিই নিশ্চয় অবনী কর্মকার। আপনার চিঠি পেয়েই আমি এসেছি।'

'জানি।' কেমন হাঁপধরা চাপা গলায় অবনী কর্মকার থেমে থেমে বললেন, 'কিন্তু খুব বিলম্ব হয়ে গেল। অনেক দিন আগেই আসা উচিত ছিল।'

ছমছমে উত্তেজনার ভাবটা কেটে এসেছিল অতনুর। তার কেমন মনে হচ্ছিল একটা রহস্যের খটকা কোথাও থাকলেও অবনী মানুষটা বোধহয় ঘোরপ্যাঁচের নন, তাঁর থেকে কোনও বিপদের আশঙ্কা নেই। তাঁর গলা শুনেই বোঝা যায়, অসুখটা তাঁর ভান নয়, তিনি জেনুইন অসুস্থ।

দেরি তো সত্যিই হয়েছে। সত্যি মিথ্যে মিলিয়ে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার। একটু ইতস্তত করে অতনু বলল, 'আপনার চিঠিটা অন্য কিছু চিঠি আর কাগজপত্রের সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছিল, আজ প্রথম খুঁজে পেলাম। কিন্তু চিঠিতে কোনও তারিখ ছিল না, পোস্টাপিসের ছাপও এত অস্পষ্ট যে—'

কথার মাঝখানে বাধা পড়ল। পথ দেখিয়ে আনা সেই লোকটা যেন ভুঁই ফুঁড়ে কাছে এসে দাঁড়াল, হাতে ট্রে, তা থেকে ধোঁয়া উঠছে। খাটের তলা থেকে একটা খাটো মাপের টুল টেনে নিয়ে লোকটা ট্রে-টা বসিয়ে দিল। অতনু বেশ অপ্রস্তুত বোধ করল। রুগী মানুষের আহার পথ্যির মাঝখানে তার এভাবে বসে থাকার কোনও মানে হয় না, মানে মানে আজকের মত বিদায় নেবে না তফাতে সরে বসবে বুঝতে না পেরে অবনী কর্মকারের মুখের দিকে তাকাতেই তিনি মাথা নেড়ে কি ইঙ্গিত করলেন। পাশে দাঁড়ানো লোকটা চলে যেতে যেতে নিচু গলায় বলে গেল, 'এ আপনার জন্যে।'

এই অস্বাভাবিক পরিবেশে এত দ্রুত তার জন্যে, কেবলমাত্র তার জন্যেই এই ব্যবস্থা দেখে মনের মধ্যে চকিতে একটা সন্দেহ উঁকি দিয়ে গেল। অতনু মাথা নেড়ে বলল, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার, না-না, এ হয় না, নিয়ে যেতে বলুন। এ আমার গলা দিয়ে নামবে না।'

'কেন? বিষ তো নয়। কফির সঙ্গে যৎসামান্য। অতিথি বলে কথা!'

অতনু অপ্রস্তুত, লোকটা কি তার মনের সন্দেহ আন্দাজ করে ফেলেছে? সে তাড়াতাড়ি বলল, 'ছি ছি, এ কী বলছেন! আসলে আপনি রোগের যন্ত্রণায় শয্যাশায়ী, কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে, আর আমি আপনার সামনে বসে তরিবত করে...আমার বিবেকে বাধে না?'

অবনী কর্মকার ম্লান হেসে বললেন, ‘যন্ত্রণা তো আছেই। বাত আমাকে একেবারে পঙ্গু করে ফেলেছে, বিছানা থেকে নামা-ওঠা নড়াচড়ার সাধ্য নেই, সেই সঙ্গে এক ধরনের হাঁপানির টান, এ ভবিতব্য। তোমার কিছু করার নেই—এই দ্যাখো, ‘তুমি’ বলে ফেললাম!’ অ্যাজমার দমক সামলে নিয়েছেন মনে হল।

‘‘তুমি’ই তো বলবেন। আপনি বয়সে বড় আমার থেকে।’

‘তা ঠিক। তোমার যে এত কম বয়স, দেখার আগে ভাবতেই পারিনি। আচ্ছা, আমার কত বয়স কিছু আন্দাজ করতে পারো?’

অতনু আগেই অবনীর বয়স অনুমান করে নিয়েছিল। মুখে যন্ত্রণার কুঞ্চন থাকলেও একটাও দাঁত পড়েনি লোকটার, চুল পাকেনি। নিরন্তর ঝুঁকে বসে চোখের কাজ যারা করে তাদের চোখ যায় সকলের আগে। অতনু বলল, ‘পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হবে।’

কর্মকারের মুখে এতক্ষণে একটু হাসির রেখা ফুটল, ‘হল না।’

‘কেন, বেশি বলেছি না কম?’

‘একাশি চলছে।’

‘একাশি! বলেন কি? আপনি ঠাট্টা করছেন?’

‘ঠাট্টা করব কেন, আমি কি আজকের মানুষ। আমার ছোট ছেলেকে তো তুমি দেখেছ। নবনীই পঞ্চাশে পা দিয়েছে, কদিন আগে তার জন্মদিন গেল।’

‘আপনার ছেলেকে আমি দেখেছি? কোথায়? কে বলুন তো?’

‘কেন, নতুন বাজারে কাঠখোদাইয়ের কারখানায়! ওই তো ফোন করে তোমার আসার খবর আমাকে জানাল। ধরণী রমণী নবনী, আমার তিন ছেলে। ওরা সব যে যার মত আলাদা থাকে।’

নাটকীয় অভ্যর্থনার যবনিকা এভাবে উঠবে ভাবেনি। একটা নিঃশ্বাস ফেলে কফির কাপটা টেনে নিয়ে অতনু বলল, ‘এত বড় বাড়িতে আপনি একা?’

‘একা না, বুড়োবুড়িতে আছি। আমার দ্বিতীয় পক্ষ, তা সেও বাহাত্তুরে বুড়ি। আরও একজন, সর্বক্ষণ ছায়ার মত ভজনলাল আছে। ও আমার ছেলের চেয়েও বেশি। ভাড়াটেরাও সজ্জন, দরকারে অনেক করে।’

বৃদ্ধের শূন্যতা অতনু অনুভব করছিল। দুঃখিত চোখে তাকিয়ে থাকল।

‘সংসারের এটাই নিয়ম। ডানা গজালে আর কেউ বাসাটার দিকে ফিরেও তাকায় না। পৈতৃক বাড়ি, এই এঁদো উত্তর কলকাতা ওদের পছন্দ না। তার জন্যে আমার দুঃখ নেই, আমি সাবেক কালের শেকড় ধরে ঝুলে আছি, এভাবেই একদিন খসে যাব। আমার দুঃখটা কি জানো?’

অতনু জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকল।

‘দুঃখ, ওরা কেউ বংশের ধারা পেল না। জীবিকা বদলে ফেলল, বড়জন ডাক্তার, মেজ কনট্রাক্টর। একমাত্র নবনীই লাইনটা একটু ছুঁয়ে আছে। ওই

একটু-আধটু যোগাযোগ রাখে, টেলিফোনে হলেও খবরাখবর নেয়। নাঃ, তোমাকে আবার এসব কেন বলছি!'

ওঁকে অন্যমনস্ক করে দেবার জন্যে অতনু অন্য প্রসঙ্গ তুলল, 'আপনি তো ব্লক-মেকার ছিলেন! গরানহাটায় আপনাদের—'

'রাজত্বই ছিল বলতে পারো, রমরমে অবস্থা। সে আমার বাবা-কাকাদের আমল। তাহলে তোমাকে বলি, কৃত্তিবাসী কাশীদাসী রামায়ণ-মহাভারত হয়তো দেখেছ, বটতলার ছাপা। ওর সব ছবি ওঁদেরই করা, ব্লক পর্যন্ত। ওরকম হাতের কাজ আর হবে না। সে একটা যুগ গেছে। এখনও ওখানকার গয়নার দোকানে ডিজাইনের বই দেখতে পাবে। তার সব নকশা এই অবনী কর্মকারের তৈরি। কর্মকার মানে কামার না, আমরা আদিতে ছিলাম স্বর্ণকার। মণিকার বলাই ঠিক। অল্পবয়সে আমার জ্যাঠঠাকুরদা প্রথমে ছিলেন সীমান্ত বাংলার এক রাজবংশের বেতনভুক্ সভাশিল্পী। পরে কোনও কারণে মতবিরোধ হওয়ায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাজগৃহ বদল করেন। রাঢ় দেশের জঙ্গল মহালের অন্য এক রাজপুরুষের সভাভূষণ হন। এই রাজা ছিলেন যেমন দুর্দান্ত খেয়ালি আর দোর্দণ্ডপ্রতাপ তেমনি গুণের কদর দিতেও তাঁর জুড়ি ছিল না। রাজা নিজেও চিত্রচর্চা করতেন, অবসর সময়ে ছবি আঁকতেন। তাই জ্যাঠঠাকুরদা ওখানেই পেয়েছিলেন সত্যিকারের স্বাধীনতা আর সম্মান, নিজের খেয়ালখুশিতে ডুবে থাকার অধিকার। বেতনভুক্ না হয়ে বৃত্তিধারী পার্ষদ। ঠাকুরদার প্রতিভা খুলতে শুরু করেছিল ওই সময় থেকে। অনেক গুণ ছিল তাঁর ভেতরে, মগজে খেলা করত উদ্ভট সব কল্পনা। তোমাদের ভাষায় যাকে বলে এক্সপেরিমেন্ট, তাতে তাঁর ক্লান্তি ছিল না।'

একটানা অনেকটা কথা বলে অবনীবাবু থামলেন। ঠাকুরদার প্রশস্তিতে তাঁর ব্যথাবেদনা যেন চাপা পড়ে গিয়েছিল। পুরু কাচের ওপিঠে চোখ দুটো কেবল চকচক করছিল না, বোধহয় চিকচিকও করছিল। আবেগে জল এসে গিয়েছিল চোখের কোণে। এই কমা আলোতেও অতনুর সেই রকমই সন্দেহ হল। সে কোনও প্রশ্ন তুলে এই বলার ঝোঁকটাকে নষ্ট হতে দিল না। গভীর আগ্রহে এই অশীতিপর বৃদ্ধের মুখে পুরনো দিনের কথা শুনতে শুনতে তার কেবলই মনে হচ্ছিল আসল মানুষটিকে সে পেয়ে গেছে। এই কাহিনী বোধহয় সরাসরি তার দিকেই এগোচ্ছে। কফি শেষ করে কখন ডিশে হাত লাগিয়েছিল হুঁশ ছিল না তার।

'বিরক্ত লাগছে তো?'

'মোটেই না, আপনি বলুন, শুনতে খুব ভাল লাগছে।'

'জ্যাঠঠাকুরদাকে আমি দেখিনি। কোনও ঠাকুরদাদাকেই দেখিনি। ছেলেবেলায় বাবার মুখে গল্প শুনেছি। পরে মায়ের মুখে। সে সবই দু-তিন হাতফেরতা

গল্প। তার কতটা রং আর কতটা রংচটা কিছুই হলপ করে বলতে পারব না। রাজবাড়ি থেকে জ্যাঠঠাকুরদা মাঝে মাঝে ঘরে ফিরতেন। তখন নিজের কাজের কথা, পরীক্ষা-টরীক্ষার কথা ভাইদের বলতেন, আলোচনাও করতেন। তাঁরা কিছু বুঝতেন, অনেকটাই হয়তো বুঝতেন না। দাদার পাগলামি ভেবে চুপ করে থাকতেন। কিন্তু সে সব মোটেই পাগলামি ছিল না। পাগলামি হলে ত্রিপুরার মহারাজা তাঁকে 'রত্নাকর' উপাধি দিতেন না। শুনেছি একবার জ্যাঠঠাকুরদা ওই রাজবাড়িতে আমন্ত্রিত অতিথি হয়েছিলেন।

রাজার পক্ষ থেকে তাঁকে দুটো বিচিত্র উপঢৌকন দেওয়া হয়। দামী পাথর-বসানো ডোগরা স্টাইলের একটা মজাদার হাতি, সেটা আসলে মূল্যবান কাগজপত্র রাখার বাক্স। আর অদ্ভুত তেল রঙে আঁকা পোর্ট্রেট। দুটোই জ্যাঠঠাকুরদার কীর্তি। মহারাজ এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে দেশে ফিরেই শিল্পীকে ওই খেতাব দিয়েছিলেন। এই ঘটনার পর থেকেই জ্যাঠঠাকুরদার নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে চতুর্দিকে। হয়তো সেই সঙ্গে শত্রুর সংখ্যাও বাড়তে থাকে।'

অতনু অবাক হয়ে বলে, 'শত্রু কেন? উনি তো কারও কোনও ক্ষতি করেননি।'

'না, তা করেননি। একেবারেই নিজের খেয়ালে নিজে বুঁদ হয়ে ছিলেন। কিন্তু তাতে কি নিস্তার আছে? আশপাশের মহল থেকে গোপনে ডাক আসছিল। ওঁকে ভাঙিয়ে নিযে যাবার চেষ্টা হচ্ছিল। কিন্তু উনি ছিলেন নির্লোভ কাজের মানুষ। কোনও ফুসলানিতে কান দেননি। যতদূর গল্প শুনেছি, উনি এই সময একটা মস্ত বড় কাজে হাত দিয়েছিলেন। পরিকল্পনাটা ওঁর নিজের হলেও রাজামশাই ওঁকে মদত না দিলে সেটা কার্যকর করা হয়তো আদৌ সম্ভব হত না। কাজটার জন্যে এখানে সেখানে ঘুরতেও হয়েছে কখনও সখনও। এ ব্যাপারে রাজামশাই সাহায্য করেছেন, সুযোগ করে দিয়েছেন। অনেক দিন ধরে একটু একটু করে কাজটা যখন প্রায শেষ করে এনেছেন, রাজামশাই হঠাৎ গত হলেন। অনেক দিনের এক অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক এবং অন্তরঙ্গ সঙ্গীর আকস্মিক বিদায়ে ঠাকুরদার জগৎ কেমন শূন্য হযে গেল। বুঝলেন রাজবাড়ির পালা এবার সাঙ্গ হল। তাঁর নিজেরও তখন বযস হয়েছে। বিয়ে-থা করেননি, একলা মানুষ। কোথায় ফিরবেন, চট করে ভেবে পেলেন না।'

'কেন, বাড়িতে, ভাইদের কাছে?' মুখ ফসকে প্রশ্নটা যেন আপনা থেকেই বেরিয়ে এল।

'না। বাড়ির চেহারা ততদিনে বদলে গেছে। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়েছে।'

'তাহলে? মানুষটা কোথায় চলে গেলেন শেষ পর্যন্ত?'

'কোথাও না। যাওয়াই হল না ঠাকুরদার। কথায় বলে, রাজা যায় রাজা

আসে। রাজার ভাই রাজা হল। সে বয়সে অনেক ছোট কিন্তু বুদ্ধিতে না। অন্য মেজাজ-মর্জির, প্র্যাকটিক্যাল, বিষয়জ্ঞান টনটনে। ঠাকুরদাকে কিন্তু সে ছাড়ল না। বলল, আপনি আবার কোথায় যাবেন, থাকুন এখানে। যে কাজ করছিলেন করুন।'

অতনু বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না তো?'

অবনী কর্মকার মাথা নাড়লেন, 'মনে করব কেন, আমি তো বলতেই চাই।'

'তখন থেকে কাজ কাজই শুনে আসছি। কাজটা কী? স্পষ্ট করে বলেননি কিন্তু।'

'ওঃ হো, বলিনি বুঝি? মূর্তি পাথর এইসব নিয়ে বড় একখানা পুঁথি লিখছিলেন জ্যাঠঠাকুরদা। ইতিহাস-টিতিহাসের মত। এই রকমই শুনেছি।'

পুঁথি! অতনু চমকে খাড়া হয়ে বসল। এই কি তাহলে সেই মানুষ? অবনীবাবু কি তাহলে আসল গাছের শেকড় ধরেই ঝুলে আছেন?

অতনুর প্রতিক্রিয়া চোখে পড়েছিল অবনীর। সামান্য হেসে বললেন, 'পুঁথি লিখছিলেন শুনে অবাক হবার কিছু নেই। ইস্কুলে-কলেজে না পড়লেও উনি ছিলেন শিক্ষিত মানুষ। বাড়িতে এক গুরুমশাই টোল খুলেছিলেন এই কর্মকার পরিবারের সাহায্যে। সেখানে কিছুকাল বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন শুনেছি।'

অতনু উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, 'তবে কি 'রত্নগুপ্তি বিচিত্রম'?'

'কী বললে? ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'পুঁথিটার নাম কি 'রত্নগুপ্তি বিচিত্রম'?'

'তা তো জানি না বাবা। কি জানি, হতেও পারে, আমাকে কেউ বলেনি।'

'ছবি আঁকা পুঁথি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। ছবির কথা শুনেছি যেন। কিন্তু তুমি কি করে জানলে? কেউ তোমাকে বলেছে?'

'না। আমি নিজেই দেখেছি।'

উত্তেজনায় অবনী বোধহয় উঁচু হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন, ব্যথায় ককিয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। তারপর ব্যথাটা সামলে নিয়ে বিস্ময় বিমূঢ় গলায় বললেন, 'অসম্ভব। সে পুঁথি তুমি কি করে দেখবে, আমিই চোখে দেখিনি!'

একটু চুপ করে থেকে অতনু বলল, 'শুনলে আরও অবাক হবেন, সে পুঁথি এখন আমার বাড়িতেই আছে, তবে ছেঁড়াখোড়া অবস্থায়।'

অবনী হাঁ হয়ে গেলেন। 'তোমাকে ওটা কে দিল?'

'পেয়েছি। এক জায়গা থেকে পেয়ে গেছি।'

কোথা থেকে পেয়েছে তা আর জিজ্ঞেস করলেন না ভদ্রলোক। শুধু বললেন, 'ওটা যে সেই পুঁথিই, তুমি কি করে জানলে?'

'আপনার কাছে যেরকম শুনলাম তাতে মনে হয় আমার ভুল হয়নি। পুঁথিটা সচিত্র, রীতিমত পাকা হাতের আঁকা, আর অদ্ভুত ধরনের কালির ব্যবহার, সেটাও আছে। বিশেষ করে একটা নটরাজের মূর্তি—'

অবনী বাধা দিলেন, 'ইয়েস, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম আমি। তোমার কথাটা শুনে মনে পড়ে গেল। ওই নটরাজ মূর্তির ব্যাপারে কিছু বলব বলেই তোমাকে আসতে বলেছিলাম। সেটা মনেও ছিল, নইলে জ্যাঠঠাকুরদার কথা সাতকাহন করে বলতাম না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে খেইটা হারিয়ে বসেছিলাম।'

অতনু রুদ্ধনিশ্বাসে বলল, 'হ্যাঁ, ও ব্যাপারে আপনার মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।'

'মূর্তিটা আমার জ্যাঠঠাকুরদার তৈরি।'

'তাই? এ খবরটা সত্যিই জানতাম না। ভেবেছিলাম পুঁথির লেখক আর মূর্তিকার আলাদা কেউ।'

'আরও আছে। বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরি বুঝতেই পারছ!'

'বিশেষ উদ্দেশ্যে এবং রাজনির্দেশে, তাই তো?'

'ঠিক ধরেছ। তবে রাজার নয়, তাঁর ভাইয়ের।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল অতনু।

'আরও মজা আছে। মূর্তিটা ফাঁপা, হীরের ফুল বসানো, তলায় স্প্রিংয়ের কাজ, খোলা যায়।'

অতনু সংক্ষেপে বলল, 'জানি।'

অবনী আবার হাঁ করে থাকলেন একটুক্ষণ। পরে হতাশ গলায় বললেন, 'তাও জানো! তাও জেনে ফেলেছ তুমি? তুমি আমাকে অবাক করে দিলে অতনুবাবু। তবে একটা খবর তোমার বোধহয় জানা নেই। ওটা আগে নটরাজ ছিল না।'

'ছিল না, বলেন কি!' উত্তেজনায় অতনু উঠে দাঁড়াতে গিয়েছিল, আবার বসে পড়ে বলল, 'তাহলে কি ছিল?'

'তোমার পুঁথিতে কি একটা ছবি আছে, মনে করে দেখো তো! নীলকণ্ঠ মহাদেবের ধ্যানী মূর্তি।'

'হ্যাঁ, দেখেছি তো। প্রায় গোড়ার দিকে।'

'সলিড সোনার। ওটা ভেঙেই তৈরি হয়েছিল নটরাজ।'

অতনুর কেমন ধাঁধা লাগছিল। পুঁথিতে কোথাও সেরকম উল্লেখ নেই। অবাক হয়ে বলল, 'কেন? মহাদেব নয় কেন?'

'রাজারা ছিলেন শৈব। মহাদেব ছিলেন তাঁদের কুলদেবতা। নিয়মিত পূজিত হতেন। নিদ্রিত মূর্তি কিন্তু জাগ্রত। কিন্তু রাজার ভাই শাক্ত মতের উপাসক।

কিন্তু বংশের ধারাকে পুরোপুরি বোধহয় ভাঙতে সাহস করেনি। রুদ্রভৈরবের মূর্তিতে তাই রূপান্তরিত হয়ে গেলেন নীলকণ্ঠ।'

অতনু আচমকা জিজ্ঞেস করল, 'নটরাজ এখন কোথায়?'

'জানি না। বোধহয় কেউই জানে না।' শুনে অতনু মুখ খুলতে গিয়েও খুলল না। কথা ঘোরাল।

'কেন, আপনার জ্যাঠঠাকুরদা নিশ্চয় জানতেন?'

'হয়তো। কিন্তু বলে যাবার সুযোগ পাননি। শোনা যায়, এর কিছুদিন পরেই তিনি হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। কিংবদন্তী বলে, গুপ্ত শত্রুর হাতে তিনি বোধহয়—'

কিছু সময় দুজনেই চুপচাপ। ভজনলাল কখন এসে এঁটো কাপডিশ তুলে নিয়ে গেছে অতনু খেয়ালই করেনি। আড়ষ্ট অবস্থা থেকে ছাড়া পেয়ে একসময় অতনু প্রশ্ন করল, 'ওই রাজামশাইদের একটা পদবী ছিল নিশ্চয়? কি সেটা?'

অবনী যেন মনের ভেতরটা হাতড়ে বেড়াতে থাকলেন। অসহায়ের মত।

অতনু বলল, 'সিংহবাবু কি?'

এক মুহূর্ত থতিয়ে থেকে অবনী হঠাৎ মুখ খুললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সিংহবাবু, মনে পড়েছে।'

'তাঁদের কোনও বংশধরের খবর জানেন?'

'না। লোকে বলে কুলদেবতার রোষে রাজবংশ নিশ্চিহ্ন হযে গেছে।'

অতনু ভাবছিল রাত হযে যাচ্ছে। এবার ওঠা দরকার। কিন্তু তাব আগে বহ্নিদেবীর কথাটা তাকে তুলতে হবে। কিন্তু কোন ছুতোয় সেটা বলবে কিছুই মাথায় আসছিল না।

ঘরে উঁকি দিয়ে অতনু অবাক। লুঙ্গিটাকে মাদ্রাজি কায়দায় হাঁটুর ওপর ফোল্ড করে কোমরের নিচে জড়ানো, গায়ে গেঞ্জি। হাতে ঘড়ি বেঁধে শচী উত্তেজিত ভঙ্গিতে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

'সানরাইজ কেমন লাগল?' অতনু ওকে চমকে দিয়ে লঘু গলায় হাসল, 'লাইফে বোধহয় এই প্রথম, তাই না?' এই ভোর সকালে শচীর শয্যাত্যাগ সত্যি ভাবাই যায় না।

চলন ভেঙে থমকে ঘুরে দাঁড়াল শচী। হাসল না। চুল উস্কখুস্ক। চোখে-মুখে অনিদ্রার ছাপ। অপ্রসন্ন গলায় বলল, 'কাল এলে না যে বড়? আর একটু দেখে, নিজেই যেতাম তোমার কাছে শেষ পর্যন্ত। লালুর মেসেজ সুবলদা ঠিকঠাক দিয়েছিল নিশ্চয়?'

'তা দিয়েছিল। কিন্তু কাল অনেক রাতে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন আর বেরোনো যায় না। তাছাড়া খুব ক্লান্ত ছিলাম ভাই। বহুৎ ধকল গেছে কাল। তা কোনও নতুন খবর আছে বুঝি? এত জরুরি তলব!'

'খবরই বটে!' হতাশ গলায় ব্যঙ্গের সুর মিশল, 'বলতে পারো জলজ্যান্ত ঘটনা। সর্বনাশ হয়ে গেছে, তনু!'

পলকের জন্যে অতনু কেমন গুটিয়ে গেল। তারপর শান্ত গলায় শুধোল, 'পুলিশ?'

'হ্যাং ইযোর পুলিশ! ক্যালকাটান পুলিশ তোমার জেট প্লেন না। ওদের নড়তে-চড়তে সময় লাগে। খুব সিরিয়াস ব্যাপার। শুনলে চমকে যাবে। এরকম কাণ্ড হবে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।'

সব জড়িয়ে অতনু এবার যেন ব্যাপারটা আঁচ করতে পারছিল। প্রশ্ন করল, 'কখন হল?'

'কাল দুপুরে। বিকেলে ফিরে আমার তো চক্ষুস্থির। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছিলাম তোমাকে। তখন পইপই করে তোমাকে কত সেধেছিলাম, শুনলে না তো!'

অতনু বলল, 'যাক, আপদ গেছে। ফর নাথিং বার্ডেন বয়ে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না। ইউজলেস মানেই মিনিংলেস। দামী গয়না জীবনভর ভল্টে লুকিয়ে রাখার চেয়েও খারাপ।'

শচী মাথা চুলকে বলল, 'সে তোমার সঙ্গে আমি একমত। দেবীদিদিকে যখন ফেরত দেওয়াই গেল না, আমার কাছে ওই মূর্তির আর কোনও টানই ছিল না। আমি ব্যস্ত হচ্ছি অন্য কারণে। কদিন কোনও উপদ্রব ছিল না, ভেবেছিলুম ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেছে। এখন দেখছি তা নয়, আমাদের চারপাশ বেশ গরম, শত্রুপক্ষ থাবা উঁচিয়ে ওত পেতে রয়েছে।'

'হুঁ, তোর দুশ্চিন্তার কারণটা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।'

'সেইজন্যে তো তোমাকে আগেভাগে জানিয়ে দিতে চাই। তুমি হুঁশিয়ার থেকো। মূর্তিটা যখন ফাঁকা দেখবে—'

'ঘটনাটা শোনা যাক। কিভাবে গেল?'

'আর বলো না, বড়দির কাণ্ড। কাল দুপুরে একটা লোক আমার খোঁজে ওপরে উঠে এসেছিল। আমার সঙ্গে নাকি বিশেষ দরকার। বিকেলে ফিরব শুনে বসতে চাইল, বলল, স্যার পাঠিয়েছেন, আমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। দিদি ভাবল জ্যেঠু স্যারের কাছ থেকে লোকটা এসেছে। আমার ঘরে ওকে বসিয়ে ও নিজের কাজে চলে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পরে চা দিতে এসে দেখে লোকটা নেই। হঠাৎ কোনও দরকারে হয়তো নিচে নেমেছে ভেবে চা ঢাকা দিয়ে রেখেছিল কিন্তু লোকটা আর ফিরে আসেনি। ফিরে আসার পর দিদির মুখে সব শুনে কেমন খটকা লাগল। জ্যেঠু স্যার এখন বাইরে, তাঁর কাছ থেকে লোক আসবে কি! ঘরে ঢুকে দেখি খাটের তলায় আমার সুটকেসটা লণ্ডভণ্ড করে রেখে গেছে। প্যাকিংটা পড়ে আছে কিন্তু তার ভেতরে মূর্তিটা নেই!'

অতনু মাথা নেড়ে বলল, 'সত্যি, লোকটা যেন সব জানত। তাকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি, কত সহজে কাজ হাসিল করে চলে গেছে। এবার তোদের একটু সাবধান হওয়া উচিত। যাকে তাকে হুটহাট ওপরে উঠতে দিবি না। তোর ঘরটা তালাবন্ধ করে রাখিস না কেন?'

'এখন থেকে সেই বন্দোবস্তই হয়েছে। চুরির ব্যাপারটা দিদিকে অবশ্য বলিনি।' শচী বলল, 'কিন্তু তোমার ব্যাপারটা কি বলো তো? তুমি আবার ঘোরাঘুরি আরম্ভ করেছ? কটা দিন বাড়িতে বসে থাকতে পারছ না?'

অতনু হাসল, 'আমার জন্যে ভাবিস না। আমি তোর ডেঞ্জার জোনের দিকে পা বাড়াইনি। মধ্য কলকাতা থেকে দক্ষিণ কলকাতা আমি এড়িয়ে চলেছি। কাল অনেক ছুটোছুটি করেছি ঠিকই, কিন্তু সে পাতিপুকুর লেকটাউন আর গণেশ টকি, মোল্লার দৌড় ওই মসজিদ পর্যন্ত।'

শচীর চোখে কৌতূহল চকচক করে উঠল, 'কী হল নতুন কিছু ঘটল নাকি আবার?'

'সব বলছি, কিন্তু তার আগে—'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তার আগে। বসো, আমি এখুনি আসছি।'

অবনী কর্মকারের সবিস্তার কাহিনী আর চা একসঙ্গে শেষ হল। শচী একদৃষ্টিতে অতনুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে অতনু বলল, 'এই পর্যন্ত কেমন বুঝলি?'

'পর্যন্ত কেন? আরও আছে নাকি?'

'আছে। তবে সেটুকু পরে বলব।'

'ফ্যানটাস্টিক বলতে পারতাম', শচী মাথা নাড়ল, 'কিন্তু বলব না। আসলে তুমি মুখ্যুর মত একই ভুল করেছিলে, বেপরোয়া ঝুঁকি নিয়েছিলে। পায়ের দিকে না তাকিয়ে তোমার এই লম্ফ দেওয়া স্বভাব আমি সমর্থন করতে পারি না।' যেন বন্ধুর বিগত আচরণে আহত হয়েই শচী অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকল। অতনু হেসে ফেলল।

'মুখ্যু বলেছিস আপত্তি করছি না, ইটস্ অলরাইট, কিন্তু—'

'না, অলরাইট নয়। অনেক বিলম্ব করে অবনী কর্মকারের কাছে দুম করে চলে গিয়েছিলে তাই রক্ষে, নইলে আবার কোন ফ্যাসাদে জড়িয়ে যেতে কে জানে! ওই এক লাইনের চিঠিটা তোমার কাছে নিরীহ মনে হতে পারে কিন্তু আমি সেরকম ভাবছি না।'

'হোয়াই?'

'সত্যি ব্রাদার! তুমি একেক সময় কানামাছি বনে যাও। উড়ে গিয়েও আবার

ঘুরে-ফিরে যে একই জায়গায় এসে বসছ, টের পাও না। তোমার কি একবারও মনে হয়নি রঞ্জুপ্রসাদের টেলিফোনের ডাক, আর ওই ডাকের চিঠিটার মধ্যে আশ্চর্য মিল আছে? পরে একবারও মনে হল না যে টেলিফোনের গলা আর অবনীবাবুর হাঁপধরা গলা প্রায় একই রকম শোনাচ্ছে? নাটকটা তুমি বিশ্বাস করে নিলে! দুটি অসহায় অথর্ব বুড়োবুড়ি ওই রকম ঝকঝকে ফ্ল্যাটের বাসিন্দে, এ কি হতে পারে? বুড়িকে তুমি তো চোখেও দেখোনি! ওই একাশি বছর বয়সের গপ্পো, অসুখের ফিরিস্তি, কমা আলোয় ওইভাবে তোমাকে বসিয়ে রাখা, ইনস্ট্যান্ট কফিটফি আসা—তোমার খটকা লাগা উচিত ছিল। অবনীবাবু যে ডাহা মিথ্যে কথা বলছেন না, তার প্রমাণ কি?'

বলেই কোনও উত্তরের অপেক্ষা না করে শচী উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অতনু মনে মনে বলল, যাঃ ব্বাবা!

শচী এখন খুব অ্যাকটিভ হয়েছে, হাতে পাঁজি মঙ্গলবারের ধার ধারছে না। অতনু অবাক হয়ে দেখল শচী একটা ঢাউস মহাভারত হাতে করে ফিরে এল। সন্দিগ্ধভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'না, গুরু, এখানে কোনও ফল্ট দেখতে পাচ্ছি না। ছবিতে কর্মকার নামটা পাচ্ছি। সূচীপত্রের তলায় ডিজাইনার অ্যান্ড মেকার হিসেবে কর্মকার গ্রুপ অ্যান্ড সন্স, ঠিকানা গরানহাটা। এঁরাই অবনীবাবুর বাবা-কাকা কিনা সেটা অবশ্য বলা যাচ্ছে না।'

অতনু হাসল, 'তবেই দেখ্, তোর হিসেবমত অবনীবাবু যদি আগাগোড়া মিথ্যেও বলে থাকেন, তার বেসটা কিন্তু সত্যি। ওঁর বিরুদ্ধে তুই যেসব পয়েন্ট তুলেছিস, তার বিপক্ষেও অবশ্য যুক্তি দেখানো যেত কিন্তু আমি সে পথে যাচ্ছি না। শুধু বলতে চাই, উনি ডাহা মিথ্যে কথা বলেছেন, এ আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। আর তাই যদি হবে তাহলে আগ বাড়িয়ে অত কথা ওঁর বলবার দরকারই বা কি ছিল?'

'ওগুলো টোপ।'

'কিসের টোপ?'

'তোমাকে বাজিয়ে দেখার। তোমার ভেতর থেকে কথা বের করার জন্যে খুব কিছু নতুন কথা কি উনি বলেছেন? প্রায় সবই তো তোমার জানাই ছিল। বরং উনি জানতেন না এমন কিছু খবর তুমি ওঁকে সাপ্লাই করেছ।'

অতনু মাথা নেড়ে বলল, 'না, বরং আমার বাড়িয়ে দেওয়া তথ্যগুলোকেই তুই টোপ বলতে পারিস।'

'কিসের টোপ?'

'ওঁর মুছে-যাওয়া স্মৃতিকে উসকে দেবার, চাঙ্গা করে তোলার। হাতে হাতে ফলও পেয়েছি। পুঁথির লেখক আর মূর্তিকার যে একই লোক, মহাদেবের মূর্তি

ভেঙেই যে নটবাজের জন্ম, আর মূর্তিকার ওঁর জ্যাঠাকুরদা যে নিখোঁজ হয়েছিলেন, খুব সম্ভব তাঁকে গুমখুন করা হয়েছিল, এসব তথ্য সত্যিই আমার জানা ছিল না। কিন্তু অবনী কর্মকারের কাছে আমাকে যেতে বাধ্য করেছিলেন অন্য এক ভদ্রলোক। কোনদিক থেকে আমার কাজ শুরু করা উচিত সেই পথ বলতে গেলে তিনিই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।'

শচী অবাক হয়ে বলল, 'কে ভদ্রলোক? এত কথা বলেছ কিন্তু এই ভদ্রলোকের কথা তো কখনও আমাকে বলোনি! কোথায় তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হল, আমি তো কিছুই জানি না।'

'রূপমঞ্চ পত্রিকায়। দেবনারায়ণ দাস বলে কোনও নাট্যসমালোচকের নাম শুনেছিস?'

ভুরু কুঁচকে শচী কি মনে করার চেষ্টা করছিল। হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে বলল, 'এই ভদ্রলোক কি সিনেমার চিত্রনাট্য করতেন? আমি একজনকে জানতাম যিনি—'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছিস, ওই দেবনারায়ণবাবু। রূপমঞ্চে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল কথাটা ঠিক নয়, ওঁর একটা লেখা পড়তে গিয়ে চমকে উঠেছিলাম। বহ্নিময়ী অগ্নিহোত্রী নামের এক নতুন অভিনেত্রীকে উনি প্রায় কচুকাটা করে শেষে মন্তব্য করেছিলেন, যাত্রায় আর মঞ্চে অনেক ফারাক, শেঁকো গোঁসাই আর শিশির ভাদুড়ীতে যেমন।'

শচী চমকে উঠে বলল, 'শেঁকো গোঁসাই! সে কে?'

অতনু হাসল, 'ঠাট্টার সুরেই কথাটা বলেছিলেন অবশ্য। তাই আমার মনে হল শঙ্করহরণ গোস্বামীকেই শেঁকো গোঁসাই বলে টিপ্পনী কেটেছেন।'

'আমার বাবা কি করে পিকচারে এলেন বুঝতে পারছি না।'

'সেটাই তো কথা। সময়ের হিসেবে ওঁকে আইডেন্টিফাই করা শক্ত নয়। যতদূর জানি তোর বাবা আর শিশির ভাদুড়ী সমসাময়িক ছিলেন। হয়তো দুজনের মধ্যে পরিচয় এবং অন্তরঙ্গতাও ছিল। কিন্তু সেটা কোনও ব্যাপার নয়। আমার খটকা লাগল অন্য একটা ব্যাপারে। জনৈকা বহ্নিময়ী সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে দেববাবু দুম করে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক এই বোমাটা ফাটালেন কেন? কিছু না বলে উনি কি কিছু মীন করতে চেয়েছিলেন?'

শচী যেন ব্যাপারটার থই পাচ্ছিল না। সবকিছু জড়িয়ে কেমন উদ্ভট ঠেকছিল।

'মীন করতে চেয়েছিলেন বলতে? ঠিক বুঝলাম না।'

'দেবীদিদির কথা ভুলে গেলি? উনি বলেছিলেন না যে, তোর বাবা ছিলেন ওঁর গুরুতুল্য, হাতে-কলমে তালিম দিয়েছিলেন একসময়। ওঁর সাহায্য না পেলে—'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভুলব কেন! তা ব্যাপারটা তো মিথ্যে নয়। ফ্যাক্ট।'

'তা যদি হয় তাহলে এই অগ্নিহোত্রীই কি বহ্নিদেবী? একই ব্যক্তি হওয়াই কি বেশি সম্ভব নয়? দেবনারায়ণবাবু বেঁচে থাকলে তিনিই এ ব্যাপারে আমাকে আলোকপাত করতে পারতেন।'

'কিন্তু তা কি করে—'

'এই 'কিন্তু'টাই আমার মনের মধ্যে চেপে বসেছিল জটিল গেরোর মত।' অতনু বলল, 'আমি অবনী কর্মকারের সামনে বসে মূর্তি নিয়ে, পুঁথি নিয়ে কথা বলছিলাম বটে কিন্তু সুযোগ খুঁজছিলাম কখন কি ভাবে খুব সহজে কিছুই-না-ভঙ্গিতে প্রসঙ্গটা পাড়ব।

'রাত হয়ে গিয়েছিল বেশ। বুঝতে পারছিলাম অবনীবাবু ক্লান্ত, কিন্তু ভদ্রতাবশত আমাকে উঠতে বলতে পারছেন না। আমার শেষ প্রশ্নের উত্তরে অবনীবাবু জানালেন সিংহবাবু রাজবংশের শেষ খবর তিনি জানেন না, তবে লোকের মুখে শুনেছেন কুলদেবতার রোষে রাজবংশ নাকি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কথা শেষ, এবার আমাকে উঠতে হবে। আমাব মাথায কিছুই আসছিল না। বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েও আবার বসে পড়ে আমি বললাম, আবার কবে দেখা হবে জানি না, আমার একটা সামান্য কৌতূহল ছিল। আচ্ছা, আপনি তো এই অপেরা মহল্লার একজন প্রবীণ মানুষ। যাত্রা জগতের অনেক খবরই আপনার জানবার কথা। শুনেছি একসময় নাকি পুরুষরাই মেয়ে সাজতেন। মেয়েদের নামেই তাঁরা পরিচিত হতেন। এরকম কোনও ছদ্মনটীর নাম কি আপনি মনে করতে পারেন, যিনি সেকালে খুব বিখ্যাত হয়েছিলেন?

'অবনীবাবু ঠোঁটের কোণে হাসলেন, তোমরা তখন জন্মাওনি, কি সবে জন্মেছ, সে সময় ভবানীরানীর উদয় হয়েছিল। লোকে আড়ালে তাঁকে গুঁপো রানীভবানী বলত। আসল নাম ছিল ভবানীমোহন সেন। খুব দাপুটে মহিলা সাজতেন। আমি হেসে বললাম, তা গোঁফ কামানো যুগের অবসান ঘটিয়ে যাত্রার পালাবদল হতে বোধহয় অনেক বিলম্ব হয়েছিল? অবনীবাবু মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক তাই, হাওয়া বদলাতে সময় লেগেছিল, তবে অদ্ভুত একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল তোমার কথা শুনে। চিৎপুরের এক অপেরাপার্টি খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে একটা মেয়েকে এনে তুলল। বছর পনের-ষোল বয়স হবে বড়জোর। চমৎকার গড়ন, সুন্দর চেহারা। দেখলেই বোঝা যায় খানদানি বড় ঘরের মেয়ে। দুর্মতির বশে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল নিশ্চয়। কিংবা কেউ ভাগিয়েও এনে থাকতে পারে। মেয়েটার ভেতরে গুণও ছিল। নাচ জানত, গানের গলাও বেশ ভাল ছিল। আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম মেয়েটাকে দেখে। এ-লাইনের সব পরিণতিই তো আমি জানি। সে সময়ে গুটি তিনেক যাত্রাপার্টির ফাইন্যান্সার ছিলেন উত্তরপ্রদেশী এক ধনী ভদ্রলোক। নাম পদবী কিছু এখন আর মনে নেই, তবে আমার

সঙ্গে খুব দোস্তি ছিল। আমরা রাজাভাই বলে ডাকতাম । বাঙালির কালচারের ওপরে খুব ঝোঁক ছিল, চমৎকার বাংলা বলতেন। ঢাকা জেলার ভাষা তো এমন বলতে পারতেন, ধরে কার সাধ্য। উনি আমাকে দিয়ে মেয়েটির একটা ছবিও করিয়ে নিয়েছিলেন বিজ্ঞাপনের জন্যে। কিন্তু সুবিধে হল না, মেয়েটা থাকল না, থিয়েটারে চলে গেল। সেখানেও জমাতে পারল না। তারপর বম্বের দিকে বোধহয় চলে যায়। অবনীবাবু থামলেন।

'আমি বললাম, তা মেয়েটাব আর কোনও সংবাদ আপনি জানেন না? অবনীবাবু দম নেবার জন্যেই থেমেছিলেন, নিজে থেকেই আবাব শুরু কবলেন—বছব পঁচিশ-তিরিশ পরে মেয়েটিকে ফেব দেখলাম। দেখেই চমকে গেলাম, নামটাও মনে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তুমি ভাবছ, সামনাসামনি, তা কিন্তু নয। বন্ধুবান্ধব মিলে হিন্দি একটা হিট ছবি দেখতে গিযে সিনেমাব পর্দায় তাকে দেখলাম। আশ্চর্য ব্যাপার, হিন্দি গাযিকাদের সঙ্গে পাল্লা দিযে একটা বাঙালি মেযে শোরগোল ফেলে দিযেছে ভাবাই যায না। প্লে-ব্যাকেব গানে ঠোঁট মিলিযে নয, গান গাইছে নিজেব গলায। মনে হল সত্যি, কেবল নামে নয, কাজেও মেযেটা আগুন, চোখ-ধাঁধানো আগুন। আমি সিনেমাব তেমন কিছু বুঝি না, হযতো একটু আবেগপ্রবণই হয়ে পড়েছিলাম বলতে পারো। কারণ পঁচিশ-তিরিশ বছব আগে যাব ছবি এঁকে ব্লক বানিয়ে দিয়েছিলাম তার ব্যাপাবে একটা নস্টালজিযার টান থাকতেই পারে।

'আমি বললাম, আপনি কি বহ্নিদেবীর কথা বলছেন? অবনীবাবু মাথা নেড়ে বললেন, ইযেস, ঠিক ধরেছ। আমি সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা আপনাদের রাজাভাইয়ের পদবী অগ্নিহোত্রী ছিল না তো? অবনীবাবু সবিস্ময়ে বললেন, তুমি আমাকে তাজ্জব করে দিলে বাবা। অনেক পুরনো কথা তুমি মনে পড়িযে দিলে আজ। হ্যাঁ, অগ্নিহোত্রী, বিজয়বিক্রম অগ্নিহোত্রী। আমি আর সময দিলাম না, বললাম, বহ্নিদেবীরও পদবী যেমন অগ্নিহোত্রী ছিল একসময়। তবে বিজয়বিক্রমের—

'অবনীবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, না। তুমি যা বলতে চাইছ তা নয়। খুব স্যাড ব্যাপার, তাই তোমাকে প্রথমে বলতে চাইনি। বিজযের এক ভাইপো ওকে বিয়ে করেছিল। কানাঘুষো শুনেছিলাম, ওই ছোকরাই মেয়েটাকে বের করে এনেছিল বাড়ি থেকে। কিন্তু সেই পাপের বন্ধন টেকেনি। খুব অল্প দিনেই স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল দুজনের। তারপর অনেক অন্ধকার আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে বহ্নি আবার ভেসে উঠেছিল ওপরে। অবনীবাবু থামতেই আমি উঠে পড়লাম। আমার চোখের সামনে থেকে কালো পর্দা সরে যাচ্ছিল একটু একটু করে। একটা ঘোরের মধ্যেই বাড়ি ফিরলাম। ফিরেই শুনলাম তুই ফোন করেছিলি, না তুই নোস, লালু। লালু ফোন করেছিল।'

শচী হাত বাড়িয়ে বলল, 'দাও গুরু, তোমার একটা সিগারেট দাও।'

এ-বাড়িতে আজ সবই যেন একটু সকাল-সকাল।

কাল খুব ভোরে বেরিয়ে যাবে তাই সুপর্ণাও রাতে কোনও কাজ রাখেনি। দু পাতা যে পড়বে তাও না। পাশেই মাসি-মেসোর ঘর। দরজা আধভেজানো রয়েছে। কিন্তু টিউব লাইটের আভায় নিজের ঘরের সবকিছু সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে ভাবল কটা বাজে দেখা দরকার। হাতঘড়িটা ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রাখা আছে। সেদিকে মাত্রই দু পা এগিয়েছে, অমনি পাশের ঘরের আলো টুক করে নিবে গেল।

সামান্য সময়ের জন্যে সুপর্ণা একবারে ফাঁপরে পড়ে গেল। উত্তুরে হাওয়ার দাপটে বাইরের দিকের জানলা বন্ধ, ঘর বেবাক অন্ধকার। এক-এক চিলতে ঘষা কাচের ভেতর দিয়ে সামান্য একটু আভামত আসছিল, চোখ সয়ে যেতে দেখতে পেল। দু ঘরের মাঝের দরজাটা পুরো টেনে দিয়ে আলো জ্বালবে ভেবেছিল কিন্তু তার আর দরকার হল না।

তক্ষুণি ভেতরের কোনও ঘর থেকে টং-টং করে খুব ক্ষীণ শব্দে রাত ন-টা বাজল। বিশ্বাস হচ্ছিল না। একবার মনে হল গুনতে ভুলই করেছে,পরে মনে হল, না। আজ সবই খুব সকাল-সকাল। দরজাটা টেনে দিয়ে সুপর্ণা আন্দাজে এক পা-এক পা করে বিছানার দিকে এগোল।

কলকাতায় এসে সুপর্ণা এইভাবে আটকে পড়বে ভাবেনি। বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে এসে পড়ে গেল বিশ বাঁও জলে। বিপত্তি আর কাকে বলে। এ-বাড়ির গুষ্টিসুদ্ধ মানুষ যেন তার জন্যেই আধিব্যাধি জমিয়ে বসেছিল, তর সইছিল না, এই ডাক্তার-ছুঁড়ির এসে পড়ার শুধু অপেক্ষা। কথায় বলে, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধানই ভানে। কিন্তু কথাটা সে কৌতুক করেই ভেবেছিল, কোনও ক্ষোভ কিংবা আক্ষেপ নিয়ে না। কারণ সে যদি ধান ভানার যন্তর না-ই হত তা হলেই কি এই অসহায় মানুষগুলোকে সে ফেলে রেখে পালিয়ে যেতে পারত? মল্লিকার সঙ্গে তার কি সেই সম্পর্ক! তার চেয়ে বছর তিন-চারের ছোট হলেও মল্লিকা কেবল তার মাসতুতো বোনই নয়, অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতই। বিয়ে করবে না বলে গোঁ ধরে বসেছিল এতকাল। বিয়ের কথা তুলতেই বলেছিল, তুমিও তো স্যার বেলাইনের লোক।

সুপর্ণা কৃত্রিম ধমকের সুরে বলেছে, তুই থাম মুখপুড়ি, আমার কেস আলাদা। মল্লিকা কম ফিচেল নয়, নিরীহ মুখে কথাটা লুফে নিয়ে বলেছে, তোমার কি কেস গো রানুদি? লভ কেস, না ফ্লপ কেস? মুখের মত জবাব দিতে একটু সময় লেগেছিল সুপর্ণার। বলেছিল, আমার হচ্ছে গিয়ে স্যুট কেস, যদি কখনও কাউকে স্যুট করে, ভেবে দেখব। মল্লিকা বলেছিল, আমিও।

তো সেই মল্লিকা এতদিনে তার পার্টনার খুঁজে পেয়েছে হয়তো। বর আসছে আমেরিকা থেকে, ছোকরার নাকি ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ার। মল্লিকার ভাষায় জুয়েল থীপ্। উড়ে এসেই নিয়ে পালাবে। তাই সুপর্ণাকে কাজকর্ম ফেলে আসতেই হল। আবার কবে দেখা হবে কে জানে!

ভিডিও ফিল্মে বিয়ের ছবি রেখে মল্লিকা চলে গেল। মেয়েশূন্যি বাড়ি খাঁ-খাঁ, বিসর্জনের পরের অবস্থা। মাসিমা আঁকড়ে ধরলেন সুপর্ণাকে, আর দুটো দিন থেকে যা মা। আর দুটো দিন। বলার দরকার ছিল না, সেই রাত থেকেই অসুখের ঘনঘটা লেগে গেল। মেসো মাথা ঘুরে পড়ে যেতে যেতে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন। মাইল্ড স্ট্রোক, সেরিব্রাল। মাসিমা কদিন থেকেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন, সুপর্ণা ধরে ফেলল ব্যাপারটা। পা ফুলে ঢোল। সেপটিক। সুপর্ণা আঁতকে ওঠে, করেছ কি মাসি! আর ক'ঘণ্টা দেরি হলেই গ্যাংগ্রিন হয়ে যেত। তখন তোমার পা কেটে ফেলেও বাঁচানো যেত না। রক্ত পরীক্ষা করিয়ে দেখা গেল হাই সুগার। পরিবারটা ছোট না। ওদিকে আরও দুজন শয্যা নিয়েছে, অ্যাপেনডিসাইটিস আর সাইটিকায়। সিরিঞ্জ হাতে নিলেই মাসিমার মুখ শুকিয়ে যেত, বলতেন, তোর প্রাণে কি এতটুকু মায়াদয়া নেই? সুঁই ফুঁড়ে ফুঁড়ে ঝাঁজরা করে দিলি, একবার আমাকে, একবার মেসোকে। ওষুধ বলতে কি ওই একটা দ্রব্যই তোর জানা আছে মা?

সুপর্ণা তেরচা হেসে বলেছে, ঠিক ধরেছ মাসি। আমি এ-বাড়িতে ছুঁচ হয়েই ঢুকেছি। বালাই ষাট। ওকথা বলে না—মাথায় হাত রেখে মাসিমা বলেছেন, এবার সংসারী হ।

রাত কত হল কে জানে! বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিল সুপর্ণা। ঘুম আজ বোধহয় চোখের ত্রিসীমানায় নেই। টুকরো টুকরো কত কথা, কত ভুলে-যাওয়া ব্যাপার স্মৃতির তলায় যে ধরা ছিল কে জানত! উল্টোপাল্টা ভেসে উঠছে থেকে থেকে। মল্লিকা চলে গেছে, তারও ফিরে যাবার সময় হল এবার। এ-বাড়ির বিপদ একরকম কেটেই গেছে বলা যায়। তার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। মল্লিকা নেই, কিন্তু মল্লিকার অনেক স্মৃতি, অনেক ছোঁয়া আর সুগন্ধ ছড়িয়ে আছে এই ঘরে, এই বিছানায়। তার কলকণ্ঠ হাসি, কথা, হয়তো এই ঘরের বাতাসে এখনও ভেসে বেড়াচ্ছে। মনে পড়ল বিয়ের আগের দিন সুপর্ণা এসে এ-বাড়িতে সবে পৌঁছেছে। একটু নিরিবিলি হতেই মল্লিকা বলল, রানুদি, তোকে একটা জিনিস দেখাব বলে কবে থেকে অপেক্ষা করে আছি। চমকে যাবি দেখে। সুপর্ণা হেসে ফেলেছিল, কী এমন জিনিস যে দেখেই চমকে যাব? তোব বরের ছবি নাকি? মল্লিকা কোনও কথা না বলে একটুকরো কাগজের কাটিং

ওর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল, এই লোকটা কে রে? তোদের কলেজের সেই হিরো না? নামটা দেখে সুপর্ণা সত্যিই চমকে উঠেছিল, নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারেনি। কতকাল যার খবরের জন্য সে ভেতরে ভেতরে উন্মুখ আর বিষণ্ণ হয়ে ছিল, সে কিনা একেবারে নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বরসুদ্ধ চোখের সামনে হাজির! মল্লিকার কাছে ধরা পড়তে চায়নি তবু। মনের চাঞ্চল্য গোপন করে ঠোঁট উল্টে বলেছিল, ধুর, কে না কে! নামটা অবশ্য মিলে যাচ্ছে। হাতের কাছের ফোনটা দেখিয়ে মল্লিকা বলেছে, তাহলে বাকিটুকুও মিলিয়ে ফেল। একটা রিং করার তো মামলা, এখুনি ফয়সালা হয়ে যাবে। সুপর্ণা মাথা নেড়ে বলেছে, খেপেছিস! হ্যাঁ, খেপেছি—বলেই মল্লিকা, কিছু বুঝতে পারার আগেই, ফোনটা তুলে নিয়ে ডায়াল করতে শুরু করে দিল। আমার ওপর ছেড়ে দে রানুদি, কান পেতে কি শুনতে শুনতে একটা চোখ টিপল মল্লিকা, রিং হচ্ছে...আমি কিন্তু একটু নাটক করব। তা নাটকই করে গেল মল্লিকা, একতরফা, যেন ভাবাই ছিল কী বলবে। তবু ভেঙে ভেঙে বলছিল, সুপর্ণা বুঝতে পারছিল ওপাশ থেকে কথা আসছে, বাধা পাচ্ছে মল্লিকা। একসময় ফোনটা রেখে দিয়ে মল্লিকা হেসে কুটোপাটি হয়ে বলল, কেবলুস দি গ্রেট!

আহত সুপর্ণা শুধোল, 'কী? একই লোক?'

'না। একই লোকের বন্ধু। একই লোক কোথায় যেন বেরিয়েছে।'

'অ্যাই, ইয়াকি করিস না। তুই সিওর বলছিস?'

'অলমোস্ট। সিওরের কাছাকাছি বলতে পারিস। এবার তোর পালা।'

'তার মানে?'

'তার মানে, চলে যা। সী ইয়োরসেল্ফ। ঠিকানাটা বোধহয় খেয়াল করিসনি, পাঁচ মিনটের হন্টন। এই প্যারালাল, পাশের রাস্তা। ঘুরে যেতে হচ্ছে তাই, নইলে গোটা দুই-তিন ছাদ ডিঙোলেই বাড়ি।'

'আমি যাব! কোন মুখে? তুই যা কাণ্ড করলি, তার পরেও?'

'হ্যাঁ, তার পরেও। আমি কি তোমার নাম করেছি না চেনা-দিয়েছি? ও তো অন্য গপ্পো, অন্য ব্যাপার। তোমাকে ভাবতেই পারবে না। এত কাছ থেকে কি কেউ ফোন করে? বলি কি, আজই এক চক্কর ঘুরে এসো সন্ধেবেলা।'

'আচ্ছা সে পরে একদিন না হয়—।'

মল্লিকা মাথা নেড়ে বলেছিল, 'না, আজই।'

মল্লিকা কী ভাবত, কী ভেবেছিল সে জানে না। তবে অতটা কিছু ছিল না, কী থাকবে? অতনু মজুমদারের নাম একসময় ওর মুখে মল্লিকা হয়তো অনেকবার শুনেছে, কিন্তু সে অন্য কারণে। একটা মানুষ হঠাৎ হারিয়ে গেলে,

নিপাত্ত' নিখোঁজ হয়ে গেলে, সেই বিশেষ একটা মানুষের জন্যে স্বাভাবিক যে কৌতূহল থাকে, হয়তো তার থেকে কিছুটা বেশিই। বেশিই কারণ সে নিজে ইনভলভড্। সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে অতনু যদি ঝাঁপিয়ে না পড়ত তাহলে সেই সমাজে সম্মানিত অথচ দুশ্চরিত্র মদ্যপ মানুষটির হাত থেকে সে রেহাই পেত না। শুধু ইজ্জত নয়, কেলেঙ্কারির হাত থেকেও অতনুই বাঁচিয়েছিল। তাকে এক ধাক্কায় ঘরের বাইরে বের করে দিয়ে, সরে পড়তে বলে সে ভালই করেছিল। অমন ভয়াবহ কাণ্ডের পরও আসল কারণটা কেউ জানতে পারেনি। থানা-পুলিশ অনেক দূর গড়ালেও, আশ্চর্যের বিষয়, কোনও পক্ষ থেকেই তার নাম কখনও ওঠেনি। ওঠেনি বাঁচোয়া, উঠলে, বাবার কানে গেলে তার ডাক্তারি পড়ার ওখানেই ইতি হয়ে যেত। আসলে সুপর্ণার বাবার বদলির অর্ডার আগেই এসে গিয়েছিল, পুরুলিয়ায় বদলি হয়ে যাচ্ছিলেন, বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে সুপর্ণার ট্রান্সফারের ব্যবস্থাও কাগজে কলমে পাকা। এই অবস্থায় কটা দিন ভয়ে কাঁটাসার হয়ে ছিল সে। অতনুর ব্যাপার নিয়ে কলেজে তখন তুমুল হৈচৈ চলেছে। অতনু ভ্যানিশ, কিন্তু তার কেরিয়ার যে বরাবরের মত খতম একথা কানাঘুষোয় শুনতে পাচ্ছিল সুপর্ণা। কিন্তু তার জন্যে এত বড় স্যাক্রিফাইস যে করল, অফিস থেকে তার ঠিকানা সংগ্রহের দুঃসাহস তার হয়নি। দেখা পেলে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুশোচনার হাত থেকে অন্তত মুক্তি পেতে পারত। আর সেটা আরও এইজন্যে যে অতনুর সঙ্গে তার মাখামাখি দূরে থাক, সিনিয়ার জুনিয়ারদের মধ্যে যেটুকু ভাবসাব, চেনা-পরিচয় থাকে তাও ছিল না। মেয়েদের ব্যাপারে ও একেবারেই উদাসীন, এড়িয়ে চলা গোছের ছেলে ছিল। দূর থেকে সুপর্ণা ওকে দেখত, হয়তো পছন্দও করত। সে খানিকটা ওর চেহারা আর সকলের থেকে অন্যরকম বলেই।

বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে সুপর্ণা পাশ ফিরল। না, ঘুম নয়, বুঝি অন্য কিছু এবার তাকে ছুঁয়ে ফেলেছে। যেন খুব কাছের কিছু দেখছে এমনিভাবে সে তীব্র চোখে অন্ধকার ফুঁড়ে তাকিয়ে থাকল। আলোর চেয়ে অন্ধকারে বুঝি অনেক কিছু বেশি দেখা যায়। নিজেকেসুদ্ধ।

প্রথম সাক্ষাতের ছবিটা যেরকম ভাবা ছিল, মিলল না। অতনু মজুমদার বাড়ি ছিল না। দরজা খুলে পঞ্চাশ পেরোনো কাজের লোকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল খানিকক্ষণ। তারপর ভেতরে নিয়ে বসাল। সরল, ভালমানুষ, বিশ্বাসী টাইপের লোক, নাম সুবলসখা। অতনু নাকি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে বলেছে। এই তাড়াতাড়ি কথাটা অবশ্য অর্থহীন, সময়ের দিক থেকে অনিশ্চিত, এর ওপর নির্ভর করে অপেক্ষার কোনও মানে হয় না। তবু সুপর্ণা বসল।

সে বুঝতে পেরেছিল বাড়িতে দ্বিতীয় প্রাণী কেউ নেই, সুতরাং এও একটা সুযোগ। বুড়োর সঙ্গে খানিকটা উল্টোপাল্টা বকবক করলে অতনু সম্পর্কে হালফিল কিছু খবর জানা যেতে পারে। তার অনুমান মিথ্যে হল না। সুবলদাদা বলে ডাকতেই বুড়ো গলে গেল। জানা গেল অতনুও ওকে সুবলদাদা বলেই ডাকে। দু-চারটে প্রশ্ন করতেই সুবলসখা আর নিজেকে সামলাতে পারল না, অনেক খবর উগরে দিল গড়গড় করে। জ্ঞাতব্যের চেয়ে অনেক বেশি জানা হয়ে যাবার পর সুপর্ণা লঘু পায়ে চক্কর খেয়ে বেড়াচ্ছিল ঘরের মধ্যে। এটা নাড়ছিল, সেটা দেখছিল, আর সেই সঙ্গে হরেক কৌতূহল। লেখার টেবিল, টাইপরাইটার, ক্যামেরায় তোলা পোর্ট্রেট। বইপত্র। বুঝতে পারছিল সুবলসখার অস্বস্তি হচ্ছে, এটা সেটায় হাত দেওয়া পছন্দ করছে না, কিন্তু ঠিক মুখ ফুটে বলতেও পারছে না। শেষে বুদ্ধি করে চা করে নিয়ে এসে সোফায় বসাল। অবশ্য সুপর্ণা তখন নিজে থেকেই চলে যাবার কথা ভাবছিল। অনেকটা সময় ব্যয় হয়েছে, চা খেতে খেতে আর না হয় পাঁচ মিনিট দেখবে।

অতনু এসে পড়ল সেই সময়, দরজার বেল বাজার আওয়াজ তার কানে গিয়েছিল। তারপর ওর গলা, এতকাল পরেও ঠিক চেনা ঠেকল কানে, সামান্য ভারী। ও নিজেকে অ্যানাউন্স করতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। দেখেই চিনল। কিছু কিছু চেহারা এই রকমই, দেওয়ালে টাঙানো খোলা তরোয়ালের মত, একই জায়গায় সেঁকে থাকে। অতনুর হাতে একটা প্যাকেট, মুখময় চিন্তার ছাপ, কেমন যেন ডিসটার্বড্। কিন্তু চাউনিতে চিনতে পারার কোনও লক্ষণ নেই। সুপর্ণার একটু লাগল বৈকি। অতনু যে মনের কোণেও তাকে ঠাঁই দেয়নি এতটা সে বিশ্বাস করতে পারেনি। বরং কতটা মনে রেখেছে, যাচাই করে দেখার জন্যে ইচ্ছে করেই নিজের ডাকনামটা বলেছিল। অতনু মাথা নাড়ল এবং জানাল কোথাও ভুল হচ্ছে নিশ্চয়। তারপর দুম করে যখন টেলিফোন করার কথা তুলল তখন সত্যিই সুপর্ণার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। জেদের বশে, ফোনটা যে সে-ই করেছে এবং বেশ করেছে, কথাটা সে বলে দিল। কিন্তু তার একবারের জন্যেও মনে হল না, অতনুর চেহারা না বদলালেও সে নিজে আর আগের চেহারায় নেই, বদলাতে বদলাতে সে এখন আগাপাশতলা অন্য মানুষ। নিজের মনগড়া উত্তেজনার বশে মানুষ কত সহজেই একচক্ষু হরিণ বনে যায়।

তারপর হাসপাতালের প্রসঙ্গ একেবারে মন্ত্রের মত কাজ করল। তার চোখের সামনেই রাগী, উত্তেজিত, একগুঁয়ে অতনু মজুমদার একেবারে তালগোল পাকিয়ে অন্য মানুষ হয়ে গেল। এতই আচমকা যে পলকের জন্য আত্মবিস্মৃত সুপর্ণা ওর হাতের মুঠোর মধ্যে কেঁপে শিউরে অবশ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে তো

মুহূর্তের জন্যে। তার অভিমান, তার এতক্ষণের অপমানবোধ তাকে অপ্রকৃতিস্থ আর অন্ধ করে তুলেছিল। মনে হয়েছিল এবার তার শোধ নেবার পালা। তাচ্ছিল্যের হাসি আর শ্লেষে বিঁধিয়ে অতনুর আবেগ-উচ্ছ্বাসকে হতবাক করে দিয়ে সে চলে এসেছিল। আসার সময়, ভুলে চলে-আসা জিনিস ফিরিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে যেন সব শোধবোধ করে এসেছে। জুতোর হিলের খর শব্দ তুলে সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় নামতে না নামতেই কোথা থেকে একরাশ কান্না এসে ঘিরে ধরেছিল সুপর্ণাকে। ভুল বুঝতে পারলেও আর ফিরে যাবার উপায় ছিল না।

সেই রাতে বিয়ের আসর আর বাসরের হৈ-হল্লা-হাসির মধ্যে এক ফাঁকে মল্লিকা ওর কানে কানে শুধোল, কী?

সুপর্ণা অনেক চেষ্টায় গলায় হাসির ছটা এনে বলল, হিঃ।

ব্যস, ওতে যা বোঝাবার তাই বোঝাল। মল্লিকা ধরেই নিল সুপর্ণার অভিযান সফল হয়েছে, নইলে সঙ্কেতে অমন খুশির শব্দ ওর গলা দিয়ে বেরোত না। কিন্তু ওর মনের মধ্যে ছটফটানির শেষ ছিল না। যত সময় যাচ্ছিল ততই যেন চারপাশের আনন্দ উৎসবের মধ্যে সুপর্ণা একদম একা হয়ে যাচ্ছিল। নিজের দুর্বোধ্য হঠকারিতায় আর রূঢ় আচরণে ভেতরটা যেন পুড়ে যাচ্ছিল তার। পরদিন সকালে বর-কনে বিদায় নেবার পর সবাই যখন এক জায়গায় জড়ো হয়েছে, চোখ মোছামুছির পালা চলেছে, থেকে থেকে দু-একটা পুরনো কথা বলে একে অপরের স্মৃতি উসকে দিচ্ছে তখন টেলিফোনের ঘরটা একবারে ফাঁকা দেখে সুপর্ণা পায়ে পায়ে ফোনের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ডায়াল করতে অস্বস্তি বোধ করছিল, খুব একটা ভরসা পাচ্ছিল না। অতনু তাকে কিভাবে নেবে তার ঠিক কি! যে পরিমাণ আহত আর অপমানিত হয়েছে কাল রাত্তিরে, যে কোনও পুরুষের পক্ষেই তা হজম করা শক্ত। এত শীগগির ভুলে গেছে মনে হয় না। ফোনে সুপর্ণাকে ও কিভাবে রিসিভ করবে, সুপর্ণার নাম শোনামাত্র কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে, সুপর্ণা কোনও কথা বলার সুযোগ পাবে কিনা অনুমান করতে পারছিল না। তবু শেষ পর্যন্ত ডায়াল ঘোরাল, ওপক্ষের হ্যালো শোনার অপেক্ষায় দুরু দুরু হয়ে থাকল। কিন্তু কপাল এমনই যে, সেটা মন্দের ভাল, নাকি ভালর মন্দ বলে যদি কিছু থাকে তাই, তক্ষুণি বুঝতে পারল না। অতনু বাড়ি ছিল না, সুবলদাদা ফোন ধরল। বলতে গেলে খুশিই হল, মানুষটা সরল সাদামাটা, কোনও ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে নেই। কিন্তু অতনুর মন মেজাজ-মর্জির কোনও আভাস পাওয়া গেল না। হয়তো জানেই না লোকটা। দু-চারটে কথা এদিক সেদিক করে শেষে সন্ধের পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট জানিয়ে রাখতে বলে ফোন রেখে দিল সুপর্ণা। রেখে দিয়েই মনে হল কাজটা ঠিক

হল না। খবর না দিয়ে হুট করে হাজির হলে যদি বা দেখা হত, এভাবে তো হবেই না। অতনু ঠিক বাড়ি থেকে সরে পড়বে। সুপর্ণা মনস্থির করে ফেলল কি করবে।

দরজা খুলে আমাকে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল অতনু। কিন্তু কেন? এই অসময়ে এসে পড়ায় ওর প্ল্যান কি ভেস্তে গেল, সেইজন্যে? কথাগুলো এই অন্ধকার ঘরে নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই সুপর্ণা বলল। কিন্তু না, তা নয়, আপন মনেই ফের মাথা নাড়ল সে। অতনু বোধহয় অন্য কোনও ব্যাপারে এতই বিচলিত ছিল যে তার দিকে মনোযোগ দেবার মত অবস্থা ছিল না সে সময়। ওর মনের ভাব পরখ করতে সুপর্ণা সসঙ্কোচে ফিরে যাবার ভান করেছিল। স্বাভাবিক অভ্যেসেই অতনু বাধা দিয়েছিল, কিন্তু তাতে যেন প্রাণ ছিল না। ভেতরে আসতে বলার খেয়ালটুকুও না। কথার ছলে সেটা সুপর্ণাকেই আদায় করে নিতে হয়েছিল। তবে গোড়া থেকেই অতনু যে 'আপনি-তুমি'র গা বাঁচিয়ে চলছে, কোনও সম্বোধনের ধারে-কাছে যাচ্ছে না, এই সচেতন ভাবটা সুপর্ণাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। কিন্তু নকল চেষ্টা বেশিক্ষণ চলেনি, একটু বিচলিত হতেই অবরোধ ভেঙে পড়েছে, তালেগোলে আপনি-তুমি খিচুড়ি পাকিয়ে গেছে। স্লিপ অব টাং বলে তাকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করলেও, যে মুহূর্তে সুপর্ণা বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা বিরূপতা নয়, নিছকই আবেগ এড়ানোর সঙ্কোচ, ওকে আর পাশ কাটাতে দেয়নি। সেদিন ওভাবে হাত ধরে ফেলার ব্যাপারে এক ধরনের অপরাধবোধ অতনুর মনের মধ্যে বিঁধেছিল, ভুলতে পারছিল না। সুপর্ণা ওকে সহজ করে দেবার জন্য খুব অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে পাল্টা আক্রমণ সবে শুরু করেছে, অমনি পাশের ঘরে সেই দুর্ঘটনাটা ঘটল।

অস্বাভাবিক উদ্বেগে অতনুর ছুটে যাওয়া দেখে সুপর্ণাও আর চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝতে পেরেছে মূর্তির ব্যাপারটা অতনু ওর কাছ থেকে আড়াল করতে চায়, সুপর্ণা আর দাঁড়িয়ে থাকেনি। অতনু ফিরে এসে যতই হাল্কা করে দেবার চেষ্টা করুক, পোর্ট্রেট মডেল বলে সহজ ব্যাখ্যা দিক, কয়েকটা ব্যাপারে সুপর্ণার চোখ খুলে গিয়েছিল। এই মূর্তিটার কোনও গভীর রহস্য আছে, নইলে এভাবে লুকিয়ে ফেলার দরকার হত না। কাল থেকে এটাই তাহলে অতনুকে উদ্বিগ্ন অন্যমনস্ক আর অস্থির করে রেখেছিল। সুপর্ণা এই ঘটনার সাক্ষী হয়ে যাওয়ায় নার্ভাস অতনু আগেকার কথার খেই হারিয়ে ফেলেছিল। সুপর্ণা মজাটা দেখছিল, ইচ্ছে করে আগেকার প্রসঙ্গ ফিরে তোলেনি। আর তাতে ভালই হয়েছে, যা হোক কিছু দিয়ে কথা শুরু করতে গিয়ে অতনু ওর চেহারা বদলের কথা তুলে নিজেই ফেঁসে গেছে। সুপর্ণা ওকে

নাগালের মধ্যে, হাতে পেয়ে গেছে। আর একটু একটু করে অতনু তার দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছে। ঠাট্টার ছলে মানুষ নিজের অজান্তেই নিজেকে প্রকাশ করে ফেলে এক একসময়। অবচেতন মনের তলানি হঠাৎই উঠে আসে ভেতর থেকে। ওস্তাদ তবলচির মত সুপর্ণা শুধু জায়গামত ঝোঁক যুগিয়ে গেছে। অতনুকে অনেকখানিই পড়ে ফেলেছিল সে। মেয়েদের ব্যাপারে ভীষণ শাই, কিছুটা ছেলেমানুষও বটে। যে কথাটা জোরের সঙ্গে সোজাসুজি অন্য কোনও পুরুষ বলতে পারত, ও পারল না। সুপর্ণার একটু মায়াও হচ্ছিল ওর জন্যে। সুপর্ণা বিবাহিত কিনা, তার কোনও প্রেমের ব্যাপার আছে কিনা জানার জন্যে ঘুরপাকের কথা বলছিল। অনেক বোকা মানুষ যখন মরিয়া হয়ে ওঠে তখন তাদের এই রকমই স্মার্ট মনে হয়। সব বুঝেও সুপর্ণা তার চারপাশ রহস্যময় করে রেখেছিল। কারণ শেষ পরীক্ষাটুকু তখনও বাকি। ঈর্ষাই বোধহয় প্রেমের সেই অ্যাসিড টেস্ট!

কিন্তু পালাবার কথায় অতনু তখন ওরকম চমকে উঠেছিল কেন? ও কি সত্যিই আবার পালাবার তালে রইল? সুপর্ণা এই প্রথম একটা বড় করে হাই তুলল। নাঃ, আর এখন ভাবতে পারা যাচ্ছে না, রাত কত কে জানে! পাশ ফিরে শুতে শুতে অস্ফুট গলায় বলল, তুমি আর সে রানুটি নেই, ইউ আর রিয়্যালি চার্মিং। নাও এবার ঘুমোও।

সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে শচী মিনিটখানেক কি চিন্তা করল। অতনু ওর দিকে ফাঁকা চোখে তাকিয়ে ছিল। সেও চিন্তামুক্ত ছিল না। দূরের কোনও ধোঁয়াটে রাস্তার দিকে যেন সে তাকিয়ে ছিল। মৃত্তিটা চলে গেছে যাক, কিন্তু একটা সূত্র হাতছাড়া হয়ে গেল এই দুঃখ। মৃত্তির ব্যাপারেই অটো-রিকশার সেই রহস্যময় প্যাসেঞ্জার তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, সে বিষয়ে এখন আর কোনও সন্দেহ নেই। কারণ মৃত্তির পিছনে যে আরও লোক লেগেছে সেকথা তার অজানা ছিল না। সে নিজে বোধহয় মৃত্তির ব্যাপারে আগ্রহী ছিল না। যদি তাই হয় তাহলে তার উদ্দেশ্য কি? অতনুর খুব কাছাকাছি থেকে তাকে অনুসরণ করছিল কেন? সে কি এখনও তাই করে চলেছে? ছদ্মবেশে আড়ালে সে কি সত্যিই তার শুভানুধ্যায়ী? এরকম কোনও শুভার্থী তার আছে, অনেক ভেবেও অতনু তেমন কারও হদিস করতে পারেনি। নাকি লোকটা অতনুকে টোপ হিসেবে নিয়েছে, তার আসল লক্ষ্য অন্য মানুষ। সে বিশেষ কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে অতনুর গায়ে গায়ে থেকে। তবে এটা ঠিক, একাধিক দল এই গোলমালে মাঠে নেমে পড়েছিল। একজন চেয়েছিল সন্দীপের ব্যাপারে জড়িয়ে

দিয়ে তাকে ফাঁসাতে কিন্তু হাতে-নাতে ধরিয়ে দিতে পারেনি। তবে যে কোনও কারণেই হোক সন্দীপকে খুন করা হয়তো জরুরি হয়ে পড়েছিল। আব সে কাজটা নির্ভুলভাবেই সমাধা করেছে। খুনী তার নিজের অস্তিত্ব চাপা দিতে অতনুর মূর্খামিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবে। রক্তমাখা হাতের ছাপ একেবারে অকাট্য প্রমাণ। হত্যার মুহূর্তে কেউ সেখানে উপস্থিত ছিল, এবং বিশেষ কেউ একজন যে ঘটনাস্থলে ছিল না—এটাই এখন তার স্বপক্ষে দুমুখো সূত্র। হঠাৎ অতনু এত আচমকা কথা বলে উঠল যে শচী চমকে গেল, তার হাত থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা মাটিতে পড়ে গেল।

'সেই ছোকরার নাম কিরে?'

'কোন ছোকরার?' শচী অবাক।

'সন্দীপের ভাইপো না ভাগনে কি যেন বলেছিলি! ঝিল রোডের বাড়ি যে মনে মনে আধখানা গিলে বসে আছে।' সিগারেটটা শচী কুড়িয়ে নেবার তাল করছিল, অতনু নতুন প্যাকেট বাড়িয়ে দিল।

'অ, বুঝেছি। ভাইপো। প্রাণগোবিন্দ না কি যেন নাম। আমার নোট করা আছে।'

'খুনের ব্যাপারে ওর মোটিভ থাকতে পারে।'

'পারে হয়তো। আমি ঠিক অতটা তলিয়ে ভেবে দেখিনি। তবে লেগে থাকব।'

'কাল্পনিক শত্রুতা ছাড়া আমার কিন্তু কোনও মোটিভ নেই। মানে প্রমাণ হবে না। কারণ সন্দীপের মৃত্যু আমাকে আর্থিকভাবে লাভবান করছে না।'

'ও গুরু! তুমি এতক্ষণ এই ভাবছিলে?' সিগারেট ধরিয়ে নিতে নিতে শচী বলে।

'ভাবছিলাম অনেক কিছু। তবে এটাও ভাবনা।'

'এই সব উল্টোপাল্টা ভাবনার ভূত মাথা থেকে তাড়াও তো!'

'পারছি কই!' চিন্তাবিষ্ট অতনু বলল, 'আসলে আমার নিজের ব্যাপারটা নিজের কাছে পরিষ্কার রাখা দরকার।'

'আমি অবশ্য ভাবছিলাম অন্য কথা।'

সজাগ চোখে অতনু ওর মুখের দিকে তাকাল। শচী বলল, 'তুমি যতই বলো, আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না। আমার মনে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।'

'কী ব্যাপারে?'

'এই ব্যাপারে যে, অবনী কর্মকার তোমাকে সব সত্যি কথা বলেননি। যতই স্মৃতিভ্রংশ আর না-জানার ভান করুন ভদ্রলোক অনেক কিছু জানেন।'

অতনু মাথা নেড়ে বলল, 'যাঃ, তোর ধারণা ঠিক না। মিথ্যে কেন বলবেন?'

'মিথ্যে বলেনি বলছ! ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো বুঝতে পারবে। দেবীদিদির ব্যাপারে তিনি অনেক কিছু জানেন। সেই কথাটা মনে করে দেখো, লোকটা বলেছিলেন, পাঁচিশ-তিরিশ বছর পরে মেয়েটাকে আবার দেখলাম। তার পরেই কথা ঘুরিয়ে বললেন যে, সামনাসামনি নয়, সিনেমার পর্দায়। আর দেখামাত্র নামটা মনে পড়ে গেল, আশ্চর্য! প্রথম কথাটার গড়নের মধ্যেই কি গোলমালের গন্ধ পাচ্ছ না? পাবে। কথাটা মুখ ফসকে ছাড়া ওভাবে আসতেই পারে না। তবু যদি এর মধ্যে কোনও ফাঁক দেখতে না পাও তবে পুরো ব্যাপারটা ভেবে দেখো। একটা হিট ছবি বন্ধুবান্ধব মিলে দেখতে গিয়েছেন কিন্তু সে ছবির নাম মনে নেই। আর যে বাঙালি নায়িকা নাচে-গানে বাজার ক্যাপচার করে তুলেছে তাকে পর্দায় দেখার আগে পর্যন্ত জানতেন না। সিনেমার পোস্টারে তার ছবি দেখেছেন, নাম দেখেছেন, লোকের মুখে, কাগজের বিজ্ঞাপনে আর সমালোচনায় তার কথা জেনেছেন এটাই তো স্বাভাবিক। তাছাড়া স্যাড ব্যাপার বলে মেয়েটার কথা নাকি তোমাকে আগে বলেননি। কেন, স্যাড কেন? ফিল্মস্টারদের জীবনে বিবাহ এবং বিচ্ছেদ তো রোজকার ডালভাতের মত ঘটনা। তাছাড়া বহ্নিদেবী তোমার আত্মীয়া, বান্ধবী কি পরিচিত কেউ না যে তুমি আঘাত পাবে।'

এক দমে অনেকটা বলে শচী থামল। সিগারেট নিভে গিয়েছিল, আবার ধরাল। অতনু মনে মনে ওর যুক্তি আর বিশ্লেষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভেবে দেখছিল। যেন নিজের নখদর্পণে আবার পরখ করে নিচ্ছিল। শচী সিগারেটে বারকয়েক টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আলগা গলায় বলল, 'তোমাকে কত আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখাব!'

'বেশ তো—'

'যে রাজাভাইয়ের সঙ্গে অবনীবাবুর এত দোস্তি ছিল, প্রথমটায় কিন্তু তাঁর নাম-পদবী কিছুই তাঁর স্মরণে ছিল না। পরে অগ্নিহোত্রী পদবী যেই বলেছ অমনি এক ধাক্কায় বিজয়বিক্রম নামটা পর্যন্ত ওঁর মনে পড়ে গেল। খটকা লাগে কিনা?'

কোনও জবাব না দিয়ে অতনু ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল।

'হাসো। কিন্তু যত নষ্টের গোড়া এই মূর্তি, এটা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। মূর্তিটা কি করে দেবীদির হাতে এল, এবং কেন এল, সেটা জানতে পারলেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আর আবছা থাকবে না। তোমার রাস্তা হয়তো তুমি দেখতে পেয়ে যাবে।'

অতনু প্রশংসার ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক। তোর এই কথাটা অন্তত আমি না মেনে পারছি না।'

'তবে? আমি নিরেট ইডিয়েট নই স্বীকার করছ তাহলে? ঘটে সামথিং হ্যাজ! হবে নাকি আর একটু?'

'একটা ইনফর্মেশন। একটা খবর জানতে—'

'খবর তা এখানে কেন?'

অতনু ব্যাপারটা খুলে বলল। ধৈর্যের সঙ্গে সবটুকু শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'এরকম কিছু তো আমার জানা নেই। ওসব বড়বাবু বলতে পারবেন। উনি অপারেশনে গেছেন। পরে আসুন, বিকেলের দিকে।'

নমস্কার জানিয়ে অতনু থানা থেকে বেরিয়ে এল। মনটা বিরূপ। পরে আবার এখানে ফিরে আসার ইচ্ছে মন থেকে ততক্ষণে উপে গেছে।

গলিতে ঢুকেই চোখে পড়ল সুবলদা দরজায় দাঁড়িয়ে নিম্নশ্রেণীর চেহারার একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। অতনুকে দেখামাত্রই কি যেন বলল। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ দিয়ে সুট করে কেটে পড়ল। অতনুর মনে কেমন একটা খটকা লাগল কিন্তু সে যে দেখে ফেলেছে তা প্রকাশ করল না। সুবলদাও নিজে থেকে কিছু বলল না। বরং প্রসঙ্গ বদলে বলল, 'তোমার কি হয়েছে বলো তো তনুদাদা, কাল অত রাত্তিরে ফিরেও ভোর সকালে কোথায় বেরিয়ে গিয়েছিলে? আমাকে ডাকোনি পর্যন্ত! চা নিয়ে ঘুম ভাঙতে গিয়ে দেখি কোথায় কে!'

শচীর কথাগুলো ভুলতে পারা যাচ্ছিল না। অস্বস্তির খচখচানি টের পাচ্ছিল অতনু। সন্দেহ ব্যাপারটা অনেক সময় বাতিকে দাঁড়িয়ে যায়। এ তার পূর্বলক্ষণ কিনা কে জানে! ভেতরে যাবার মুখে একপলক তাকিয়ে সংক্ষেপে জবাব দিল, 'কাজ ছিল।'

অতনুর খামখেয়ালিপনা সুবলসখার অজানা নয়। তাই এই রুক্ষ ব্যবহার তেমন গায়ে মাখল না। শুধু জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি খাবে?'

'খেয়ে এসেছি।' সুবলসখা অবাক চোখে ওর চলে যাওয়া দেখল, ঠিক বুঝল না।

বাইরের পোশাক সবে ছেড়েছে, সুবলসখা এসে দাঁড়াল ঘরের দরজায়। অসন্তুষ্ট চোখে তাকিয়ে অতনু বলল, 'কী?'

'এক বাবু এসে অনেকক্ষণ বসেছিলেন।'

শচীর কথাগুলো এবার সত্যিই চমকে দিল। অতনু ভাবল, নাও ঠেলা, অবার সেই পুরনো নাটক শুরু হল তাহলে! মুখে বলল, 'এই সকালে! ঘুম ভাঙতেই ছুটে এসেছিল নিশ্চয়! তা কী দরকার?'

'দরকার তেনার তোমার সঙ্গেই। কি একটা কথা নাকি তোমাকে বলার ছিল।'

'হুঁ।' ব্যঙ্গের সুরেই অতনু শুধোল, 'আর ফোন আসেনি?'

সুবলদা সরল গলায় উত্তর দিল, 'হ্যাঁ। তিন জায়গা থেকে।'

ব্যালেন্স হারিয়ে অতনু কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। একরোখা ভাবটা

আর ফিরে এল না। কথা বলতে সময় লাগল। বলল, 'নামটাম শুনে রেখেছ? কী দরকার?'

'একজন শুধু নাম বলেছিলেন। ছোটদাদাবাবুর শ্বশুরমশাই। তিনি আবার পরে ফোন করবেন। একজন তো নেই শুনেই ফোন রেখে দিলেন। বাকি জন মেয়ে, নাম বলেনি।'

'কে, সুপর্ণা?'

'না, গলাটা অন্য রকম, অচেনা। বলল, টেবাঙ্কল। আমিবিকা থিকে। কিন্তু আমার কেন জানি বিশ্বাস হয না। অতদূর থিকে এত পষ্ট শোনা যায় নাকি? মনে হল কানেব কাছে কথা বলছে।'

'খুব যায। কি বলল সেই কথা বলো।'

মাথা চুলকে সুবলদা বলল, 'তোমাকে খুঁজল। বললাম বাড়ি নেই। আপনার নামটা বলেন। তা বলল না। তামশা করে বলল, বাড়ি নেই—বাবুকে বলো তার সঙ্গে আমাব খুব ঝগড়া হবে শীগগিরই—'

সুবলদা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। তারের ও-প্রান্তে অচেনা গলা। নমস্কার জানিয়ে লোকটি বলল, 'আমি সকালে আপনার জন্যে অপেক্ষা করে ফিরে এসেছি। শুনলাম, বাড়িটা আপনারা বিক্রি কবে দেবেন। কি দরে ছাড়বেন?' অতনু আকাশ থেকে পড়ল, 'কি বলছেন পাগলের মত? কে আপনাকে এমন সুখবর দিল?' লোকটা হাসল, 'পেয়েছি অথেনটিক সোর্স থেকে।' অতনু ফোনটা রেখে দেবার মুখে বলল, 'তবে সেখানেই দেখুন।'

একরকম ভাবে আর একরকম হয। অতনু ভেবেছিল আর যাবে না কিন্তু কৌতূহল তাকে ঠিক টেনে নিযে গেল। তারপর সেদিন তার অনেক ঘোরাঘুবি গেল। পাড়ার থানা থেকে উল্টোডিঙির থানায়। সেখান থেকে একটা ঠিকানা পেয়ে ছুটল সল্টলেকে।

বিকেলে পাড়ার থানার বড়বাবু জানালেন উল্টোডিঙি থানার অনুরোধে তাঁরা লোকাল এনকোয়ারি করেছিলেন। এর বেশি আর কিছু বলা তো সম্ভব নয়। ওখানে যান, যদি কিছু জানতে পারেন। রি-ডাইরেক্ট করা চিঠির মত অতনু অন্ধের মত ছুটল উল্টোডিঙি। সেখানে আবার অপেক্ষা। কিনা বড়বাবু রোঁদে বেরিয়েছেন। সন্ধেবেলায় রোঁদ কিরে বাবা! অতনু মনে মনে হাসল। আসলে ইভনিং রাউন্ডে বেরিয়েছে। রাউন্ড কথাটা মুখ-বিকৃতিতে হয়ে গেছে রোঁদ। সত্যি, পরিভাষা আর প্রতিশব্দ এমন অদ্ভুত চেহারা নেয় যে খুব মজার মনে হয়।

বড়বাবু খুব হাসিখুশি মানুষ। নধর চেহারা। চেয়ারে বসে টুপি খুলতে খুলতেই হাঁসফাঁস করতে করতে হাসলেন, 'অনেকক্ষণ বসে আছেন তো? খবর পেয়েছি।'

অতনু তার আগমনের উদ্দেশ্য জানাতেই ভদ্রলোক বললেন, ‘ভেতরের কথা তো জানি না, তবে সল্টলেকের এক সলিসিটার ফার্ম আমাদের অনুরোধ করেছিলেন, আপনার হাল খবর জেনে দেবার জন্যে। ভদ্রলোকের নাম-ঠিকানা আমার কাছে আছে। যদি আগ্রহী হন দিতে পারি।’

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে অতনু বলল, ‘প্রায় সাতটা বাজে, এখন কি আর ভদ্রলোককে অফিসে পাওয়া যাবে?’

‘যাবে। উনি আটটা পর্যন্ত অফিসেই থাকেন। কাছেই তো, চলে যান না কেন!’

স্যুট-টাইপরা ভদ্রলোক ওকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে গেলেন। বললেন, ‘আমি জানতাম আপনি আসবেন।’

‘কী ব্যাপার বলুন তো?’

‘এটা আমাদের এক হিসেবে মন্ত্রগুপ্তির ব্যাপার। অপারগ বুঝতেই পারছেন। আপনাকে শুধু দুটো প্রশ্ন করব, ঠিক ঠিক জবাব দেবেন।’

হতাশ অতনু বলল, ‘বেশ। প্রশ্ন করুন।’

‘সন্দীপ সম্পর্কে আপনি কি জানেন?’

অতনু চমকে সতর্ক হয়ে গেল। বলল, ‘কে সন্দীপ? সন্দীপ বলে কাউকে তো আমি চিনি না। হঠাৎ এরকম উদ্ভট প্রশ্ন?’

‘ঝিল রোডের সন্দীপ সর্বাধিকারীকে আপনি চেনেন না, সত্যি বলছেন?’

অতনু অম্লান বদনে মাথা নাড়ল।

‘হুঁ। কীর্তিগড়ের রঞ্জুপ্রসাদকেও চেনেন না, এই কথাও নিশ্চয় বলবেন?

অতনু এরকম নাড়া আগের বারেও খায়নি। তার চমকে-ওঠা ভদ্রলোকের নজর এড়াল না।

সন্দীপ এবং সন্দীপের সূত্রে রঞ্জুপ্রসাদের নাম শোনার জন্যে একেবারেই তৈরি ছিল না। অতনু চমকে তাকাল ভদ্রলোকের মুখের দিকে। টাইয়ের নট আলগা করতে করতে সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক অতনুর চোখে চোখ রেখে ঠোঁটের কোণে হাসলেন। বুঝতে বাকি থাকল না তার ভেতরের চমক আর গোপন নেই, ধরে ফেলেছেন ভদ্রলোক। কিন্তু সন্দীপ মানেই ঝিল রোড, ঝিল রোড মানেই শেষ নমস্কার। আর শেষ নমস্কার মানেই সন্দীপ হত্যার অব্যবহিত পরের সেই দোতলার শূন্য ঘরটি। যে-ঘরের মধ্যে সে সন্দীপের রক্তে মাখামাখি হয়ে মূর্খের মতো কোণঠাসা হয়ে কিছুটা সময় একা কাটাতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তার উপস্থিতির চাক্ষুষ কোনও প্রমাণ, অর্থাৎ কোনও অদৃশ্য দর্শক তো ওখানে ছিল এমন মনে হয় না। এই ভদ্রলোক তো নিশ্চয়ই না। তা হলে কি করে সন্দেহ করছেন অতনুর সঙ্গে সন্দীপের জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় দেখা হয়েছিল?

নইলে সম্পর্কের কথা তুলতে যেতেন না। হঠাৎ চারপাশে উদোম হয়ে গেলে যেরকম দিশেহারা হয়ে যেতে হয় অতনুর মনের সেই অবস্থা। বলল, 'ঠিক ধরেছেন।'

'ধরেছি না?' মুখে-চোখে সাফল্যের আলো ফুটল।

'হ্যাঁ, ধরেছেন, রঞ্জুপ্রসাদ নামের কাউকে আমি চিনি না, চোখে দেখা তো দূরেব কথা। আর কীর্তিগড়ের কথা বললেন, সে গড়টি কোথায়? আপনি অবশ্য জানতেন এই কথাই আমি বলব, তাই না? মানে আমি সত্যি কথা বলব না, এটা আপনি আগেভাগেই ধবে নিযেছেন।'

সলিসিটাব চ্যাটার্জি সামান্য অপ্রস্তুত হলেন। টাইনটটাকে আবাব কণ্ঠলগ্ন করতে করতে বললেন, 'না, ঠিক তা নয। আসলে আপনাকে বাজিযে দেখছিলাম। মনে হচ্ছে আপনি রঞ্জুপ্রসাদকে সত্যিই চেনেন না। তবে সন্দীপ সম্পর্কে—'

'আমি দুঃখিত চ্যাটার্জিসাহেব। সন্দীপ সবাধিকাবী সম্পর্কেও আমি কোনও তথ্য আপনাকে যোগাতে পারছি না। তাব সঙ্গে আমাব কোনও সম্পর্কই নেই। এই সামান্য কাবণে থানা-পুলিশ করে আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করার কোনও প্রযোজন ছিল না।'

'আপনাকে এতটা কষ্ট দিলাম সেজন্যে আমি দুঃখিত। একটু কফি খান।'

অতনু মাথা নেড়ে আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল, তাব আগেই পাশেব কাঁচের দরজা ঠেলে বেযারা দুকাপ কফি নিযে ঢুকল। এরপব আর না করা যায না। হাতঘড়িব দিকে আড়চোখে একবার তাকিযে নিল অতনু।

চ্যাটার্জি আপসোসের গলায় বললেন, 'খুব দেরি করিয়ে দিচ্ছি বোধহয!'

'না, ঠিক আছে।'

'নিন কফি খান।' কাজুব প্লেটটা অতনুর দিকে এগিযে দিতে দিতে বললেন, 'একটা রিকোযেস্ট কবব, অতনুবাবু। ব্যাপাবটা আপনার আমার মধ্যেই যেন সীমাবদ্ধ থাকে। আজকের ঘটনা অনুগ্রহ করে ভুলে যেতে চেষ্টা করবেন।'

কফিতে চুমুক দিয়ে অতনু বলল, 'তাই হবে।'

বাড়ি ফিরে এসে অতনু দেখল বাড়ি জমজমাট। বাইরের ঘরে ব্যাগ সুটকেস পোঁটলা-পুঁটলি একগাদা। ভেতরের ঘরে অনেক গলার কলরব। প্লেট, চামচে, চায়ের কাপের রিনরিনে আওয়াজ। কারা, কি ব্যাপার প্রথমটা বুঝতে পারেনি। পরে পিসিমার গলা শুনেই বুঝতে পারল দিল্লি থেকে সবাই চলে এসেছে। দরজা খুলে রেখে ভেতরের ঘরে সবাই জটলা করছে দেখে অতনু মনে মনে বিরক্ত হল। এরকম অসাবধান হওয়া উচিত হয়নি। এ-বাড়ির অবস্থা সুবলদার তো না জানার কথা নয়।

ভেতরের ঘরে ঢুকতেই সবাই কথা থামিয়ে অতনুর দিকে তাকাল। মা বলল, 'আয় বাবা, কোথায় ছিলি এতক্ষণ? শুনলাম তুই নাকি দিনরাত বাইরে বাইরে—'

মেজভাই বলল, 'আঃ, মা, দাদাকে একটু দম ফেলার সময় দাও। তোমার ওসব কেমন ছিলি, কোথায় ছিলি পরে হবে। সুবল, ও সুবল, দাদা এসে গেছে গো। লাড্ডু লাগাও।'

ছোটভাইয়ের শ্বশুরমশাই জলযোগপর্ব শেষ করে এনেছিলেন। চায়ের কাপ নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমার গাড়ি বোধহয় এসে গেছে, হর্ন শুনতে পাচ্ছি। চলি তাহলে বেয়ান। ব্যাপারটা আজ রাতেই ফাইনাল করে ফেলবেন।' বলেই রুমালে মুখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়িয়ে তির্যক চোখে একবার অতনুর দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত-সমস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর আচরণ অতনুর কাছে কেমন বিসদৃশ ঠেকল। মনে হল কোনও কারণে অতনুর ওপরে ভদ্রলোক অপ্রসন্ন হয়েছেন। কিন্তু কারণটা ঠিক ধরা গেল না। বাড়ির দোতলার ঘরগুলো এতদিন বন্ধই ছিল। সেখান থেকে শিশুকণ্ঠের কান্না শোনা যাচ্ছিল। কিচেনে বোধহয় মেজবউমার গলা, পুতুল, দ্যাখ্ তোর শ্রীমান বোধহয় উঠে পড়েছে। সিঁড়িতে নূপুর আর চুড়ির ঝুনঝুন শব্দ দ্রুতবেগে উঠে গেল।

সুবল ডিশভর্তি লাড্ডু মেঠাই আর ভাজি নিয়ে ঢুকল। বলল, 'তোমার চা-ও বসিয়েছি তনুদাদা।'

'আমি রাক্ষস না খোক্কস সুবলদা, এই ন'টা রাত্তিরে খাবারের পাহাড় নিয়ে এসে হাজির করলে?'

'তোর যেমন কথা!' মা বলল, 'খা, খেয়ে ফেল। আজ রাতের খাওয়ার অনেক দেরি।'

মেজ হাসতে হাসতে বলল, 'দিল্লির লাড্ডু, বুঝেছ দাদা, না খেলেও তো পস্তাবেই, তা খেয়েই না হয়—'

ছোটভাই বলল, 'এইমাত্র মাংস এল। আজ লুচি মাংস হচ্ছে।'

পিসিমা খ্যানখেনে গলায় বললেন, 'দূর ছোঁড়া, তোর মুখে সবসময় আমিষের গন্ধ!'

অতনু প্লেট হাতে নিয়ে মায়ের পাশে গিয়ে বসল। মা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'তোর চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে তনু। একলা মানুষ, নিজের দিকে একটু খেয়াল রাখ্।'

ছোটভাইয়ের তর সইছিল না। বলল, 'একটা সুখবর আছে দাদা।'

'কী সুখবর?'

'বাবা সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন—'

অতনু চমকে উঠে বলল, 'কে বাবা?'

'ইয়ে, মানে আমার শ্বশুরমশাই। উনি বলছিলেন, তুমি ওঁর পার্টিকে নাকি গালমন্দ করেছ?'

অতনু আকাশ থেকে পড়ল, 'গালমন্দ! কাকে?'

'আঃ, ছোটন!' মেজভাই ধমকে উঠল, 'তুই কিরে! মনে হচ্ছে লগ্ন বয়ে যাচ্ছে একেবারে! কাল সকালে দাদার সঙ্গে পরামর্শ করা যাবেখন।'

অতনু বলল, 'কিসের পরামর্শ, কি ব্যাপার, তোরা ভেঙে বলছিস না কেন?'

মা বলল, 'ওরা ঠিক করেছে এ-বাড়ি এবার বিক্রি করে দেবে।' মায়ের গলায় যেন চাপা দীর্ঘশ্বাস। অতনুর এইবার সব পরিষ্কার হয়ে গেল। সকালের টেলিফোন মনে পড়ে গেল।

মেজভাই বলল, 'ওরা বলছ কেন, আমি না।'

অতনু অবাক হয়ে বলল, 'সেকি! বাড়ি বিক্রি করে দিবি! এই বাড়িটাই তো আমাদের বাবার স্মৃতি! কেন, বাড়ি বিক্রি করে দেওয়া কি খুব দরকার হয়ে পড়েছে? কলকাতার সঙ্গে তাহলে তোরা সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে চাইছিস? হঠাৎ কলকাতায় এলে কোথায় উঠবি? হোটেলে?'

ছোটন অসহিষ্ণু গলায় কিছু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। বোঝা গেল মেজভাই চোখ পাকিয়ে ওকে চাপ্ল দিয়েছে।

অতনু ম্লান গলায় বলল, 'আমি যতটুকু বুঝি, এ ব্যাপারে আমাদের মতামতের আগে মা কি বলে সেটা শুনতে হবে। এটা মায়ের ব্যাপার। যা বলবে তাই হবে। আমার অবশ্য হ্যাঁ বা না কিছু নেই। আমি এ-বাড়িতে আউটসাইডার ছাড়া কিছু নই!'

ছোটভাই শান্তনু আর থাকতে পারল না, বলল, 'দাদার অবিশ্যি এ-বাড়ির ব্যাপারে হ্যাঁ-না করবার সত্যিই কিছু নেই।'

মেজ সুতনু রাগী গলায় বলল, 'ছোটন! তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? যা মুখে আসে বলছিস!'

'অন্যায় কিছু বলিনি। এ-বাড়ি বাবা আমাদের দুজনকে লিখে দিয়ে গেছেন।'

'দিয়ে গেছেন, তার কারণ দাদা তখন নিরুদ্দেশ। সবাই বাবাকে বুঝিয়েছিল যে দাদা আর বেঁচে নেই!'

'সবাই মানে কে আমি বুঝেছি। তুমি কিন্তু আমার শ্বশুরমশাইকে টিপ্পনী কেটে কথা বলছ মেজদা। সে ভদ্রলোকের এতে কোন স্বার্থটা তুমি দেখলে? এই জন্যেই বলে মানুষের উপকার করতে নেই! কি দরকার ছিল তাঁর আমাদের জন্য খেটে মরার?'

'বাবার এই এক দোষ! আমি দিল্লিতেই বাবাকে পইপই করে বলেছিলাম তুমি এদের ব্যাপারে থেকো না!'

পুতুল! সে যে কখন নিঃশব্দে ছেলে কোলে করে নিচে নেমে এসেছে কেউ বুঝতে পারেনি। পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে ঠেস দিয়ে কথাগুলো বলে ঝিলিক মেরে চলে গেল। অতনু বুঝল এই কলহ হঠাৎ আজ শুরু হল না। সংসারে আগেই ফাটল ধরেছে, আর তার সূত্রপাত হয়েছে দিল্লি থেকেই।

পিসিমা আশ্রিতা মানুষ, একটিও শব্দ করলেন না। মা শুধু বলল, 'আঃ, তোরা কি শুরু করলি বল তো! সবকিছুর নিষ্পত্তি কি এখনই করতে হবে?'

'তুমি বুঝছ না মা। গলির ভেতর, ঘিঞ্জি পাড়ার মধ্যে, এ-বাড়ি আগে কে পুঁছত? পাঁচ মাথার মোড়ে মেট্রো রেলের স্টেশন হবে জেনেই না রাতারাতি...ন'লাখ টাকার অফার ফেলনা ভাবলে চলবে কেন! ঠিক আছে, ভেবে দেখো,' বলেই শান্তনু উঠে দোতলার সিঁড়ির দিকে এগোল। বউ বোধহয় যাবার আগে ইশারায় ডেকে গিয়েছিল।

সুতনু শ্লেষের হাসি হেসে বলল, 'কনসাল্টিং রুমে চললেন।'

মা বলল, 'তুই আর জ্বালাসনি!'

সুবলদা গুটিগুটি চা নিয়ে ভেতরে এল। তার মুখের হাসিও একবেলাতেই মুছে গেছে। অতনুর মনটাও খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এইসব সাংসারিক ঝামেলা সে চিরকাল অপছন্দ করে এসেছে। হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিতে নিতে সে আবহাওয়া সহজ করে দেবার জন্য বলল, 'তুই আর এক কাপ খেলে পারতিস, সুনু।'

'তা বলছ যখন, চায়ে আমার অরুচি নেই। কিগো সুবলঠাকুর, মেপেজুকেই করেছ, না হবে এক কাপ?'

'এনে দিচ্ছি,' বলে সুবলদা ভেতরে চলে যেতেই সুতনু বলে উঠল, 'তোমার একটা কথা আমার খুব খারাপ লাগল, দাদা! তুমি নিজেকে আউটসাইডার বললে কি হিসেবে? তুমি এ-বাড়ির বড় ছেলে। তুমি নিজেকে পর করে নিচ্ছ কেন? ছোটনের কথা তুমি ধর্তব্যের মধ্যে নিয়ো না। ও নিজের বুদ্ধিতে চলে না।'

তিন চুমুকে চা শেষ করে বাথরুমে যেতে যেতে অতনু বলে গেল, 'ভেবে দেখিস, কথাটা ভুল বলিনি।'

রঞ্জুপ্রসাদ নামটা তাহলে ধোঁয়া নয়, পিছনে সত্যিকারের মানুষ আছে। আর সেই নামটাকেই হত্যাকারী টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল। রঞ্জুপ্রসাদের অস্তিত্ব তাহলে শয়তানটার অজানা নয়। কিন্তু নামটা অতনুর সামনে টোপ হয়ে ঝুলবে একথা সে কি করে ভাবল? অতনুর সঙ্গে রঞ্জুপ্রসাদের কী সম্পর্ক? নাকি যে-কোনো একটা নাম বলতে গিয়ে মুখ ফসকে সত্যিকারের নামটা বেরিয়ে

এসেছিল টেলিফোনে কথা বলতে গিয়ে? সলিসিটার চ্যাটার্জিও রঞ্জুপ্রসাদের নাম বলেছেন, কিন্তু নেপথ্যের কথা কিছু ভাঙেননি। অতনুর কৌতূহল ঘুরে-ফিরে রঞ্জুপ্রসাদে এসেই ধাক্কা খাচ্ছিল। একটা অন্ধগলির মতই, বেরিয়ে আসার কোনও পথ পাচ্ছিল না। তার চিন্তার শুরু রঞ্জুপ্রসাদ থেকে, শেষও তাই। কারণ বাড়ির সমস্যাটা প্রথম চোটে তাকে কিছুটা পীড়া দিলেও ও ব্যাপার নিয়ে সে আর মাথা ঘামাচ্ছিল না। যে কারণেই হোক, খাবার টেবিলে আর ও প্রসঙ্গ ওঠেনি, শান্তনু কেমন নিঃশব্দ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অতনু নিশ্চিত বুঝে গিয়েছিল, আজ হোক কাল হোক, দুমাস কি দুবছর কোনও ব্যাপার না, এ-বাড়ি তাকে ছাড়তেই হবে। বহুকাল পরে মায়ের আচরণে বেশ খানিকটা পরিবর্তন অবশ্য তাকে বিস্মিত করেছে। তার প্রতি সেই নির্লিপ্ত বরফকঠিন ভাবটা উধাও হলেও সে কিছু স্থায়ী ব্যাপার কখনওই নয়। প্রিয় দুই ছেলের কাছ থেকে আঘাত পেয়ে মনটা সাময়িকভাবে নরম, দুর্বল, স্পর্শকাতর হয়ে উঠতেই পারে। বাবার স্মৃতিবহুল এই বাড়িও সেই নাড়া দেওয়ার পিছনে হয়তো অনেকটাই কাজ করেছে। কিন্তু মায়ের একটা কথা খুব সিগনিফিকান্ট, সে যে একা, নিজের দিকে তার যে লক্ষ্য রাখা উচিত এই কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে কিন্তু ভোলেনি।

অনেকদিন পরে সকাল সকাল শুয়ে পড়ার আগে পুরনো অভ্যাসবশত একটা বই নাড়াচাড়া করছিল। বইটা উত্তেজক থ্রিলার হলেও দু-চার পাতার বেশি এগোয়নি। এলোমেলো পাঁচ চিন্তা মাথায় এসে ভর করছিল অতনুর। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছিল। মায়ের গলা শুনে খেয়াল হল, অনেকক্ষণ থেকেই তার শীত শীত করছিল।

'নে এটা গায়ে জড়িয়ে বোস, ঠাণ্ডা লাগিয়ে অসুখ বাধাবি নাকি?'

নতুন কাশ্মীরী শাল ওর কোলের ওপর ফেলে দিয়ে মা টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল। অতনু বুঝল শালটা তার জন্যই কিনে আনা হয়েছে, মা মুখে সেটা বলল না।

'এত রাতে কাকে?' অতনু অবাক হয়ে মায়ের ডায়াল করা দেখছিল।

'সাত তালে ভুলেই গিয়েছিলাম রে। মেয়েটা কিভাবে পৌঁছাল একটা খবর নিতে হয়! হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সিতে চাপিয়ে দেওয়া হল!' বলতে বলতে কানেকশন পেয়ে গেল, অদৃশ্য প্রান্তের সঙ্গে মায়ের কথোপকথন শুরু হয়ে গেল। সেই এক তরফের কথা থেকেই অতনু বুঝতে পারল, যার জন্যে উদ্বেগ সেই নমিতা দিল্লির এক প্রতিবেশীর মেয়ে। এবং সে ভালভাবেই পৌঁছে গিয়েছিল, শুধু তাই নয়, নিশ্চিন্ত মনে শুয়েও পড়েছিল।

'মশারি টাঙাবি না?' ফিরে যাবার মুখে মা ওর খাটের কাছে দাঁড়াল।

অতনু হেসে জবাব দিল, 'ও খরচা পোষায় না।'

'সেকি কথা! খরচা পোষায় না কিরে?'

'আলিসি। যা তোমার আড়াই-তিনখানা মশা, তার জন্যে মেহনত কে করে!'

'আমি দেব?'

মাথা নেড়ে অতনু বলল, 'একটু বসো তো মা। তোমাকে একলা পেয়েছি যখন, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।'

মা বসল না। বলল, 'বল কি বলবি?'

'আচ্ছা রঞ্জুপ্রসাদ বলে কাউকে তুমি চিনতে?'

মা কেমন থমকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারল না। টিউব-লাইটের আলোয় অতনুর মনে হল, মায়ের মুখখানা কাগজের মত সাদা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে কয়েক পলকের জন্যে। নিজেকে সামলে নিতে নিতে কাঁপা গলায় মা শুধোল, 'হঠাৎ? এত কাল পরে ও-নাম তুই কোত্থেকে শুনলি?'

'চেনো তাহলে?'

অন্যদিকে চোখ সরিয়ে মা বলল, 'না, আমি চিনি না।'

অতনু বুঝল মা কথা ঘোরাচ্ছে। সে অবাক হয়ে বলল, 'তবে যে জিজ্ঞেস করলে, কোত্থেকে শুনলাম?'

একটু চুপ করে থেকে অতনুর মা বলল, 'সত্যিই চিনি না। তোর বাবার মুখে একসময় ও-নাম দু-চার বার শুনেছি যেন। কিন্তু কি ব্যাপারে সেটা আর মনে নেই।'

'বাঃ, এরই মধ্যে ভুলে গেলে?' অতনুর গলায় সন্দেহের সুর।

'এরই মধ্যে কিরে! সে কি আজকের কথা! তিরিশ-পঁযতিরিশ বছর হবে কোন না সময়ের কোনও হিসেব আছে? তুই কার কাছে শুনেছিস বল তো?'

অতনু তার মায়ের গলায় চাপা উদ্বেগ আগাগোড়াই টের পাচ্ছিল। খুব আশ্চর্য ঠেকছিল।

মনের মধ্যে বার কতক ইতস্তত করে অতনু বলে ফেলল, 'ক'দিন আগে একটা উড়ো টেলিফোন এসেছিল রাত্তিরবেলা। যে টেলিফোন করছিল সে নিজের নাম বলেছিল রঞ্জুপ্রসাদ।'

অতনু দেখল মায়ের মুখ একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেছে। এখন আর শুধু চাপা উদ্বেগ নয়, তার সঙ্গে রীতিমত ভয়। কথা কইতে বেশ একটু সময় লাগল। কম্পিত ক্লান্ত গলায় মা শুধোল, 'কী বলে সে? কী চায়?'

অতনু মনস্থির করে ফেলেছিল। প্রথমেই এতটা স্নায়ুচাপ ঠিক না। হেসে উঠে বলল, 'চাইবে আবার কি, তুমিও যেমন! জাস্ট টেলিফোন। এক ধরনের

পাগল আছে না, রাতে ঘুম হয় না! টেলিফোন ডাইরেকটরি দেখে যাকে তাকে কল করে সেই রকম। আমি পাত্তাই দিইনি।'

অতনুর মায়ের মুখে স্বস্তির ছায়া পড়েছে এমন মনে হল।

মা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উঠে পড়ল না, আরও একটুক্ষণ বসে থাকল। এর পর অতনু কি বলবে ভেবে পেল না। শেষে মা নিজেই আবার কথা বলল, 'কত রকমের লোক কত ফিকিরে থাকে বোঝা শক্ত। তুই ওসব নিয়ে মাথা ঘামাস না। আর কাউকে কিছু বলারও দরকার নেই। সব উটকো ঝামেলা। নে আর বই পড়তে হবে না, বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়। আমি যাই।'

মা চলে যাবার পর অতনু দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আলো নিবিয়ে সত্যি সত্যিই শুয়ে পড়ল। সারা দিনের মানসিক ধকল খুব অল্প হয়নি। কিন্তু ঘুম এল না, অনেক ক্লান্তির পর যেমন মনে হয়। চোখ বন্ধ করে সে রঞ্জুপ্রসাদের কথাই ভাবছিল। লোকটা আসলে কে? কীর্তিগড় আসলে গড় কিংবা দুর্গ নয়, একটা অঞ্চল। সাঁওতাল পরগনার কিনারছোঁয়া পশ্চিমবাংলার একটা তালুক বিশেষ। রঞ্জুপ্রসাদ সেখানকার মানুষ, তবে তার বর্তমান নিবাস সেখানে নাও হতে পারে। সে হয়তো এখন অন্য কোথাও থাকে। কিন্তু পদবীহীন ওই একটুকরো নামের এত কী মহিমা যে, নামটা শুনেই মা ওরকম বিচলিত হল। মনে হল, রীতিমত ভয়ই পেয়েছে। পাড়া-কাঁপানো মস্তানের নাম শুনলে মানুষের যেমন হয়। তবে কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে, যা মা নিশ্চয়ই জানে। রঞ্জু যদি শুধু বাবার পরিচিত কেউ হত তাহলে নাম শুনেই ওরকম ঘাবড়াবার কি ছিল? মায়ের একটা ছোট্ট কথা কানে বিঁধে আছে। বলেছিল, কী বলে সে? কী চায়? এই কথা দুটো নিছক কথার পিঠে কথা হয়তো না। দুঃস্বপ্নের মতো কোনও পুরনো স্মৃতির টুকরো হয়তো ওর মধ্যে বিঁধে আছে। কাউকে কিছু বলতে নিষেধই বা করল কেন? কাউকে বলতে কাকে? সুতনু শান্তনু ছাড়া আর কে হবে! নাম করে না বললেও বোঝাই যায়।

পরের দিন সকালে। প্রতিদিনের অভ্যেসমত ব্যায়াম সেরে বাড়ির পিছন দিকের একতলার খোলা ছাদে পায়চারি করল কিছুক্ষণ। শেডের তলায় একখানা বেতের চেয়ার রাখা থাকে। পায়চারি শেষে একটু বসার জন্যে। এখানে বসে সে জিরোয়। খবরের কাগজের অপেক্ষা করে কোনও-কোনও দিন।

একতলার ছাদটা প্রায় বড় রাস্তার ওপর। কলকাতার জেগে-ওঠা খুব পরিষ্কার টের পাওয়া যায়। তাদের ছেলেবেলায় হোসপাইপে করে রাস্তা ধোয়া হত চাপাকলের গঙ্গাজল দিয়ে। তখন সেই ফ্‌ট ফ্‌ট পুর পুর শব্দ শুনে মনে হত রাস্তা আড়মোড়া ভেঙে উঠে হাই তুলছে। এখন ওসব বালাই নেই। নোংরা আবর্জনা যেখানে

যা জমে আছে থাক, এখন শুধু ময়লা ছুঁইলে শাস্তি পাইবে অবস্থা। ডাস্টবিনের গায়ে অবশ্য পালনীয় পৌরবাণী। সাইকেলের ঘন্টি, রুটির গাড়ি, সাইকেল ভ্যানের খাঁচায় পোরা নার্সারি রাষ্টম চলেছে কলরব করতে করতে। দুধের গাড়ি আসে পাড়া কাঁপিয়ে। তীরন্দাজের মত নির্ভুল লক্ষ্যে খবরের কাগজের হকাররা রোল করা কাগজ ছুঁড়ে মারছে দোতলা-তিনতলার ব্যালকনি কিংবা জানলা নিশানা করে। কোনও-কোনও বাড়ির ওপরতলা থেকে নাইলন দড়িবাঁধা ঝুড়ি ব্যাগ মাদার ডেয়াবি, পাঁউরুটি কি অন্যরকম সওদা তুলছে।

ফটাস করে শব্দ করে প্রায় হাতে-গরম খবরের কাগজ এসে পড়ল অতনুর পায়ের কাছে। এ লাইনে শিউচরণ একেবারে পয়লা নম্বর। অবিরাম সাইকেল-চালিযের মত সে চলন্ত সাইকেল থেকেই লক্ষ্যভেদ করতে করতে বেরিয়ে যায়। দড়ির পাক খুলে কাগজের ভাঁজ খুলল। কাগজের সঙ্গে আজকাল প্রায়ই হ্যান্ডবিল থাকে, ভিডিও ফটোগ্রাফি, কম্পিউটার শিক্ষার বিজ্ঞাপন, রিডাকশন সেলের নোটিশ। খদ্দেরকে একেবারে গা ছুঁয়ে ডাকার নতুন কায়দা। আজও একটা হ্যান্ডবিল ছিল, কাগজের ভেতর থেকে খসে পড়ল। কৌতূকবোধ করে সেটা কুড়িয়ে নিতেই অতনু দেখল সেটা অন্য জিনিস। টাইপ-করা একটা ছোট্ট চিঠি। আব সেটা তাকেই লেখা। এই যে মজুমদারমশাই, অত ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করে লাভ কি? শেষ পর্যন্ত যখন আমাদের সাক্ষাৎ হচ্ছেই। রঞ্জুপ্রসাদ।

এক লাফে ছাদের কিনারে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। রাস্তা ফাঁকা। সন্দেহজনক কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে নেই। শিউচরণের সাইকেল বহুক্ষণ পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মতই ঘটনাটা ছোট্ট কিন্তু চমকে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। খুব মৃদু ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মতই লাগছিল অতনুর। রঞ্জুপ্রসাদ, আসলই হোক বা নকলই হোক, তার ওপর থেকে একদম চোখ সরায়নি, এটাই ঘটনা। একবার দেখা হতে হতেও হয়নি, তবে এবার হবে। কিন্তু কেন? লোকটা চতুর, শক্তিমান এবং ক্ষিপ্র। শত্রু হিসেবে হেলাফেলার নয় মোটেই। মূর্তিটা হাতিয়েও ক্ষান্ত হয়নি। তার মানে লোকটা ভেতরের বস্তুর কথাও জানে। আর তার অপেক্ষায়ই আছে।

অতনু দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে নেমে এল। নিচে তখন ফোন বাজছিল। সুবলদাও ফোন ধরতে এসে গিয়েছিল। অতনুকে দেখে আবার ফিরে গেল।

ফোনে শচীদুলালের গলা। কালকের নানা উলটোপালটা ঘটনায় শচীর কথা মনেই ছিল না।

'এই যে গুরু, আছ কেমন?'

'অন্য রকম।'

'কেন? কিছু ঘটেছে নাকি?'

'ঘটেছে, ঘটছে। সেজন্যে বলিনি। এখন আর আমি এ-বাড়িতে একা না।'

'সাবাশ! বলেছিলাম না, যা করতে হবে এরকমই দুম করে—'

'আগে আমার কথাটা শোন্, তারপর লাফাবি। দিল্লি থেকে বাড়ির সবাই এসে গেছে কাল সন্ধেবেলায়। একেবারে হোল ফ্যামিলি, কুচোকাঁচাসুদ্ধু। দোতলার দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়েছে অনেকদিন পর। বাড়ি এখন জমজমাট।'

'ফাইন! কদিন মুখ বদলে ভালমন্দ খেয়ে নাও। আমারই লোভ হচ্ছে।'

'আপাতত দমন কর্। আর কিছু হল? এনি নিউজ?'

'একটু একটু। বাড়িব ভাডাটাড়া সব চুকিযে দিয়ে দেবীদি ফরেন চলে গেছেন। বোধহয বরাবরেব মতই। এক নবকুবেরের সঙ্গে ওখানেই সংসার পেতে বসেছেন। এবকমই লোকের ধাবণা।'

'বেশ, তারপর?'

'শবীবটা হঠাৎ খারাপ করায় জ্যেঠু স্যার ফিরে এসেছেন। তাঁর কাছে শুনলাম অগ্নিহোত্রী আর বহ্নিদেবী আলাদা কেউ নয়। আমার বাবার কাছে কিছুদিন তালিম নিয়েছিলেন। তুমি নিশ্চয় কীর্তিগড় বলে কোনও জায়গার নাম শোনোনি?'

'কেন শুনব না! বল্—'

'বাবা হয়তো সঠিক বলতে পারতেন। দেবীদিদি খুব সম্ভব ওই অঞ্চলেরই মেয়ে।'

'রঞ্জুপ্রসাদও ওই অঞ্চলেরই লোক।'

'অ্যাঁ! রিয়্যালি? কি করে জানলে?'

'কাল এক ভদ্রলোকের মুখে শুনে ফেলেছি।'

'রঞ্জুপ্রসাদ তাহলে গপ্পো না? খাঁটি মনুষ্য চরিত্র?'

'সেই রকমই ভাবতে হচ্ছে, কারণ মিনিট পাঁচেক আগে তার কাছ থেকে আমি একখানা প্রেমপত্র পেয়েছি।'

'তার মানে?'

'মানে মৃদু লাঠিচার্জের মত মৃদু শাসানি।'

'ডাকে এসেছে?'

'না, সেকেন্ড হ্যান্ড ডেলিভারি। খবরের কাগজের সঙ্গে এসেছে। সাক্ষাতে বলব সব। আর হ্যাঁ, এখানে যাকে তুই ইয়ে করছিলি, সে বোধহয় সব ইয়ের বাইরে। দু-একটা প্রমাণ পেয়ে গেছি।'

'হুঁ! তাহলেই ভাল। কবে দেখা হবে? আমিই যাব না তুমি আসবে?'

'কাল কিংবা পরশু যাব। একসঙ্গে সানরাইজ দেখব। এখন রাখছি।'

ফোনটা রেখে দিয়ে অতনু বিছানায় গিয়ে বসল। রঞ্জুপ্রসাদের চিঠিটায় আর একবার চোখ বুলিয়ে সেখানা পকেটে পুরে রাখল। নানা ভাবনা একসঙ্গে আসতে চাইছিল তার মনের মধ্যে। তার মনে হল কিছুকাল যাবৎ যে সব নাটকীয় ঘটনা ঘটে চলেছে, প্রকাশ্যে আর প্রচ্ছন্নভাবে যে সব মানুষ ভেসে উঠেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে তাদের কোনও-কোনওটা আপাত বিবেচনায় পরস্পর সম্বন্ধহীন অসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যিই কি তাই? অন্য দৃষ্টিতে, অন্য দিক থেকে দেখলেও কি মনে হবে না অমিল-ফারাকের আড়ালে কোথাও এদের একটা সংযোগবিন্দু নিশ্চয় আছে। আছে অথচ মাথা খাটিযে ধরা যাচ্ছে না। ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি কথাটার তলায যেমন একটা ঐক্যতত্ত্ব বা সাবজনীন নিয়ম থাকতে বাধ্য, তেমনি। এরাও তেমনি সূক্ষ্ম, বর্ণচোরা, চোখ এড়িয়ে যাওয়া সুতোয় গাঁথা। এরা একসূত্রী।

চোখ বন্ধ করে বসে থাকল মিনিট দুই-তিন। কপালে ভাঁজ, ভুরুতে কোঁচ, কি যেন ভাবছে। সামনে এগোনোর রাস্তাটা বোধহয় ছকে নিচ্ছিল মনে মনে। শেষে উঠে ডায়েরি হাঁটকে একটা ফোন নম্বর দেখে নিল।

সবসময় এমন ভাগ্য হয় না, একেবারেই কানেকশন পেয়ে গেল। বার কয়েক ফোন বেজে যাওয়ার পর ও-প্রান্তে কেউ ধরল। গলা শুনে চিনতে বিলম্ব হয়নি অতনুর, তাই সরাসরিই বলল, 'আমি অতনু, অতনু মজুমদার।'

'আরে, তুমি! ভুলে যাওনি তাহলে?'

'আপনাকে ভুলব! সে কি হয়?'

'বলো কী খবর?'

'খবর আর জুটছে কই? আপনি কেমন আছেন?'

'খুব ভাল নেই বাবা! বরং বলতে পারো আরও খারাপ। ক্রমশ তো তাই হবে। চলে যাবার—'

'ইস, আপনাকে এই অবস্থায়....আচ্ছা রেখে দিচ্ছি এখন—'

'না-না, বলো! তোমার সঙ্গে কথা বলেও একটু মুখ বদলানো যায়।'

'ইয়ে মানে একটা প্রশ্ন, শুধু একটা প্রশ্নের যদি জবাব দিতেন—'

'মাত্রই একটা, তুমি খুব সংযমী। সেদিনও মনে হয়েছিল। সাংবাদিকরা এরকম হয় না কিন্তু, আচ্ছা বলো কি জানতে চাও!'

'আপনার জ্যাঠাকুর্দা যেখানে ছিলেন, যেখান থেকে নিখোঁজ হয়েছিলেন, সেই জায়গাটার নাম মনে পড়ে? ভাবুন, ভেবেচিন্তে জবাব দিন।'

মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে মাথা দোলাতে গিয়েছিলেন, কারণ তৎক্ষণাৎ একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার শব্দ কানে এল। ব্যস্ত হয়ে অতনু বলল, 'কী হল?'

'ঘাড়ে একটু ব্যথা পেলাম। উঁহু! নামটা কখনও কারও কাছে শুনেছিলাম, মনে হচ্ছে না তো!'

'এই ধরুন দুর্গটুর্গ, গড়টড় দিয়ে কোনও নাম?'

'তুমি বাবা আমাকে বিপদেই ফেললে। মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে, এখন সারাদিন মাথা হাতড়াতে হবে।'

'অঞ্জনগড় কি কীর্তিগড় গোছের নামটাম, যদি শুনে থাকেন, ভেবে দেখুন।'

প্রায় আধ মিনিট নীরবতার পর ও-প্রান্তে উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল।

'ইয়েস! শুনেছি। মনে হচ্ছে কীর্তিগড়ই শুনেছি। হ্যাঁ, সিওর। কেন, একবার যাবে নাকি সেখানে?'

'আজ্ঞে, যাবার তো ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কি আর হয়ে উঠবে আমার? দেখি!'

'যদি যাও, এ বুড়োর একটা আর্জি আছে।'

'বেশ তো, বলুন না!' অতনু ভেতরে ভেতরে অবাক হয়।

'গেলে ঠাকুর্দামশাইয়ের একটু খোঁজখবর....তবে খুব সাবধানে বাবা, জায়গাটা তো ভাল না।'

অতনু নিঃশব্দে হাসল। তার মুখে এসে গিয়েছিল, আপনার ঠাকুর্দা তো কবে ভূত হয়ে গেছেন। বেঁচে থাকলেও এতদিনে ক্রিকেটের ভাষায় বলা যেত ডাবল সেঞ্চুরির দিকে এগোচ্ছেন। বলা যেত কিন্তু বলল না। তার চুপ করে থাকায় অবনী নিজে থেকেই বললেন,'বুঝতে পারছি কাজটা খুবই কঠিন, এ মিস্ট্রি হয়তো কোনও দিনই সলভ হবে না। একজন সন্ন্যাসী ধরনের শিল্পীমানুষ ওভাবে ভ্যানিশ হয়ে গেল!' একটা দীর্ঘশ্বাস স্পষ্ট শোনা গেল।

'আজ্ঞে, যদি যাই একবার দেখব চেষ্টা করে। এখন রাখি!'

ফোন রেখে দিয়ে অতনু নিজের মনে বলল, যাঃ বাব্বা, রোমহর্ষক ব্যাপার, সব রাস্তাই দেখি ইংরেজি বচনমাফিক রোমের দিকে চলেছে। সবাই কীর্তিগড়ের দিকেই আঙুল তুলে আছে। অথচ যেখানে তার নিশ্চিত উল্লেখ থাকা উচিত ছিল সেখানে সব ধোয়ামোছা। রত্নগুপ্তি বিচিত্রম পুঁথিটা সে বারবার খুঁটিয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও শ্লোকের মধ্যে যদি একবারও নামটা ব্যবহার করা হত নিশ্চয়ই তার নজর এড়িয়ে যেত না। পুঁথিটা যে নকল তাও নয়, সেই 'রত্নাকর' সভাশিল্পীর নিজের হাতের কাজ। অরিজিনাল পুঁথি তাতে সন্দেহ নেই। একটা কথা অবশ্য আগে ভাবেনি সে। সামনের কতকগুলো পাতা ছেঁড়া, কিন্তু কেন ছেঁড়া? কে ছিঁড়ল? উইয়ে খাওয়া, ছাগলে চিবনো পুঁথি নয়, দেখে মনে হয় অনেককাল যত্নেই রাখা ছিল। তাহলে? কি ছিল ওই পুঁথির মধ্যে?

চিন্তাটা এইখানে এসে থমকে গেল। সমাধি হওয়া মানুষের মত অতনু স্থির

হয়ে বসে থাকল। চিন্তাটা উল্টোদিকে ঘোরাতে চেষ্টা করছিল। যেন ঘড়ির কাঁটা থামিয়ে দিয়ে উল্টোদিকে ঘোরানো। অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ। অতনু আবার কপালে ভাঁজ ফেলে চোখ বন্ধ করল। পুঁথির লেখক ভ্যানিশ হয়ে গেল এক জায়গায় আর পুঁথিটা চলে এল সটান কলকাতায়। এবং কলকাতার এমন এক জায়গায়, এমন এক পরিবারের হাতে, যারা কস্মিনকালেও খানদানি রাজবংশের কেউ ছিল না। যাদের শরীরে নীল রক্তের জলুস ঢোকেনি—

অতনু হঠাৎ চোখ খুলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। পোশাক পাল্টাল। ঘর থেকে বেরুতে যাবে, সুবলদার মুখোমুখি। হাতে চায়ের কাপ, চোখে কেমন হতাশা। অতনু হেসে বলল, 'তোমার ওই ঘুমভাঙানি চায়ের কাপের আজ দরকার নেই, নিজেই খেয়ো। এসো দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাও।'

উত্তর কলকাতার এই বিশাল লাল রঙের বাড়িটা এখন শুধু পৃথিবীর অতিকায় প্রাণীর কঙ্কালের মত এ যুগের জাদুঘরের সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েই আছে, ভেতরে সব ফোঁপরা। একসময় এক বিখ্যাত লাহা পরিবারের প্রাসাদ আজ একেবারে জরাজীর্ণ। তার ভাঙাচোরা পাঁজরে স্টেথো বসালেও সেদিনের রমরমা, অতীতের সেই সুগন্ধি স্পন্দন শোনা যাবে না। মূল পরিবার এখন নিশ্চিহ্ন, অপভ্রংশ জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের দু-একটি দুঃস্থ পরিবার অন্দরমহলের কোটা আঁকড়ে কোনওরকমে টিকে আছে। বাইরের মহলের বেশির ভাগ ঘর জং-ধরা, তালাবন্ধ। খানকয়েক কোনওরকমে ব্যবহারযোগ্য ঘরে দু-চারঘর ভাড়াটে পরিবার দিনগত পাপক্ষয় করে যাচ্ছে। তারা কি ভাড়া দেয়, কাকে ভাড়া দেয় বলা শক্ত।

এখানেই জনার্দন ভট্চাজের সঙ্গে দেখা হয়েছিল অতনুর। জনার্দন তারই বয়সী, মজার ছেলে। কাজ করে খিদিরপুর ডকে, সেটা গৌণ। এমন অদম্য জীবনীশক্তি, এমন প্রাণবন্ত ছটফটে খেয়ালী চরিত্র কমই দেখা যায়। পুঁথি সংগ্রহের সূত্রেই যোগাযোগ হয়েছিল নাটকীয়ভাবে। সে ঘটনা ভুলে যাবার নয়। ভাঙাচোরা একখানা ঘর নিয়ে একলা থাকে। বিয়ে-সাদি করেনি, করবার কথা বোধহয় মাথাতেই নেই। নিজের মেজাজে টগবগ করে যেন ফুটছে, দিব্যি আছে। পত্রপত্রিকার পোকা, সম্পাদকের নামে মাঝে মধ্যে জ্বালাময়ী চিঠি লেখে, শিকখোলা ভাঙা জানলার ধারে, কেরোসিন কাঠের টেবিলে ক্যাকটাসের কালেকশনটা দেখার মত। দেখলেই বোঝা যায় এইসব নয়, আরও পাঁচ রকমের ছবি আছে নিশ্চয়। কিন্তু কোনও কিছুর ওপরেই সে অর্থে টান বা আসক্তি নেই। প্রথম দিনেই বেহালাটা দেখে ফেলেছিল অতনু। কৌতুকের গলায় বলেছিল, 'সর্বনাশ, এও বাজানো হয় বুঝি?'

'সর্বনাশ তো বটেই। চাকরি না, ওই আমাকে ডকে তুলেছে।' বলেই জনার্দন

অতনুকে ইটের ঠেক দেওয়া তেপায়া চেয়ার থেকে তুলে তক্তপোশের ওপর বসিয়ে হেসে বলেছিল, 'ওটা দাদা ব্যালেন্সের চেয়ার। একটু বসুন, আপনাকে আমি চা খাওয়াব। কি রকম ফার্স্ট ক্লাস চা বানাই দেখবেন।'

আলো-আঁধারিতে ছুপানো সুড়ঙ্গের মত নির্জন অলিন্দের গোটা দুই মোচড় ঘুরে দোতলায় উঠে এল অতনু। অনেকদিন পরে এলেও তার চাক্ষুষ স্মৃতি প্রায় হাতে ধরে যথাজায়গায় পৌঁছে দিল দেখে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। ভেজানো দরজায় টোকা দিতেই ভেতর থেকে দরাজ গলার আহ্বান শোনা গেল।

'আসুন স্যার, আসতে আজ্ঞা হোক। জাস্ট স্টেপ ইন।'

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে ভোর সকালের গোলমেলে আলোয় চারপাশে কোথাও কাউকে দেখতে পেল না। অতনু অবাক। এইমাত্র যার গলা স্পষ্ট শুনেছে, এত দ্রুত সে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না। আর যাবেই বা কেন?

'এই যে আমি নিচে। মেরে এনেছি, আর দু মিনিট।'

কিন্তু নিচের দিকে তাকাবার আগেই তার চোখে পড়ল একজোড়া নাঙ্গা শ্রীচরণ তার নাক বরাবর ফণা তুলে রয়েছে। মাটিতে ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে সাপখোপ ভেবে চমকে গিয়েছিল। এবার নিচের দিকে তাকাতেই, চোখে চোখ পড়ল। চিনতে পেরে অতনু হেসে ফেলল। শ্রীমান জনার্দন শীর্ষাসনে রয়েছেন। অতনু বলল, 'এ কী ব্যাপার? যোগটোগও চলছে নাকি পুরোদমে?'

জনার্দন কথা বলল না, চোখের ইশারায় বসতে বলল। তারপর ঘড়ি ধরে ঠিক দু মিনিট পরে কিনা কে জানে, জনার্দন উলটি খেয়ে উঠে দাঁড়াল। সামনে এসে কৌতুকের গলায় বলল, 'না, মশাই, যোগবিয়োগ কিছু না। লাই পেয়ে একেবারে মাথায় চড়ে বসেছিল, তাই একটু দমন করা আর কি! মাথা দাবানোও বলতে পারেন।'

হেসে ফেলে অতনু বলল, 'অধমকে চিনতে পারছেন তো?'

'না পারব কেন? আপনি তো সেই রত্নগুপ্তি বিচিত্রম! দরজায় টোকা দেবার আগেই দেখে নিয়েছি।' বলেই ওপাশের দেওয়ালের দিকে আঙুল তুলে দেখাল। অতনু দেখল একটা ওভাল শেপের ফ্রেমে বাঁধানো আয়না টাঙানো আছে। এমন কোনাকুনি করে যাতে ঠিক তার উল্টোদিকের আধখানা পাল্লা-খসা জানলার ছবি পড়ে। শুধু জানলা না, তার বাইরে বারান্দার একটা অংশও পরিষ্কার দেখা যায়।

'হুঁ, এবার বুঝলাম।' অতনু বলল, 'আমি ভাই ওই পুঁথির ব্যাপারেই আপনাকে আবার একটু বিরক্ত করতে এসেছি।'

পলকে জনার্দন খাড়া হয়ে বসে বলল, 'কেন দাদা, কোনও ট্রাবলে পড়েছেন?'

ট্রাবল কথাটা অতনুকে গোপনে একটা খোঁচা দিল। পুঁথিটা যে নিছক নিরীহ

আর পাঁচটা পুঁথির মত নয় তা কি তাহলে জনার্দন আগেভাগেই জানত? অতনু সে ব্যাপারের দিকে না গিয়ে বলল, 'আরে না না, ট্রাবল কেন হবে! তা নয়, পুঁথি পড়তে গিয়ে একটা সামান্য কৌতূহল আমার মনে ঢুকেছিল, ভাবলাম আপনি যদি আমাকে কিছুটা আলোকপাত করতে পারেন!'

জনার্দন আবার ভাঁজ খেয়ে আরাম করে বসল, 'বেশ তো বলুন, কী আপনি জানতে চান?'

অতনু বলল, 'তার আগে একটা প্রশ্ন, আপনাদের পরিবার কি কখনও বাংলাদেশের বাইরে বসবাস করেছে?'

জনার্দন মাথা নেড়ে বলল, 'না, দাদা, কস্মিনকালেও না। কলকাতার বাইরেই কখনও যাইনি। আমরা বাসি বাঙালি বটে, তবে প্রবাসী না। কিন্তু একথা কেন?'

অতনু বলল, 'ওই যে বললাম, কৌতূহল। আমি যতদূর জানি রত্নগুপ্তি বিচিত্রম পুঁথিটা লেখা হয়েছিল বাংলার বাইরে কোথাও। জায়গাটার নাম অবশ্য পুঁথির মধ্যে কোথাও লেখা নেই। থাকলেও সে হয়তো ছিল সামনের খোয়া-যাওয়া পাতাগুলোর মধ্যে। শুনেছি পুঁথি যিনি লিখেছেন তিনি ওটা শেষ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। আর দেশে ফিরে আসেননি। কিন্তু পুঁথিটা কি রহস্যময় উপায়ে চলে এল কলকাতায়! তারপর হয়তো নানা হাত ঘুরে আপনাদের পরিবারের জিম্মায়। কিন্তু কেন?'

জনার্দন একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বহুকাল আগের ব্যাপার, আমি তো সব ভেতরের ব্যাপার জানি না, বাবা বেঁচে থাকলেও হয়তো জেনে নিতে পারতাম। তবে নানা হাত ঘুরে আসার কথা যে বললেন, সেটা ঠিক না।'

'আপনি বলতে চাইছেন, পুঁথিটা সরাসরি আপনার পরিবারের হাতে এসেছে?'

'ঠিক তাই। আমাদের বংশের এক পূর্বপুরুষ ছিলেন রাজজ্যোতিষী। একমাত্র তিনিই কিছুকাল বাইরে ছিলেন। শুনেছি কীর্তিগড় থেকে পালিয়ে আসার সময় পুঁথিটা তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসেন।'

'কীর্তিগড়? সে আবার কোথায়?'

জনার্দন মাথা নাড়ল, 'আমি জানি না, দাদা।'

জনার্দন এমন অসহায় ভঙ্গিতে সে জানে না বলল যে অতনু খুক্ করে হেসে ফেলল। সে যেন ভূগোলের ক্লাসে ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের সময় মহাসমুদ্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কোনও অজ্ঞাত দ্বীপের কথা জিজ্ঞেস করছে। জনার্দন মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, 'সত্যি দাদা, বিশ্বাস করুন একটুও বানিয়ে বলছি না। ছেলেবেলায় নামটা শুনেছিলাম এই পর্যন্ত, ও নিয়ে মাথাও ঘামাইনি। কবে হয়তো ভুলেও যেতাম। কিন্তু রবি ঠাকুরের একটা কবিতা ছিল আমাদের বাংলা বইয়ে, সেই যে একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়, আমাকে ভুলতে দেয়নি।

ওই বয়সে কল্পনার কোনও কি আর মাথামুণ্ডু থাকে! ভাবতাম আমাদের বংশের সেই মানুষটি মোটেই বীরপুরুষ ছিলেন না। এই নকলগড় থেকে তিনি তাহলে পালিয়ে আসবেন কেন! পরে বাবার হাত থেকে যখন ওই পুঁথির খাতাটা পাই তখন একটাই নির্দেশ আমাকে জানানো হয়েছিল যে, কোনওদিন কেউ যদি ওটার খোঁজে আসে, তাকে পুঁথিটা দিয়ে দিতে হবে। বাবার কথা বলেই ফেলতে পারিনি। পরে যখন জানলাম আপনি পুঁথি খুঁজে বেড়াচ্ছেন—'

কথাগুলো অতনু পুরো কান করে শুনছিল তা নয়। সে তখন মনে মনে অন্য কথা ভাবছিল। সে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'রাজজ্যোতিষী কাকে বলে জানেন?'

জনার্দন বলল, 'কেন, এ তো সবাই জানে যে—'বলতে গিয়ে জানাটা বোধহয় নিজের কাছেই কেমন গুলিয়ে যাওয়ায় হঠাৎ চুপ করে গেল।

অতনু ওর কথার মুড়ো ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'যে—?'

'মানে ইযে, যেমন আমরা বলি রাজমিস্তিরি, নাঃ, ঠিক হল না, রাজবৈদ্য, রাজরোগ, রাজভবন, একটা রাজকীয় বিশেষণ আর কী। একজন বিশেষজ্ঞ, প্রধান, মানে ভি আই পি বোঝাতে বলা হয়। কোনও রাজা-মহারাজারা, নিদেনপক্ষে জমিদাবেব পারিবারিক জ্যোতিষী। হয়তো কোষ্ঠী বা ছকটক বানিযে দিতেন, সেই থেকে—'

অতনু মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমার পরিচিত একজন শুনেছি অনেক নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধাব কবে দেন। এমনকি শুধু হাতের রেখা দেখেই জন্মসাল তারিখ নির্ভুল ছকে দিতে পারেন। এটা কম ক্ষমতা নয়। একটা গুপ্তবিদ্যা তাতে সন্দেহ থাকে না। তবে তিনি রাজজ্যোতিষী কিনা জানি না। যতদূর জানি কোনও রাজারাজড়ার সঙ্গে তাঁর সংস্রব নেই, নিজেই ঘর খুলে বসেছেন। যাকগে, ওঠা যাক।'

'সেকি! চা না খেয়েই, না, না, সে হয় না।'

চা খেতে খেতেই চিন্তাটা অতনুর মাথায় পাক খেতে আরম্ভ করেছিল কিন্তু জনার্দনকে সেকথা আর বলেনি। তার মনে হয়েছে, তার কাছে জনার্দন-পর্ব এখানেই শেষ। কিন্তু তার সেই রাজজ্যোতিষী পূর্বপুরুষের প্রসঙ্গ আবার নতুন করে মাথায় উদয় হচ্ছে। তিনি হয়তো কোষ্ঠী বা ছকটক বানিয়ে দিতেন, এই কথাটা মনের মধ্যে ফুট কাটতে লাগল। একটা ব্যাপারে ভুল নেই, যেখানেই হোক, যেমনভাবে আর যে কারণেই হোক অবনীবাবুর ঠাকুর্দামশাইয়ের সঙ্গে অন্তত সেই অন্তিম মুহূর্তে ভদ্রলোকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়েছিল। পুঁথির লেখক নিশ্চয় নিজেকে কোনও কারণে আর নিরাপদ বোধ করছিলেন না। আসন্ন বিপদের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিলেন। যে-কোনও মুহূর্তে ভালমন্দ কিছু একটা ঘটে যেতে পারে বুঝতে পেরেই এই রাজজ্যোতিষীর হাত দিয়ে পুঁথিটাকে পাচার

করে দিয়েছিলেন। তাঁর হিসেবমত তিনি ঠিক লোককেই বেছে নিয়েছিলেন যাঁকে কেউ সন্দেহ করবে না। এবং যিনি হয়তো স্বাভাবিকভাবেই দেশে ফেরার জন্য তখন প্রস্তুত। ভবিষ্যতে কেউ যদি পুঁথির খোঁজে আসে তাকে ওটি দিয়ে দেবার নির্দেশটা ঠিক মেলানো যাচ্ছে না। কেউ যে আসবে সে কে? কেউ বলতে কি যে-কেউ, না বিশেষ কেউ? মনে হয় সেটা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু এই পুঁথিতে অন্য কারও কি দরকার? ওর মধ্যে তার কি কোনওভাবে লাভবান হবার মত কিছু ছিল? একথা বাদ দিলেও সেই লোক কি করে কলকাতার এই ঠিকানা জানবে? নিজের মনেই অতনু মাথা নাড়ল। না, যে-কোনও লোকের পক্ষে সেটা জানা সম্ভব ছিল না। তাহলে? এখানেই চিন্তাটা এসে ধাক্কা খাচ্ছে, আটকে যাচ্ছে।

চা শেষ করে ধন্যবাদ এবং বিদায় জানিয়ে লাহাবাড়ি থেকে অতনু বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু চিন্তাটা তার মাথা ছাড়ল না। আধকপালে মাথা ধরার মত লেগেই থাকল। বাড়ি ফেরার পর বিদ্যুচ্চমকের মত কথাটা তার মাথায় খেলে গেল। ব্যাপারটা এমন নয়তো যে পুঁথির লেখকের মনে অন্য কোনও মতলব ছিল! এবং সেটা তিনি নিজে মনের মধ্যেই চেপে রেখেছিলেন। রাজজ্যোতিষীকেও তার আভাস দেননি। আসলে, অতনুর মনে হল, এটাই বোধহয় ঠিক, পুঁথিকার ভেবেছিলেন কীর্তিগড়ের জাল ছিঁড়ে যদি বেরুতে পারেন তবে দেশে ফিরে তিনি স্বচ্ছন্দে আবার তাঁর পুঁথি ফেরত নিয়ে নিতে পারবেন। যে কোনও কারণেই হোক সেটা আর বাস্তবে সফল হয়নি। শেষ ঝুঁকি নিয়েও আর বেরিয়ে আসতে পারেননি। তাঁর নিখোঁজ হয়ে যাওয়া এটাই প্রমাণ করে।

বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকল অতনু। পুঁথিকারের জন্যে বেশ কষ্ট বোধ করছিল সে। কিন্তু এ-ঘটনা ঘটে গেছে অনেক আগে, তার জন্মেরও বহু আগে নিশ্চয়। এখন আর কারও কিছু করার নেই। তবু ইতিহাসের কোনও কোনও চরিত্রের জন্যে কি মানুষের কখনও কষ্ট হয় না?

এই ট্র্যাজেডির মধ্যে এটাই সান্ত্বনা, তাঁর জীবদ্দশায়, বলতে গেলে প্রথম জীবনেই, সিংহবাবু রাজকুলের কাছ থেকে সেরা সম্মান ও স্বাধীনতার সনদ প্রাপ্তি ঘটেছিল তাঁর। 'সভাশিল্পী'র সম্মানিত আসনে তাঁকে কেবল বসানোই হয়নি, নিজের স্বাধীন পরিকল্পনা ও আয়োজন অনুযায়ী কাজ করে যাবার সবরকম সুযোগ আর সহযোগিতাই তাঁকে দেওয়া হয়েছে। আর স্থানীয় খণ্ড অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ, তাঁর নিয়োগকর্তা প্রভুর কাছেই শুধু যদি তাঁর গুণের মর্যাদা সীমাবদ্ধ থাকত তাহলেও কথা ছিল। 'গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না' কথাটা যে তাঁর বেলায় খাটেনি এটাই তবে মনে করা যেত। কিন্তু বাইরের এক মহারাজার কাছ থেকে 'রত্নাকর' উপাধি পাওয়া তো উড়িয়ে দেবার মত ব্যাপার না। কলমে

যার উদ্ভট শ্লোকের কবিত্ব, তুলিতে অবাক করে দেওয়া চিত্রকর্ম, আর উদ্ভাবনী মগজে ম্যাজিক ইঙ্কের জন্ম। আধুনিক কৌশলের মূর্তিতে সেই লোকটারই ভাস্কর্যের পরিচয় ফুটেছে।

নটরাজ মূর্তির কথাটা অতনুর মনে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মূর্তিটা নেই, এবার বুঝি সত্যি সত্যিই বরাবরের মতো নিখোঁজ। কিন্তু সেই ছালটা? এখনও সেটা তার হেফাজতে লুকনো। মনশ্চক্ষে সেই ফুলস্‌ক্যাপ সাইজের পুরো পৃষ্ঠাটা ভেসে উঠল ছবির মত। জয়দেব-মার্কা বঙ্গজ সংস্কৃতে সেই শ্লোকের লহরের মধ্যে বংশ-বিবরণের ওপর এক টুকরো জ্যামিতিক নকশা চাপানো। ভেঙেচুরে তুবড়ে দেওয়া মানচিত্রের আদল আছে তার মধ্যে। আর তার নিচে কোনও এক রাজপুরুষের জন্মছক। হয়তো এই রাজ-ইতিহাসের আদিপুরুষ, নয় এমন এক ব্যক্তি, যাঁর থেকেই উত্তরাধিকারের মোড় ঘুরেছে। স্বভাবতই এই মানুষটির বিশেষ গুরুত্ব আছে, আর সেই কারণেই তাঁর নির্ভুল পবিচিতি প্রতিষ্ঠিত আর নথিবদ্ধ করে রাখার জন্যে এই জন্মছক বা কোষ্ঠী ডাইজেস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এই কদিনে কেন যে একবারের জন্যেও ছকের জাতককে সে মাথা খাটিয়ে শনাক্ত করার চেষ্টা করেনি সেজন্যে নিজের ওপরেই অতনুর খুব রাগ হল।

আর এই রাগ থেকেই একটা বাইপাস যুক্তি তার বদ্ধ মগজে খেলে গেল। অবনীবাবুর ঠাকুর্দামশাইযের সঙ্গে এই রাজজ্যোতিষীমশাইয়ের যোগসূত্র, তাঁদেব ভেতরে আঁতাতের কার্যকাবণটি তার কাছে জলবৎ স্বচ্ছ হয়ে গেল। এই জন্মছকটির খসড়া নিশ্চয় এই জ্যোতিষী ভদ্রলোককে দিয়েই করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। পুঁথির খোয়াই পৃষ্ঠাগুলো, কে জানে হয়তো পুঁথির পরিশিষ্ট ছাড়া কিছু না। সব শেষের কথাগুলোই টেনে আনা হয়েছিল প্রথমে, নতুন রীতির মত। যাকে বলা যায় শেষ থেকে শুরু। এই অদ্ভুত স্টাইলটা আসলে হযতো পাঠককে ধাঁধায় ফেলার জন্যে। ধোঁকা খেয়ে মানুষ অন্য দিকে হাতড়ে মরবে। সামনের অদৃশ্য হওয়া পৃষ্ঠাগুলোয় হযতো, না, হয়তো কেন...নিশ্চয় রচয়িতার আত্মপরিচয় দেওযা ছিল। ছিল ওই ছকের একটা প্রতিলিপি—আশ্চর্যের কিছু নেই। রচনাকাল আর স্থানের নামটি সেখানে ছিল না, তাও কি হতে পারে! উত্তেজিত অতনু উঠে দাঁড়াল। তারপর দ্রুতপায়ে পায়চারি করতে লাগল। ঘরের ভেতরে পাক খেয়ে, চক্কর খেয়ে।

এই অবস্থায় অন্যমনস্ক না থাকলে হয়তো অতনু আগেই দেখতে পেয়ে যেত। চক্কর দিতে দিতে হঠাৎ চোখে পড়ল কিচেনের দিকের দরজার আধভেজানো পাল্লার আড়াল থেকে সুবলদা সন্তর্পণে উঁকি মেরে দেখছে। ব্যাপারটা কেমন বিসদৃশ ঠেকল। সুবলসখার স্বভাবের সঙ্গে ঠিক মেলে না। কিন্তু বলতে যাবে,

তার আগেই দোতলায় যাবার দরজার পর্দা সরিয়ে মা ভেতরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল, 'তনু, কী হয়েছে বাবা?'

বেশি খুঁজতে হল না। একটু দূর থেকেই সাইনবোর্ডটা চোখে পড়েছিল অতনুর। ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছিল, কাছে এসে কেমন দ্বিধায় পড়ল। কাজটা ঠিক হচ্ছে কিনা কে জানে! রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল। আসলে সঠিক করে সে কি জানতে চায় তা নিজেই এখনও ভেবে উঠতে পারেনি। বাঁ হাতটা আলগোছে পকেটের ওপর রেখে একটু চাপ দিতেই বুঝতে পারল জিনিসটা যথাস্থানেই আছে। না থাকার কোনও কারণ অবশ্য ছিল না। গোটা রাস্তাই সে হেঁটে এসেছে, ট্রাম-বাসের ভিড়ের ঝুঁকি নেয়নি। তবে বাড়িতে সময় সুযোগ থাকলে ছকটা সে নকল করেই নিয়ে আসত। পারেনি। এতদিন সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখত, পরে এভাবে প্রকাশ্যে সম্পূর্ণ অচেনা একটা মানুষের হাতে তুলে দেওয়াটা হয়তো ঠিক হচ্ছে না। সে আর শচীদুলাল ছাড়া তৃতীয় কেউ এখনও পর্যন্ত এটা খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পায়নি।

ঘরের ভেতরে কিছু মানুষের গলা শোনা যাচ্ছিল। আর একটু অপেক্ষা করতেই মহিলা পুরুষ মিলিয়ে জনা চারেক বেরিয়ে যেতেই সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে অতনু জ্যোতিষীর চেম্বারের দিকে এগিয়ে যেতেই কালো সিড়িঙ্গে চেহারার একটা লোক তার কানে কানে কথা কওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'চলে যান, উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

ঘরে ভদ্রলোক একাই ছিলেন। ছিপছিপে লম্বা চেহারা, মাথায় লম্বা বাবরি, কপালে চন্দনের ফোঁটা। হালকা গেরুয়া রঙের সিল্কের ধুতির ওপর একই রঙের সিল্কের হাফ-পাঞ্জাবি। নিচু তক্তপোশের উপরে সাদা ফরাস বিছানো। ক্যাশবাক্সের আকারে একটা ছোট ডেস্কের ওপর ঝুঁকে বসে ভেলভেটের টুকরোয় চশমার কাচ মুছছিলেন। পাশে পেছনে তাকিয়া নেই, শুধু থাকে থাকে সাজানো বইপত্র, পুরনো পাঁজি আর একটা টেলিফোন। মুখ না তুলেই ইশারায় ঘরের একপাশে দাঁড় করানো কাঠের বাক্সটি দেখিয়ে দিলেন। অতনুর জানাই ছিল। ঘরে ঢোকার মুখেই কালো সিড়িঙ্গে লোকটা বলে দিয়েছিল, কুড়িটা টাকা আগে বাক্সে ফেলতে হবে। অতনু পকেট থেকে একখানা কুড়ি টাকার নোট বের করে 'গুরুপূজার দক্ষিণা' লেখা বাক্সে ফেলে এসে তক্তপোশের সামনে হাতল-ছাড়া চেয়ারগুলোর একটায় বসল। চোখে চশমা পরা হয়ে গিয়েছিল। মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কি ব্যাপার বলুন?'

অতনু পকেট থেকে ভাঁজ করা টিসু পেপার বের করে সন্তর্পণে। সেখানা সে এমনভাবে ভাঁজ করে এনেছে যাতে কেবল ছকটুকুই দেখা যায়। জ্যোতিষীর

হাতে সেটা তুলে দিতে দিতে বলল, 'ছকটা দেখে এই জাতকের সম্পর্কে যদি কিছু বলেন—'

মিনিটখানেক নিবিষ্ট চোখে ভদ্রলোক ছকটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর পাশ থেকে কালো মলাটের একখানা চটি বই খুলে কি দেখতে লাগলেন। দূর থেকে অতনু ঠিক দেখতে পাচ্ছিল না। মনে হল টাইম-টেবিলের মত খুদে টাইপে ইংরেজিতে কিছু সংখ্যা ছাপা রয়েছে। পাতা উল্টে উল্টে কিছু খুঁজলেন ভদ্রলোক। তাঁর কপালে দু-তিনটে ভাঁজ পড়ল। মুখ তুলে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এই ছক কোত্থেকে পেলেন? কে করেছে?'

অতনু বলল, 'সেটা আমার জানা নেই। কেন, কিছু গোলমাল আছে নাকি?'

ভদ্রলোক মুখের একপাশে হাসলেন, 'কেউ আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করেছে। এটা কোনও ছকই নয়।'

'ছকই নয়?' অতনু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'নয়ই তো!' ভদ্রলোক হাতের কাগজটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'এর মধ্যে অনেক গণ্ডগোল আছে।'

অতনু কেমন বোকা হয়ে গেল। এরকম একটা পরিস্থিতির জন্যে সে তৈরি ছিল না। কি বলবে ভেবে পেল না। ভদ্রলোক নিজেই আবার বললেন, 'জাল! একেবারে ভুয়ো ব্যাপার। মায় সাল তারিখসুদ্ধ।'

'সরি। তাহলে চলি।' অতনু উঠে পড়ল। তার মাথার ভেতরটা কেমন টলছিল। সে কিছুই বুঝতে পারছিল না এমন কেন হবে। এমন একটা সিরিয়াস ব্যাপারে কি কেউ ঠাট্টা করে কখনও! রত্নাকর কখনওই সে ধরনের মানুষ হতে পারেন না। ছকটা যদি রাজজ্যোতিষী নিজেও করে থাকেন, একটা ছক বানাতে তাঁর আদৌ গোলমাল হবার কথা নয়। তবে কি অবনীবাবুর ঠাকুর্দামশাই কপি করার সময় ভুল করেছেন! কিন্তু এটাও তার কাছে কেন যেন বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল না। এত অসাবধান মানুষ হলে তো অনেক কিছুতেই তিনি গোলমাল পাকিয়ে বসে থাকতেন। তা নয়, নিশ্চয়ই তা নয়। এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য আছে। কিন্তু কি সেই রহস্য? হঠাৎ পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল অতনু। একটা চিন্তা মুহূর্ত আগেও তার মাথায় আসেনি।

অতনুর মনে হল এই ছকটা যে কিছু নয়, ফালতু, একথা মৃত্তিকার নিজেও জানতেন। জেনেশুনেই এটাকে তিনি একটা ধোঁয়াশা সৃষ্টির জন্যে ব্যবহার করেছেন। হয়তো পাঠককে বিভ্রান্ত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চেয়েছিলেন কৌতূহলী মানুষের চোখকে ওই কাগজের অন্য তথ্য থেকে সরিয়ে অন্য দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া। এবং শেষ পর্যন্ত এক গোলকধাঁধায় ফেলে দেওয়া। যাতে মনে হয় পুরো ব্যাপারটাই একটা রসিকতা ছাড়া কিছু নয়।

ডাইভার্সান! মনে মনে হাসল অতনু। ভদ্রলোক মজাটা কিন্তু মন্দ করেননি। আসল জায়গা থেকে সরিয়ে আনার জন্যে পুরো ব্যাপারটাকেই হাস্যকর বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। এই স্ট্র্যাটেজি, অবাঞ্ছিত লোকের মগজ ধোলাইয়ের এই রণকৌশলের প্রশংসা করতেই হয়। সুতরাং এটা এখন স্পষ্ট যে নটরাজ মূর্তিটা নিজে যথেষ্ট মূল্যবান হলেও সেখানেই তার ঐশ্বর্য ফুরিয়ে যায়নি, অন্য কোনও ধনরত্নের ভাণ্ডারের চাবি, সাংকেতিক নক্‌শার বাহন হয়ে উঠেছে। রাজপরিবারের পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাস এই দেবমূর্তি যার কাছে থাকবে তার কল্যাণ, তার মঙ্গল, তার সর্বসিদ্ধি সুনিশ্চিত—তাহলে ধর্মীয় কুসংস্কার, কি মূর্তিপুজোর দায় চাপিয়ে দেবার চতুর কৌশল ছিল না। অন্তত আগে এই দৈববিশ্বাসের নেপথ্যের কারণ যাই থাক, পরবর্তীকালে সেই কিংবদন্তীকেই কাজে লাগানো হয়েছিল। ভৈরব মূর্তির নটরাজে রূপান্তরের পর্বেই খুব সম্ভব এর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। পুঁথির বিবরণ খুঁটিয়ে তালাশ করতে গিয়ে অতনু শেষতক আবিষ্কার করেছে মহাদেবের ওই মূর্তিটা ছিল নিরেট স্বর্ণমূর্তি, নটরাজের তুলনায় স্বভাবতই আয়তনে খাটো, তবে রত্ন দুটির অস্তিত্ব তখনও ছিল।

নটরাজের জন্যে আর এক দফা মন খারাপ হল। মূর্তিটা হাত ঘুরে হয়তো ইতিমধ্যেই বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। এমন ধনী পুরাতত্ত্ব সংগ্রহকারীর অভাব নেই যারা মিলিয়ান কিংবা বিলিয়ান ডলার দিতেও কার্পণ্য করবে। দেশের সম্পদ বাইরে চলে গেছে ভাবতে কার না দুঃখ হয়। অতনুরও হল। তবে সান্ত্বনা এই, মূর্তিচোর ওই মূর্তিকেই ভুলেছে, নটরাজের পেটের কথা জানবার সুযোগ তার হয়নি। তাই এখনও অনেক কিছুই তাদের হাতের বাইরে চলে যায়নি।

মনটা হালকা হয়ে এসেছিল। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে চলতে চলতেই ধরিয়ে নিল অতনু। এই প্রথম সিগারেটের ধোঁয়ায় মেজাজটা বেশ ফুরফুরে হয়ে উঠল। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছিল অতনু। সামনেই একটা চায়ের দোকান দেখে মনে পড়ল সকাল থেকে আজ তার চা খাওয়াই হয়নি। কিন্তু দোকানের চেহারা দেখে উৎসাহ উবে গেল। নিচু ছাদের ঘর, ভেতরে গোটা তিন-চার বিশ্রী বেঞ্চ আর টেবিল পাতা। ধোঁয়ায় ময়লায় কালো হয়ে যাওয়া ড্রামে জল ফুটছে। রোদ আড়াল দেবার জন্যে এক ফালি ত্রিপল ঝুলছে একপাশে। তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল এক দঙ্গল ছোকরা চায়ের গেলাস হাতে গুলতানি করছে। তাদের আলোচনার বিষয় থেকে হেমামালিনী ছিটকে এল।

'এই যে দাদা, মালটা ভোগে চলে গেল কিন্তু।'

দোকানটা পেরিয়ে আসতেই এক ছোকরা খুব সম্ভব অতনুকে লক্ষ্য করেই আওয়াজ দিল। এক ঝটকায় দাঁড়িয়ে পড়েই অতনু পিছন ফিরল। আর পিছন

ফিরতেই মনে হল কে একজন সাঁ করে ঝোলানো ত্রিপলের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। পলকের জন্যে তার পা দুটো দেখা গেল। এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে পড়েই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। সম্ভবত একটা রিকেটি গলি আছে ওপাশে। এই উত্তর কলকাতায় ওরকম শেকড়বাকড় অজস্র ছড়ানো। ছুটে যাবার কোনও অর্থ হয় না। ঘিঞ্জি বাড়িঘরের কোন ফাটলে সে সেঁধিয়ে গেছে কে জানে! চায়ের দোকানের ভেতর থেকে এক ছোকরা বেরিয়ে এসে রাস্তা থেকে কি কুড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'এই যে দাদা, খুব লস হয়ে যেত মাইরি, একেবারে ভর্তি মাল।' সিগারেটের প্যাকেটটা একবার ঝাঁকিয়ে পরখ করেই অতনুর হাতে তুলে দিল। দামী প্যাকেট, চোখ চকচক করছিল ছোকরার। অতনু বুঝল অন্যমনস্ক হাতে পকেটে ঢুকিয়েছে ভেবেছিল কিন্তু ঢোকেনি।

'একটা কমিশন হবে না? আমরা পেয়ে থাকি—'ছোকরা দাঁত বের করে হাসল।

অতনুর মাথায় তখন অন্য চিন্তা ঘুরছিল। অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'ওঃ, সিওর।' তারপর একটার জায়গায় গুটি তিনেক সিগারেট অবাক ছেলেটার হাতে গুঁজে দিয়ে সে আবার ফিরে চলল। একদম সজাগ অবস্থায়। কিন্তু আট-দশ গজ এগিয়েই তার গতি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল।

চিন্তাটা এত হঠাৎ মাথায় খেলে গেল যে পথের মাঝখানেই অতনু পাথর হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ তাজ্জব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল, চোখের পলক পর্যন্ত পড়ল না। এরকম সহজ ব্যাপার কেন যে এতদিন ধরতে পারেনি কে জানে! লুকোচুরির এই উল্টো প্যাঁচটা বেমালুম চোখে ধুলো দিয়ে বসেছিল। আর সে আকাশপাতাল ভেবে মরেছে।

আসলে চোখের খুব বেশি কাছে আনলে যেমন কিছুই দেখা যায় না, এও তেমনি। একেবারে চোখ ছুঁয়ে থেকে নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল।

অনেক কথা আর নকশার ওপর ম্যাজিক ইঙ্ক চাপিয়ে গুরুত্ব দেবার চেষ্টা হলেও এই ছকটাই কেবল ছিল সাদা হাতের ড্রইং। পুঁথি লেখার সাবেক কালিতে এর রেখা আর লেখা নিছকই হেলাফেলায় সারা হয়েছিল। এই ব্যাপারটা তার আগেভাগেই লক্ষ্য করা উচিত ছিল। অথচ করেনি। সে ভাবতেই পারেনি এর পিছনে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে। ডাইভার্সান কথাটা মাথায় ঘাই মারার পর থেকেই তার ব্যাখ্যাকে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আরও নতুন যুক্তির ওপর দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছিল। আর যতই করছিল, একটা অদ্ভুত অস্বস্তি কেন যেন তার ভেতরে খোঁচা মারছিল। মেয়েদের উপমাই মাথায় এসে যাচ্ছিল। সাজপোশাক প্রসাধনের জলুস দিয়ে যারা মানুষের নজর কাড়তে চায়, অপরের

চোখ-মনকে বেঁধে ফেলতে চায় তারা বাজে, ফালতু, অন্তঃসারশূন্য। মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুচ্চমকের মত চিন্তাটা মাথায় খেলে গেল। সে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার মাঝখানে। তার ধারণা বদলে যেতে মুহূর্তের বেশি সময় লাগল না। বুঝতে পারল ওই গণ্ডগুলে, অসংলগ্ন হাস্যকর ছকটাই আসলে দ্রষ্টব্য, রহস্য যদি কিছু থাকে ওর মধ্যেই আছে। নজরকাড়া বাদবাকি সব বাজে, ফালতু, অন্তঃসারশূন্য! আড় ভেঙে অতনু দাঁড়াল না, লম্বা পায়ে হঠাৎ হাঁটা দিল।

অতনু ভুলে গেল তার পেছনে কেউ লেগেছে! যে তার প্রায় গায়ে গায়ে আসছিল সে এখনও হয়তো তার পিছু ছাড়েনি। নক্শাটার খবর তার হয়তো এই মুহূর্তে আর অজানা নেই। জ্যোতিষী ছকটাকে কোনও আনাড়ি উন্মাদের রসিকতা বলে একেবারে নস্যাৎ করে দেবার পর সত্যি বলতে কি অন্য কোনও চিন্তাই তার মাথায় ঘেঁষেনি। তার একবারও তলিয়ে দেখার কথা মনে হল না যে, সেই কালো সিঁড়িঙ্গে চেহারার লোকটা—যাকে চেম্বারের দরজা আগলানো কাজের লোক মনে হয়েছিল, হোটেলের খদ্দের পাকড়ে-আনা দালালের মতই যে অতনুকে আপ্যায়ন করে ভেতরে পাঠিয়েছিল সে আসলে কে? জ্যোতির্ষীর চেম্বারের কেউ কি? যদি তাই হবে তাহলে কুড়ি টাকা প্রণামী দিয়ে সে যখন বোকার মত বেরিয়ে আসছিল তখন তাকে ধারে-কাছে কোথাও দেখা যায়নি কেন? অতনু জ্যোতিষীর চেম্বারে যাবার আগে সে হয়তো আদৌ সেখানে ছিল না, এবং পরেও না। কিন্তু এসব এখন ভাববে কে? এই মুহূর্তে অতনু ছকের বাইরে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। নতুন একটা মতলব তার পায়ের গতি পালটে দিল। বাড়ির দিকে চলতে চলতে সে হঠাৎ কলেজ স্ট্রিটের দিকে বাঁক নিল। এটাই তার বরাবরের স্বভাব, শোনা কথায় তার মন কখনও সন্তুষ্ট হয় না। অর্ধেক পেলে মন ভরে না। একগুঁয়ে একরোখা স্বনির্ভর মানুষের যা হয়! যে-কোনও ব্যাপারেই হাতে-কলমে খতিয়ে দেখার জন্যে সে যেন আদাজল খেয়ে তৈরি হয়েই রয়েছে। বইপাড়ার দু-চারটে দোকান ঘুরে জ্যোতিষ বিষয়ের বই খুঁজল। কোষ্ঠীবিচার, ছকরহস্য, দশাবিচার—এমনি ধারার খানকয়েক পছন্দসই বই কিনে অনেক বেলায় বাড়ি ফিরল।

সুবলদা দরজা খুলে ব্যাজার মুখে বলল, 'বাড়িতে কেউ নেই।'

ঘরের দিকে যেতে যেতে অতনু বলল, 'আবার কি হল?'

'নেমন্তন্ন! বাড়িসুদ্ধ। আর দেরি কোরো না।'

অতনু থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, 'আমারও? তার মানে? কোথায়?'

সুবলদা একটু তফাত থেকেই কথা বলল। কাছে এল না। কাল না পরশু, কবে থেকেই ওর যেন কেমন ছাড়ো-ছাড়ো ভাব। মুখে হাসিটি নেই। বাড়ি বিক্রির কথা শোনার পর থেকেই কিনা ঠিক মনে করতে পারল না। সুবলদা বলল, 'ওখানে।'

অতনু বিরক্ত হল। সেই আধপেটা কথা!

'কোথায়? কী ব্যাপারে? একটু ঝেড়ে কাশো!'

ফুরোনো টিউব টিপে টিপে পেস্ট বের করার মত কথা বের করতে দেখলে কার না রাগ হয়। সুবলদা তাই করছিল।

'ছোট বউদিমণির বাপের বাড়ি। উচ্ছব।'

'চমৎকার। তা তুমিও গেলে পারতে।' অতনুর গলার স্বর ক্রমশ গরম হচ্ছিল, 'মোচ্ছবটা কিসের?'

'যাব সেরকমই তো কতা। তোমার মা জননী পিতিক্ষে করে করে এই গেলেন।'

'ঠিক আছে, যখন যাবে বোলো, আমি দরজা বন্ধ করে দেব। বলে দিয়ো যেতে পারছি না, আমার জরুরি কাজ আছে।'

সুবলদা বিড়বিড় করে কি বলল। অতনু আর দাঁড়াল না। একটু পরে সে যখন বইযের মধ্যে ডুবে গেছে তখন সুবলদা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল, 'তোমার খাবার ঢাকা দেওয়া আছে।'

অতনু অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'ঠিক আছে, পিছনের দরজায় তালা দিয়ে চলে যাও।'

একটা জিনিস অতনু বুঝতে পারছিল এসব দীর্ঘদিনের চর্চার জিনিস, একদিন মাথা খুঁড়েও খুব সুবিধে হবে না। ছকটা তার কাছে একই রকম ধাঁধা মনে হচ্ছিল, এর তলায় তলায় অন্য কোনও ইশারা আছে কিনা মাথায় ঢুকছিল না। আজ হঠাৎ সুপর্ণার কথা নতুন করে মনে পড়ে গেল। হাত দেখা ব্যাপারটা ও কার কাছে শিখেছিল কে জানে! বোধহয় ভালই রপ্ত করে ফেলেছিল ব্যাপারটা। দূর থেকে হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়েছে এক একদিন। ওকে ঘিরে মেয়েদের জটলা লেগেই আছে। তখন কত, ফার্স্ট ইয়ারের শেষ দিক বোধহয়। কি ব্যাপার প্রথমে বোঝেনি। পরে পাশ দিয়ে যেতে যেতে একদিন দেখতে পেল এক চালিয়াত ছোকরা ওকে একা পেয়ে ওর সামনে গিয়ে কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত কায়দায় হাত বাড়িয়ে আছে। অতনু আর ওদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। হয়তো প্রেমটেম নিবেদন হচ্ছে। কিন্তু কথা কানে এসে গিয়েছিল তার। আপনার কাছে হাত পাততে এলাম। সুপর্ণার গলায় ব্যঙ্গ, কেন,

ভিক্ষেয় নামা হয়েছে নাকি! ফিউচার জানতে কার না ইচ্ছে হয় বলুন। আমি ছেলেদের হাত দেখি না, বলেই সুপর্ণা হনহন করে ক্লাসরুমে ঢুকে গিয়েছিল। সেই থেকে অতনু বুঝেছিল মেয়েটা হাত দেখতে জানে। পরে, বহুকাল পরে, তার ঘরে সেদিন কেমন দুম করে বলে বসল কথাটা। প্রথমে চমকে উঠেছিল, ভেবেছিল থট রিডিং, মেয়েটা বোধহয় মনের কথা পড়তে জানে। সুপর্ণা বলেছিল, আবার কবে পালাচ্ছ সেই কথাটা শুনে রাখি। পরে এক ফাঁকে বলেছিল, তোমার হাতের রেখাই বলছে তোমার পায়ের তলায় মাটি নেই। তুমি জন্মপ্রবাসী। ব্যাপারটা কেমন একটু গোলমেলে।

তা গোলমেলে তো বটেই। মনে মনে এক ধরনের দুর্বলতা জন্মে গিয়েছিল সুপর্ণার ওপর। দুদিনেই খুব কাছের মানুষ মনে হয়েছিল কেন জানি। এরকম একজনের ওপর সত্যিই নির্ভর করা যায়। অতীতকে যে ভোলেনি, এতকাল পরেও ছুটে এসেছে, মনে মনে প্রতীক্ষা করে না থাকলে এমনটা কি আর সম্ভব! গায়ে-পড়া ভাব নেই অথচ এক টানে কত সহজে আপনি থেকে তুমিতে নামিয়ে এনেছিল তাকে। অথচ এত কিছুর পিছনে যে শুধুই কৃতজ্ঞতা বোধ আর নিজেকে সেই দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী করে সেই অনুতাপ থেকে মুক্তি চাইছিল সুপর্ণা, এ তার কল্পনায়ও আসেনি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে স্বপ্নভঙ্গ ঘটাতেও ইতস্তত করেনি। নিজের ঠিকানা দিয়ে বেড়াতে যাবার আমন্ত্রণ জানাতে সে ভোলেনি কিন্তু সেটা ওভাবে না হলেই হত। সে কি ভেবেছিল অতনু কোনও দুর্বল মুহূর্তে এইবার মুখ ফুটে প্রস্তাব করে বসবে, প্রেমে পাগল আর পাঁচটা উদ্‌ভ্রান্ত তরুণের মত। কিংবা সেই গায়ে-পড়া চটুল ছোকরাটির মত সেও হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, তোমার কাছে হাত পাততে এসেছি পর্ণা। ও বলবে, ভিক্ষেয় নামা হয়েছে বুঝি! আমি তোমার কত নম্বর জানতে পারি কি? কিংবা দুঃখ জানিয়ে বলতে পারত, এখন যে বড্ডই দেরি হয়ে গেছে, অতনু। তোমার সঙ্গে আবার কখনও দেখা হবে কিছুকাল আগেও যদি জানতে পারতাম! কিন্তু তা না করে, সরাসরি তার সংসার দেখে আসার প্রায় চ্যালেঞ্জ জানানো। অতনুর মনে হয়েছিল মুখের ওপর দরজাটা আচমকা বন্ধ করে দিতে গিয়ে তার অসাবধান হাতের একটা আঙুল থেঁতলে দিল সুপর্ণা।

ঘটনাটা মনে পড়ে গিয়ে অতনুর মনটা এতই খারাপ হয়ে গেল যে সে আর ছকের মধ্যে মন বসাতে পারল না। গুম হয়ে বসে থাকল।

ঝিল রোডে পৌঁছে শচীদুলাল দেখল বাড়ির হাওয়া কেমন গোলমেলে। দোতলা তালাবন্ধ করে সন্দীপ সর্বাধিকারীর ভাইপো কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে! ব্যাপার

কি বোঝার জন্যে বাড়ির পিছন দিকে ভাড়াটেদের মহলে খোঁজ নিতে গেল। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বোধহয় ঘরের কোনও কাজ করছিলেন। তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন। অচেনা মুখ দেখে অবাক হয়ে তাকালেন। শচী ওপরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'ওপরের ভদ্রলোকের কোনও খবর জানেন? আমাকে আজ আসতে বলেছিলেন।'

কথাটা অবশ্য বানানো। আজই তার এখানে আসার কথা ছিল তা নয়। সে নিজে থেকে এসেছিল, এসেছিল নতুন একটা মতলব ভেঁজে। কিন্তু সেকথা এদের জানাবার দবকার নেই।

ভদ্রলোক আঁতকে উঠে বললেন, 'আপনিও! সকাল থেকে এই নিয়ে তিনজন ফিরে গেলেন। আপনার কত গেছে?'

শচী বলল, 'আজ্ঞে আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। গেছে বলছেন কেন?'

ভদ্রলোক আক্ষেপের গলায় বললেন, 'বাড়ির ব্যাপারে অ্যাডভান্স তো? ও আব ফেরত পাবেন মনে হয় না। কাল থেকে ভদ্রলোক বাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে গেছেন। আর ফিরে আসবেন মনে হয় না।'

শচী বলল, 'কি করে বুঝলেন আর আসবেন না? কোনও দরকারে হয়তো কোথাও—'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। বললেন, 'দোতলার চাবি এখন এখানকার থানার কাস্টডিতে। সন্দীপবাবুর দুই দিদিই নাকি জানিয়েছেন, এই বাড়ি তাঁদের বাবার স্মৃতি। এ যেমন আছে থাকবে। খুব শীগগিরই তাঁরা আমেরিকা থেকে আসছেন। এ-বাড়ি রক্ষার জন্যে যা করবার তাঁরাই করবেন।' একটু চুপ করে থেকে ভদ্রলোক ফের বললেন, 'আমাদের অবশ্যি কতরকম কথাই কানে আসছিল। কখনও শুনছিলাম এ-বাড়ি আমাদের ছেড়ে দিতে হবে। কখনও শুনছিলাম, না, এক্ষুণি উঠে যাবার কথা ভদ্রলোক বলবেন না। আপাতত ভাড়া ডবল হচ্ছে। কে একজন বলল, এ-বাড়ির ছাদটা নাকি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। পরে শুনলাম, না, প্রমোটার আসছে, এখানে মালটি-স্টোরিড বিল্ডিং হবে। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, প্রায় ঘাসের শেকড় ধরে ঝুলে আছি। এই বাজারে যাব কোথায়?'

শচী আর কি বলবে! সে নিজেই কিছুটা হতাশ, ভেবেছিল একটা খবর কৌশলে বের করে নিতে পারবে। হল না। ঝিল রোড থেকে বেরিয়েই মনে হল ব্যাপারটা অতনুকে জানানো দরকার।

অতনু বাড়িতেই ছিল। দরজা খুলে কয়েক মুহূর্ত শূন্য চোখে ওর দিকে

তাকিয়ে থাকল। শচীর কেমন সন্দেহ হল। বলল, 'কী হয়েছে তনু, কী ব্যাপার? আবার কিছু—'

অতনু বলল, 'না, ছকটা নিয়ে একটু ঝামেলায় আছি।'

শচী বলল, 'মাসিমা কোথায়? একবার দেখা করব ভেবেছিলাম।'

'মা বাড়িতে নেই। ভেতরে আয়, কথা আছে।'

ঘরে ঢুকে শচী চমকে উঠল। টেবিলের ওপর বইগুলো ছড়ানো। অতনু শেষ পর্যন্ত জ্যোতিষচর্চায় নেমেছে নাকি! অবাক গলায় শুধোল, 'এসব কী?'

অতনু বিমর্ষ গলায় বলল, 'আরে বলিস না। আজ এক জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলাম। লোকটা বলল, পুরো ব্যাপারটাই নাকি ভুয়ো।'

'পুরো ব্যাপার বলতে?'

অতনু বলল, 'মূর্তির ভেতরের কাগজটার কথা তোর মনে আছে তো? লেখালিখির তলায় একটা ছক ছিল, জন্মছক—মনে আছে নিশ্চয়। ওটা নাকি কোনও ছকই নয়, কেউ তামাশা করে জুড়ে দিয়েছে।'

'বলো কী!' শচীর সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

'অথচ এটা কোনও আজেবাজে লোকের তো কর্ম নয়। অবনীবাবুর ঠাকুর্দামশাইয়ের নিজের হাতে আঁকা। তিনি তো কারও সঙ্গে মজাতামাশা করার মানুষ ছিলেন না। বিশেষ করে এর পরেই তিনি নিঁখোজ হযে গিয়েছিলেন, সেটা ভাব।'

শচী আপনমনে বলল, 'তাই তো, সবাই যদি একে একে নিখোঁজ হয়ে যেতে থাকে!'

অতনু অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল, 'কার কথা বলছিস?'

শচী বলল, 'বলছিলাম কি, কাল থেকে তোমার প্রাণগোবিন্দ হাওয়া হয়ে গেছে।'

'আমার প্রাণগোবিন্দ! তার মানে?' অতনু ভুরু কুঁচকে তাকাল, 'সে কে? আমাদের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? দ্যাখ শচে, আমি মরছি নিজের জ্বালায়, এ সময়—'

প্রাণগোবিন্দ অধিকারী না সর্বাধিকারী, ঝিল রোডের সন্দীপের সেই ভুঁইফোঁড় ভাইপো। ভ্যানিশ!'

'অ্যাঁ!' অতনু যেন এতক্ষণে খেয়ালে ফিরল।

'হ্যাঁ। জ্বালার কথা যদি বলো, সেও তোমার কম জ্বালা ছিল না গুরু! আমার তো ক্রমশ সন্দেহ হচ্ছিল অন্য রকম, এই তোমার সেই মেঘনাদ কিনা। সম্পর্কে ভাইপো হলেও খুড়োর থেকে সে বছর কয়েকের বড়ই হবে। সন্দীপের

পারিবারিক অন্ধিসন্ধি তার নখদর্পণে। সন্দীপের দুই দিদির হালহদিস তার জানা ছিল। ইন ফ্যাক্ট সে-ই সরাসরি ওঁদের সঙ্গে কনটাক্ট করার চেষ্টা করে। বাবার হাত ধরে তুমি বার কয়েক ঝিল রোডে গিয়েছ, জানার পর থেকে আমার মাথায় অন্য চিন্তা ঘুরতে থাকে। প্রাণ তখন তোমাকে ও বাড়িতে দেখে থাকতে পারে। তোমার বাবা ও বাড়িতে কার কাছে কি দরকারে যেতেন জানি না, তবে সন্দীপ শুনেছি শিশুকাল থেকেই বাড়ির বাইরে, হস্টেলে থাকত। তার সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ না হবারই কথা।' শচী থেমে অতনুর মুখের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছিল।

'কিন্তু উইল ওকে জব্দ করেছে।'

'সেটাই বলতে চাই। তখন থেকেই আক্রোশ, হিংসা, প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে জেগে ওঠা আশ্চর্য নয়। প্রাণ আমাকে মাস তিনেক পরে দেখা করতে বলেছিল। কিন্তু আমি নাছোড় হওয়ায় মত বদলেছিল। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই আমার হাজার পঁচিশ টাকা অ্যাডভান্স দেবার কথা ছিল। আমি তার আগেই একটা খবর বের করার তালে ছিলাম, হল না। তার আগেই উধাও হয়ে গেল। শুনতে পেলাম বেশ কয়েকজনের কাছ থেকেই ও ওইরকম মোটা টাকা খেয়েছে, কাগজে কলমে তার অবিশ্যি কোনও প্রমাণ নেই। মানুষ তো অতি লোভেই ঝুঁকি নেয়, জালিয়াতির শিকার হয়!'

অতনু বলল, 'কিন্তু ঘটনা যদি ঠিক উল্টো হয়!'

শচী পলক খানেক কি ভেবে বলল, 'পুরোটাই রটনা বলছ? আমি অবশ্য একজন পাওনাদারকেও চোখে দেখিনি।'

'সন্দীপের দিদিরা এই মুলুকের ঘরবাড়ি নিয়ে মাথা ঘামাবেন না এটাই স্বাভাবিক। এটা শেষ পর্যন্ত—'

'সে গুড়ে বালি।' শচী বলল, 'দিদিরা ওকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন তা হবে না।'

'তাহলে তো ল্যাটা চুকেই গেল।' অতনু বলল, 'কিন্তু ব্যাপারটা যদি উল্টো হয়, ধরো প্রাণগোবিন্দ নিজে উধাও হয়ে যায়নি। তার কোনও বিপদ হয়েছে।'

শচী মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছ, এই পয়েন্টটা তো ভেবে দেখা হয়নি।'

অতনু বলল, 'হ্যাঁ, রঞ্জুপ্রসাদের ব্যাপারেই আমার খটকা লেগেছিল। তিনি তো কীর্তিগড়ের মানুষ। প্রাণগোবিন্দের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটার কথা না। তাছাড়া এই মূর্তি, পুঁথি সবই তো অবনীবাবুর ঠাকুর্দামশাইয়ের আমলের কথা। এ যুগের এক ছোকরার পক্ষে অত বড় জাল বিছোবার সুযোগ কোথায়?'

শচী বলল, 'রঞ্জুপ্রসাদ তো জানিয়েছেন তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হচ্ছেই।'

'হ্যাঁ, টাইপ-করা চিঠি, যেভাবে এসেছে সব মিলিয়ে আমার মনের মধ্যে খটকা আছে।'

শচী বলল, 'আমারও। মনে হচ্ছে রঞ্জুপ্রসাদের নামটা বারে বারে ভাঙানো হচ্ছে।'

অতনু বলল, 'ভাবছি চলেই যাব।'

'কোথায়?'

'স্পটে। সরেজমিনে না দেখলে বোধহয় ধাঁধা থেকে বেরোনো যাবে না। এই ছকটাও আমাকে কি রকম জটে ফেলল বুঝতেই পারছিস। তার ওপর—'

শচী কিছু মন্তব্য না করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অতনু বলল, 'তার ওপর পিছনে কেউ লেগেই আছে। কী চায় সে?' সকালের ঘটনাটা অতনু ওকে ততক্ষণে বলার সুযোগ পেল।

সব শুনে শচী ভেতরে ভেতরে উত্তেজনা বোধ করছিল। বলল, 'তাহলে চলো, দু ভাইয়ে দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ি। কিছু না হোক, অনেক দিন পরে আমার একটা আউটিং হবে। কবে যাবে? একটা দিন অন্তত আমাকে টাইম দিয়ো।'

শচীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সদরে বেল বেজে উঠল। ওরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল এক পলক। অতনু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'অসময়ের অতিথি! তুই বোস, আমি দেখছি।'

শচী ঘরে বসেই দরজা খোলার শব্দ শুনল। তারপর চুপচাপ। কি হল বুঝতে না পেরে শচী ভেতরে ভেতরে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল, কি হতে পারে কিছুই আন্দাজ করতে পারছিল না। উঠে গিয়ে দেখবে কিনা ভাবছে এমন সময় খুব অস্পষ্ট কথার গুনগুনানি যেন শোনা গেল। আবার নৈঃশব্দ্য। চিন্তিত শচী হাঁক দিল, 'কী হল, তনু?'

জবাব নেই। শচী এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল কিন্তু পা বাড়াবার আগেই অতনু চেঁচিয়ে বলল, 'এসে গেছে শচে, এসে গেছে।' বলেই দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিয়ে অতনু দ্রুতপায়ে ঘরে এসে ঢুকল, 'ডাক এসে গেছে।'

অতনুর বাঁ হাতে একটা মুখ-ছেঁড়া খাম, ডান হাতে সুদৃশ্য চিঠির কাগজ। বলল, 'এবার কুরিয়ার সার্ভিসে রঞ্জুপ্রসাদ!'

শচী ঝুঁকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু এ যে দেখছি রঞ্জুপ্রসাদ সিংহ! মনে হচ্ছে অন্য কেউ।'

অতনু মাথা নেড়ে বলল, 'অন্য লোক নিশ্চয়ই না, তবে অন্য হাতের

লেখা। ঝকঝকে, চোখা, ধারালো পাকা অক্ষর। এর আগের রঞ্জুপ্রসাদের কাঁপা-কাঁপা বাঁকাচোরা অক্ষরের সঙ্গে কোনও মিল নেই। পড়ছি শোন: সবিনয় নিবেদন, আমাদের বিচারে আপনি এবার আমাদের সম্মানিত অতিথি হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। আগামী ১৭ ডিসেম্বর কীর্তিগড়ে বাৎসরিক পুনর্মিলন উৎসব শুরু হচ্ছে। সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠানে আপনি আমন্ত্রিত। আপনি এলে আমরা গভীর প্রীতি অনুভব করব। এই নতুন পরিবেশ, নতুন জায়গা আপনারও অপ্রীতিকর হবে না। স্টেশনে গাড়ি থাকবে। ইতি—

নিবেদক শ্রীরঞ্জুপ্রসাদ সিংহ'

শচী বলল, 'তুমি বলছ এই আসল রঞ্জুপ্রসাদ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

শচী দাঁত বের করে একটু হাসল, 'পাকা হাতের লেখা দেখেই এতটা নিশ্চিত হয়ে গেলে বুঝি?'

'তা কেন? আসল জায়গার উল্লেখ দেখছিস না? কীর্তিগড়।'

'সেটাই তো সমস্যা।'

'সমস্যা কেন? তোর তো কেবলই সমস্যা।'

'তোমার সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ হবার পর থেকেই আমার এই দশা হয়েছে। সবকিছুতেই কেমন রহস্যের গন্ধ পাই। তোমার ডুপ্লিকেট দেখার পর থেকেই মনের মধ্যে সন্দেহের শেকড় গজিয়ে গেছে।'

'ডুপ্লিকেট মানে?' অতনু চট করে ধরতে পারল না কথাটা।

'ওই যে গো তোমার ডিউপার্ট। সন্দীপ সর্বাধিকারী।'

'তাই বল্। আমি ভাবছিলাম কি না কি! কিন্তু কীর্তিগড়ের মধ্যে কোনও রহস্যের গন্ধ নেই। আই মীন, কোনও ডুপ্লিকেসি নেই অন্তত।'

'না থাকলেই ভাল। তবে আমার মনের মধ্যে একটা খটকা লেগেই থাকল।'

'কি খটকা সেটা আগে শুনি।'

শচী বলল, 'আচ্ছা এটা নিশ্চয় স্বীকার করো যে আমরা কখনও কীর্তিগড়ে যাইনি? কীর্তিগড় ঠিক কোথায় তাও জানি না এখনও পর্যন্ত!'

'বেশ, তাতে কি হল?'

'তাতে এই হল কীর্তিগড়ের লোকেরাও আমাদের দেখেনি।'

'স্বাভাবিক।'

'তাহলে তাদের পুনর্মিলন উৎসবে তোমার নেমন্তন্ন কেন?'

'ঘটনাচক্রে রঞ্জুপ্রসাদের কাছে হয়তো আমি অপরিচিত নই।'

'হয়তো তাই। এবং রঞ্জুপ্রসাদের নাম ভাঙিয়ে যারা চলছে তাদের কাছেও।

তারা হয়তো অনেক দূরের মানুষ কেউ না। এমন কি প্রাণগোবিন্দকেও কি জানি একজন রঞ্জুপ্রসাদ ভাবা যেত।'

'হয়তো এখনও যায়।' অতনু যোগ করল, 'ঈশ্বর-ইচ্ছায় সে যদি লোপাট হয়ে গিয়ে না থাকে।'

'ওই খটকাটাও তোমারই অবদান।'

'তোর আসল কথাটা কিন্তু চাপা পড়ে যাচ্ছে।'

'চাপা পড়তে দিচ্ছে কে? এই তো ব্রেক কষে বাঁচিয়ে দিচ্ছি। কীর্তিগড়ের মানুষজনের কাছে তুমি কে এমন হরিদাস পাল যে, না-দেখা বন্ধুবা সর্বসম্মতিক্রমে তোমাকে সম্মানিত অতিথি নির্বাচন করল?'

শচীর কথার যুক্তিটা অতনুকে ধাক্কা দিল। কিন্তু সেট' তলিয়ে ভাবার আগেই মুখে বলল, 'তুই একেবারে রোয়াকের ভাষায় কথা বলতে শুরু করেছিস।'

হিঃ হিঃ হেসে শচী বলল, 'ওটা রক-ফেলোদেব অবদান, ক্ষমা-ঘেন্না করে দিযো গুরু। আরও একটা ব্যাপার, পথের কোনও হদিস দেওয়া নেই কিন্তু। কোন স্টেশনে গাড়ি থাকবে, সে কথাটাও তো কোথাও দেখলাম না।'

একটু দম ধরে থেকে অতনু বলল, 'সেটা বোধহয় আমাদেরই খুঁজে নিতে হবে।'

শচী বলল, 'কিন্তু ভাই আমি কি করে যাব? আমি তো রবাহূতও নই। আর তুমি আমন্ত্রিত।'

অতনু কথাটায় আমল দিল না। বলল, 'দ্যাটস নট ইয়োর লুক আউট। আমি দেখব। মোট কথা তুই যাচ্ছিস। সতের তারিখের বেশি দেরি নেই কিন্তু।'

ফোনটা বেজে উঠল ঝনঝন করে।

শচী বলল, 'নাও দেখো। আবার কোনও রঞ্জুপ্রসাদ কিনা!'

অতনু একটু বিরক্তির মুখভঙ্গি করে ফোন ধরতে উঠে গেল। হ্যালো বলতেই ওপাশ থেকে একটা মার্জিত গলা শোনা গেল, 'সল্টলেক থেকে বলছি।'

'হ্যাঁ, বলুন।'

'আমি অতনু মজুমদারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আমিই অতনু। আপনার পরিচয়টা কিন্তু এখনও—'

'আমি সলিসিটার চ্যাটার্জি। মনে পড়ছে?'

অতনুর চোখের সামনে একটা টাইয়ের নট ভেসে উঠল।

'নমস্কার। খুব মনে পড়ছে।'

'কীর্তিগড় থেকে আপনি কি কোনও আমন্ত্রণ পেয়েছেন?'

অতনু অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এইমাত্র। কেন বলুন তো?'

ভদ্রলোক অমায়িক হাসলেন, 'আমার ওপরে একটা গুরুদায়িত্ব এসে পড়েছে মশাই।'

অতনু সংক্ষেপে বলল, 'বলুন।'

'বিশেষ অতিথিকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার ভার আমার ওপরে পড়েছে।'

'সে কি আমি?'

'আবার কে? আপনি ইচ্ছে করলে সস্ত্রীক যাবেন। কোনও অসুবিধে হবে না তাঁর।'

অতনু এবার হেসে ফেলল।

'হাসছেন মনে হচ্ছে!'

'হাসছি, কারণ একটু অসুবিধে আছে। আমি বিয়েই করিনি।'

এক মুহূর্ত থেমে থেকে ভদ্রলোক বললেন, 'স্যরি। তবে বন্ধুবান্ধবরা যদি যেতে চান, সঙ্গে আনবেন।'

'আমার এক বন্ধু যাবে হয়তো।'

'নো প্রবলেম। খুব খুশিই হব। তাহলে আপনি যাচ্ছেন। সিওর?'

'সিওর।'

'আমি তাহলে পনের তারিখে আবার রিং করব। এরকম সময়ে কি আপনি অ্যাভেলেবল হবেন?'

'থাকব।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। রাখছি।'

ভদ্রলোক টেলিফোন রেখে দিতেই শচী শুধোল, 'কে বটে?'

'সল্টলেক থেকে। সেই সলিসিটার চ্যাটার্জি।'

'এই ব্যাপারে? স্ত্রীর কথা কি বলছিল?'

'নিয়ে যেতে। কি বললাম শুনলিই তো। তোর ব্যবস্থা পাকা।'

'কিন্তু এ-ব্যাপারে ভদ্রলোকের কি ইন্টারেস্ট?'

'আমি ভেতরের ব্যাপার কিছুই জিজ্ঞেস করলাম না। কোনও কৌতূহল বোধহয় না দেখানোই ভাল। তবে আমাদের নিয়ে যাবার ভার যখন ওঁর ওপরে পড়েছে তখন মনে হয় উনি রঞ্জুপ্রসাদের বন্ধু কিংবা বিশেষ পরিচিত কেউ।'

শচী বলল, 'কিংবা রঞ্জুপ্রসাদরা ওঁর পুরনো মক্কেলও হতে পারেন। রাজামহারাজাদের ব্যাপার! ওরকম থাকে।'

'তুই রঞ্জুপ্রসাদকে বুঝি সেই রকমই ঠাউরেছিস?'

'অবশ্যই। ওরকম এলাহি কাণ্ড যখন।' শচী আবার দাঁত বের করে হাসল।

শচী দেখল অতনু তার দিকে কেমন অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে। অতনুর মাঝে মাঝে কি যে হয়!

'কেন, এলাহি কাণ্ড না? আমি কি খুব ভুল বলেছি গুরু?'

অতনু নাড়া খেয়ে গুছিয়ে বসল, 'কী বলছিস?'

'আর, কী বলছি!' শচী হেসে উঠল, 'তুমি তাহলে এতক্ষণ ইহলোকেই ছিলে না। অথচ আমার দিকে অ্যায়সা চোখে তাকিয়েছিলে যে, আমি ভাবলাম কি জানি!'

অতনু হেসে ফেলে বলল, 'ওটা চোখের ঠেকনো, জেগে ঘুমোনোর কায়দা দেখিসনি? আসলে তোর ওপর চোখ ঠেকিয়ে রেখে আমি উল্টোপাল্টা অনেক কথা ভেবে নিচ্ছিলাম। ইহলোকে, মানে এখানে ছিলাম না—ঠিকই বলেছিস।'

'হুঁ, তাহলে কোথায় ছিলে?'

অতনু হাসল, 'তোকে নিয়ে কীর্তিগড়ের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।'

'ও বাবা! কীর্তিগড় ছেড়ে আবার তার আশেপাশেও? তোমার দৌড় দেখছি খুব খাটো নয়!'

অতনু মাথা নেড়ে বলল, 'সবকিছুই ঠাট্টা ভাবিস না। হয়তো দেখা যাবে কীর্তিগড় উপলক্ষ, আমাদের আসল কাজ অপেক্ষা করে আছে ওর ধারে-কাছেই, অন্য কোথাও।'

শচী মাথা চুলকে বলল, 'তোমার আসল কাজ নকল কাজ আমার মাথায় ঢুকছে না তনু, হয়তো নয়, মনে হচ্ছে রঞ্জুপ্রসাদ সিংহ তোমার লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ্যমাত্র। তাহলে লক্ষ্যটা কি?'

অতনু বলল, 'বলব, সবই বলব। দাঁড়া তার আগে একটা টেলিফোন সেরে নিই। তোর সঙ্গে তারপর অনেক কথা আছে।'

অতনু উঠে গিয়ে ফোনের কাছে বসল। বার কয়েক ডায়াল করার পর বোধহয় কানেকশন পেয়ে গেল। রিসিভার কানে চেপে বসে আছে তো আছেই। প্রায় আধ মিনিট ওভাবে থাকার পর অবাক হয়ে বলল, 'স্ট্রেঞ্জ্! কেউ ধরছে না কেন?' আর কিছু সময় অপেক্ষা করে অতনু বিরক্তির সঙ্গে ফোন নামিয়ে রাখল।

শচী বলল, 'কাকে ফোন করছিলে?'

অতনু বলল, 'মাথায় একটা আইডিয়া এসেছিল, ভাবলাম আগে অবনী কর্মকারের সঙ্গে যোগাযোগ করি। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এতক্ষণ রিং হল, কেউ ধরল না। ফোনটা কিন্তু ওঁর নাগালের মধ্যেই থাকে।'

'এবার তুমি নিজেই বোঝো,' শচী বলল, 'আমি তোমাকে আগেই বলেছিলাম তনু, ওর কেসটা খুব গোলমেলে, তা তুমি আমাকে আমলই দিলে না।'

একটু চুপ করে থেকে অতনু বলল, 'বাদ দে। আমরা যাচ্ছি তাহলে?'

'কেন, আবার কি হল?'

'কিছু না। এনিহাউ আমরা যাচ্ছিই। কিন্তু কদিনের জন্যে যাচ্ছি?'

'বাঃ, আমি তার কি জানি?'

অতনু বলল, 'আমিও যে জানি তা নয়। তবে বেশ কিছুদিনের জন্যে মনে মনে তৈরি থাকিস, শচী। অনেক কাজ ওখানে, যথাসময়ে জানতে পারবি। কিন্তু তার আগে সেই টেলিফোনের মেয়েটা—'

শচী চমকে উঠে বলল, 'অ্যাঁ! কি করেছে সে? আবার জ্বালাচ্ছে বুঝি!'

অতনু শচীর কথায় কান না দিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'সেই টেলিফোনের মেয়েটা সম্পর্কে তোকে অনেক কথা বলার আছে। অনেক ঘটনা ঘটে গেছে ইতিমধ্যে, তুই জানিস না।'

'ঘটনা!' শচী যেন লাফিযে উঠল, 'কবে? কখন? কি ডেঞ্জারাস লোক তুমি মাইরি! এমন একটা জলজ্যান্ত ব্যাপার তুমি আমার কাছে চেপে গেছ, গুরু!'

'যবে যখনই হোক, বি সিরিযাস। একটাও প্রশ্ন না, মজা-তামাশা-মন্তব্য না, চুপচাপ শুনে যা। তবে একটা কথা জেনে রাখ, চেপে যাইনি, চাপতে চাইলে আর নিজে থেকে ওব কথা তুলতে যেতাম না। সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছিলাম মাত্র।'

শচী মনের ভেতরেব উত্তেজনা গোপন করে বলল, 'বলো।'

'মেয়েটির নাম রানু, ভাল নাম সুপর্ণা।'

শচী কোনও প্রশ্ন করল না, শুধু অবাক হযে তাকাল। অতনু বলল, 'এতে অবাক হবার কিছু নেই অবশ্য। আগে থেকেই চেনা ছিল। হঠাৎ একদিন বাড়িতে এসে হাজির। প্রথমে চিনতে পারিনি, সেটা মনে খুব লেগেছিল, লাগাটাই স্বাভাবিক। কারণ কোনও মতলব নিযে তো আর আসেনি, এসেছিল ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন করতে। বাড়িতে নেমন্তন্ন শুনেই আবার একটা ভুল করতে যাচ্ছি ভাবছিস তো? না, এ একেবারেই ইনোসেন্ট একটা মেযে, আমাদের ওই মূর্তিটুর্তি, রঞ্জুপ্রসাদ-টসাদ সার সতেরর সঙ্গে কোনও যোগ নেই।'

শচী আর থাকতে পারল না। বলল, 'আমার সঙ্গে টেলিফোনে কথার আগেই তাহলে—'

'নিশ্চয়।'

শচীর মুখে এসে গিয়েছিল, তোমার চোখে তো সবাই প্রথমে ধোয়া তুলসীপাতা, ইনোসেন্ট থাকে। কিন্তু কথাটা এক ঢোকে গিলে ফেলে শুধু 'হুঁ' বলে গম্ভীর হয়ে গেল।

অতনু মনে মনে হেসে বলল, 'কিরে, মেয়েটার নাম শুনেই সন্তুষ্ট হয়ে

গেলি, তার পরিচয় কিছু তো জিজ্ঞেস করলি না? কি করে, কোথায় থাকে, কি বৃত্তান্ত?'

'আমার কি দরকার?' শচীর গলায় অভিমান, 'তোমার ব্যাপার তুমি জানলেই যথেষ্ট।'

'না! দরকারটা তোরই। এবং তার সঙ্গত কারণও আছে। আমার জানা-না-জানায় কিছু এসে যাবে না।'

শচী ভেতরে একটা মোচড় খেয়ে সোজা হয়ে বসল। অতনু একটু বেশিই সময় নিল কথা বলতে।

'সুপর্ণা পেশায় ডাক্তার, নেশায় জ্যোতিষী। ওর হেল্প আমার দরকার হতে পারে।' বলে অতনু একটু থামল, 'বিশেষ কারণে ওর সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব তোকেই নিতে হবে। কীর্তিগড়ের কাজ চুকলে একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে। ঠিকানা রেখে গেছে, সাঁওতাল পরগনার দিকে কোথায় যেন থাকে।'

শচী বলল, 'ওরে বাবা, ওর কথার তোড়ে আমার মতো গাঁইয়া-গোবিন্দ কোথায় ভেসে যাবে তাহলে!'

'সামনে আর টেলিফোনে অনেক তফাত', অতনু আশ্বাস দিল, 'একেবারে অন্য মানুষ দেখতে পাবি।'

'বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছ ব্রাদার, দাও।'

'তোকে তাহলে পুরনো কথা স্মরণ করিয়ে দিই শচে। একবার এক প্রফেসারকে ঠেঙিয়ে খুব আতান্তরে পড়ে গিয়েছিলাম মনে আছে কি? হাসপাতাল খুঁজছে, পুলিশ খুঁজছে জেনেও তুই আমাকে সেদিন শেলটার দিয়েছিলি।'

'আর তার প্রতিদানে আমাকে কিস্যু না জানিয়ে দুম করে কেটে পড়েছিলে সে কথাও বিলক্ষণ মনে আছে।'—শচী বলে—'তা সে ছিল তোমার সত্যিকারের বিপদের দিন, কিন্তু এ তোমার কোন বিপদ শুনি?'

'তাহলে বলি, এই সুপর্ণাই সেই মেয়ে যাকে উপলক্ষ করে ওই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা ঘটেছিল।'

শচী একেবারে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বলো কী! একথা আমাকে আগে বলতে হয়।'

'সময় না হলে আমি কিছুই জানাই না, তুই তো জানিস।'

'তোমার সঙ্গে ডাক্তারি পড়ত এই মেয়ে, আমি ভাবতেই পারিনি।'

'আমাদের সঙ্গে নয়, সময়ে। জুনিয়ার ছিল। ফোনের কথাগুলো ভুলতে পারছিস না তো? বহুকাল পরে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসার আগের ভনিতা। অভিনয়ই বলতে পারিস। আমি সেই একই লোক কিনা আর কি

অবস্থা বোঝার চেষ্টা ছাড়া কিছু না। তারপরেই সটান বাড়িতে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেল।'

শচী একটু ফিচেলের মত হাসল, 'কৃতজ্ঞতাটা বড্ডই বাসি-বাসি ঠেকল না? অবিশ্যি যদি তার সঙ্গে এই ধরো গিয়ে, নিবেদন-টিবেদন—'অতনু তাকাতেই ও জিব কেটে থেমে গেল।

অতনু গম্ভীর মুখে বলল, 'তোর অবগতির জন্যে জানাই, সুপর্ণা বিবাহিতা, তার সংসার আছে।'

ট্যাক্সি ডেকে ওরা যখন স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হল, আকাশ মেঘে কালো হয়ে আছে। দুজনের সঙ্গে দুটো বড় আকারের সুটকেস ছাড়া মালপত্র ছিল না। আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল নিজের নিজের শীতবস্ত্র আর টুথব্রাশ ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে না।

নির্দিষ্ট ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেন্টের সামনে আগেভাগেই চ্যাটার্জি এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাজামা-পাঞ্জাবির ওপরে শাল জড়িয়ে মিঃ চ্যাটার্জিকে এতই অন্য রকম দেখাচ্ছিল যে অতনু প্রথম নজরে চিনতে পারেনি। ভদ্রলোক নিজেই ডাকলেন, 'আরে আসুন, আসুন।'

শচীদুলালের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল অতনু। নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'এই কম্পার্টমেন্টে আপাতত আমরাই তিনজন। আসলে এই লাইনে ফার্স্ট ক্লাসে আর কে যায়!'

অতনু হেসে বলল, 'আপনাকে বোধহয় প্রতিবছরই যেতে হয়?'

একটু চুপ করে থেকে ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'ইন ফ্যাক্ট আমিও অনেক বছর পরে যাচ্ছি। ব্যাপারটা আপনাদের তাহলে খুলেই বলি।'

অতনু ভেতরে ভেতরে উদ্গ্রীব হল। এটাই সে জানতে চাইছিল। সিগারেটের প্যাকেট বের করে অফার করতেই ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'আমি মশাই মোটা জিনিসের কারবারী, এই ডেলিকেসিতে আমার সুখ হয় না। আমার বস্তুটি আগে ধরিয়ে নিই।'

চ্যাটার্জি তাঁর পকেট থেকে চুরুটের খাপ বের করলেন। আসলে তাড়াহুড়োর কিছু ছিল না। এ-গাড়ির চেহারা দেখেই অতনু বুঝে নিয়েছিল, ধিকিয়ে ধিকিয়ে, থেমে দাঁড়িয়ে সারারাত ধরে চলবে।

বেশ তরিবত করে সিগার ধরিয়ে খানিকক্ষণ ধোঁয়া টানলেন চ্যাটার্জি। তারপর বললেন, 'অরিজিন্যালি এটা ছিল রাজসম্মেলন। সে অবশ্য সুদূর অতীতের কাহিনী। কীর্তিগড় রাজমহলের তখন খুব রবরবা, রাজবংশের দোর্দণ্ডপ্রতাপ।

বছরে একবার আশপাশের রাজরাজড়াদের আমন্ত্রণ করে আনা হত। নামে মিলনোৎসব হলেও আসলে ছিল নিজের ঐশ্বর্য প্রদর্শন। আমন্ত্রিতরাও সেকথা জানতেন। তাঁরাও তাই উপযুক্ত সাজসজ্জা করেই আসতেন। এভাবেই চলছিল। তারপর হঠাৎই রাজপরিবারের ওপর দুর্দৈব নেমে এল। রাজা গেল, রাজত্ব গেল। তখন ঘোর শনির দশা। রাজমহল তার শূন্য খাঁচা নিয়ে কোনও গতিকে টিকে রইল। ওই প্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই থেকে। ওই রাজসূয় যজ্ঞের কল্পনাও কারও মাথায় আসেনি। রঞ্জুপ্রসাদ সিংহমশাই লতায়-পাতায় ওই রাজবংশের উত্তরাধিকারী হলেও কখনও এ নিয়ে মাথা ঘামাননি। এতকাল পরে এ বছরই প্রথম তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে আবার সেই প্রথা চালু হল। কিন্তু রাজারাজড়ার আমল আর নেই, আমন্ত্রিত মানুষের চেহারাও বদলে গেছে একেবারে। অপেক্ষা করুন, নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন আপনারা। তবে ওঁর এই মর্জি বদলের ব্যাপারটা আমারও ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না, অতনুবাবু।'

অতনু কোনও কথা বলল না। সিগারেট টানতে টানতে সে জানলার বাইরে চলন্ত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল। শচী ওকে লক্ষ্য করছিল। বুঝল আবার এক নতুন ধন্ধে পড়ে গেছে অতনু।

সকালের হাইতোলা ভোরে ওরা যখন সেই অন্ত্যজ ইস্টিশানের মোরাম বিছনো প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়াল তখনও চারপাশ কুয়াশায় আবছা হয়ে আছে। বড় বড় গাছের মাথা কেউ যেন প্যাস্টেল ঘষে ঝাপসা করে ফেলেছে। গাড়ির এপাশ ওপাশ থেকে কিছু মানুষজন নামল, তাদের অস্পষ্ট মূর্তি ঠিক চেনা গেল না, ভঙ্গি দেখে মনে হল তারা সবাই সাঁওতাল আদিবাসী গোষ্ঠের লোক। এই হাড্ডি কাঁপানো ঠাণ্ডায় কাচ্চাবাচ্চা তামাম সংসার নিয়ে নেমেছে। মুখ-মাথা জড়ানো, চাটাই-চুবড়ি, তীরধনুক, লাঠির মাথায় পোঁটলা-পুঁটলি। কারও বগলে মোরগা, মেয়েদের কারও বুকে-পিঠে ক্যাঙারুর থলের মত দুগ্ধপোষ্য শিশুর ঝোলা। ধানকাটা সেরে বুঝি এবার ঘরে ফিরছে।

চ্যাটার্জি সামান্য অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে হাসলেন, 'কেউ আসেনি দেখছি।'

শচী বলল, 'এই এত ভোরে, কীর্তিগড় এখান থেকে নিশ্চয়ই অনেকটা দূরে?'

'অনেক দূরে তো বটেই। আগেকার রাজারাজড়রা তো আর রেলগাড়ির তোয়াক্কা করেনি, আর রেল কোথায় তখন। সেটা হাতিঘোড়া বজরা-পানসির যুগ। কিন্তু সেজন্যে না, আসলে এই গাড়িটা কোনওদিন ঠিক সময়ে আসে না। দু-তিন ঘন্টা লেট একেবারে বাঁধা বরাদ্দ। আমার ভেবে অবাক লাগত প্রায় বারো ঘন্টার মত সময় পেয়েও সামান্য সওয়াশো-দেড়শো মাইল পথ

পেরোতে একটা এ-যুগের ট্রেন কি করে লেট করে! এ সত্যিই এক আশ্চর্য ক্ষমতা।'

'তা হলে অঘটন আজও ঘটে।' অতনু হাসল।

পিলে চমকানো হুইসেল দিয়ে গাড়ি প্রায় শুঁয়োপোকার গতিতে স্টেশন ছেড়ে চলে যেতে খানিকটা সময় নিল। দুপাশেই এখন কুয়াশাকানা ধু-ধু ফাঁকা। শচীর মনে হল, এই প্রথম তার আউটডোর শুরু হল।

'এখানে কোনও কুলির আশা করবেন না।' চ্যাটার্জি নিজের ব্রিফকেসটা তুলে নিতে নিতে বললেন, 'এই জংলা স্টেশনে ফ্ল্যাগ-বাতি দেখানোর জন্যে যিনি আছেন, তকমা-আঁটা কোটের কল্যাণে তিনিই স্টেশনমাস্টার। কাউন্টারের ফোকর দিয়ে তিনিই আবার টিকিট বেচেন। চলুন, আমাদের ওপারে যেতে হবে। কোনও গাড়ির বন্দোবস্ত হয় কিনা দেখি। নইলে অপেক্ষা করতেই হবে। স্যরি। ভেরি স্যরি।'

অতনু বলল, 'কুলির কথা ভাবছি না। এই হালকা সুটকেস কোনও ব্যাপার না। কিন্তু রাস্তার ওপারের ওই বটতলায় ভ্যান-রিকশার বেশি কি আর কিছু জুটবে? এক্কাটেক্কা চাপার লোকও তো এখানে—'

চ্যাটার্জি বললেন, 'এ জায়গাটার সম্পর্কে অতটা আন্ডারএস্টিমেট করা এখনই ঠিক হবে না, অতনুবাবু। স্টেশনটা অবশ্য খেলনাই বটে।'

কয়েক পা এগোতেই পিছনে মোরামের ওপর দ্রুতপায়ের শব্দ শোনা গেল। মনে হল কেউ যেন ডাকল। অবাক হয়ে ওরা তিনজনই দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঘাড় ফেরাতেই অতনু দেখতে পেল স্টেশন-ঘরের দিক থেকে রঙিন পুলওভার আর মাফলার জড়ানো একটা মূর্তি তাদের দিকেই ছুটে আসছে।

'এই যে মজুমদারমশাই, আমি আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। ওঃ, এই তো চ্যাটার্জি সাহেব নিজেই সঙ্গে এসেছেন, ভালই হল। ওপারে যেতে হবে, গাড়ি রয়েছে ওখানে।'

চ্যাটার্জি হাসলেন,'আরে তাই বলুন, আপনি। এটা কি আপনার ছদ্মবেশ নাকি?'

বাঁদুরে টুপির মতো ভুরুর তলা থেকে কেবল চোখ, নাক আর মুখ বাঁচিয়ে আড়াই গজি মাফলারের ফেট্টি বাঁধা মানুষটি লজ্জিত গলায় উত্তর দিল,'তা যা বলেছেন! তবে ছদ্মবেশও এর থেকে খোলামেলা হয়, এত বাঁধাবাঁধি চপাচাপির দরকার করে না। আসলে স্যার, শেষ রাতের হাড়চিবোনো ঠাণ্ডায় গাড়ি নিয়ে বেরোতে হল তো, তাই—' বলেই নিজের মুখ-মাথার মোড়ক খুলতে তৎপর হল।

'আহা-হা, আবার খুলছেন কেন?' চ্যাটার্জি স্মিত মুখে বললেন,'বেশ ছদ্মবেশী দস্যুমোহন গোছের লাগছিল!'

হাসি চাপতে অতনু আর শচী দুজনেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছিল।

'আমার হট ফেভারিট, স্যার!' লোকটা উৎফুল্ল গলায় বলে উঠল, 'অবিশ্যি আমার ছেলেবেলার কথা বলছি, পাস্ট টেন্স! আপনাদের মত শিক্ষিত গুণী মানুষের মুখেও ও নাম শুনলে কাঁটা দেয়। ছেলেবয়সের শিহরন ফিরে আসে। দেখে বিশ্বাস হবে না, এই আমিই ওই বয়সে রহস্য রোমাঞ্চের পোকা ছিলাম। পড়ার বই চাপা দিয়ে কত ছাইভস্ম গোগ্রাসে গিলেছি। হাসবেন না কিন্তু স্যার!'

চ্যাটার্জি খুব সম্ভব আর হাসেননি। লোকটির যে রসকষ একটু কম, রঙ্গরসিকতা তলিয়ে বোঝার ক্ষমতা নেই, একেবারেই সোজা-সাপটা কাজের মানুষ, সেটা বুঝতে দেরি হয় না। অবগুণ্ঠন সরতেই চেহারা স্পষ্ট হল। ময়লা রং। বয়স বোধহয় পঞ্চাশ ছুঁয়েছে কি ছুঁতে যাচ্ছে। মাথায় খুলি-ছাঁটা বাবুই-ঠাস চুল, ঠোঁটের কার্নিস ঘেঁষে সরু গোঁফের কারুকার্য। এক ধরনের পেটাটে ছাঁদের মুখ আছে, জামা না খোলা ইস্তক যাদের দেহের কাঠামোটা আন্দাজ করা যায় না, বরং রুগ্‌ণই মনে হয়।

'না, হাসব কেন! ছেলেবেলায় সকলেরই ওরকম একটু-আধটু গোলমাল থাকে। কিন্তু আপনি দেখছি অতনুবাবুকে আগে থেকেই চেনেন!

লোকটা সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল না। বলল, 'না, ঠিক চিনি একথা বলব না। চিনে নিয়েছি, অনুমান করে নিয়েছি, বলতে পারেন। আসলে প্রভু নিজেই আসবেন ঠিক ছিল কিন্তু শরীরটা হঠাৎ একটু খারাপ হওযায় আমাকে পাঠালেন।'

চ্যাটার্জি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'রঞ্জুবাবু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? সে কি কথা! সিরিয়াস কিছু?'

'না-না। দুশ্চিন্তা করার মত কিছু না, কাল রাতেই সামলে নিয়েছেন। সামনে কদিনের চাপ-টেনশন আসছে ভেবে আমরাই আসতে দিইনি।'

'রাইট ডিসিসন।' চ্যাটার্জি ওকে সমর্থন জানিয়ে বললেন, 'অতনুবাবু, ইনি প্রভাকর হালদার, কীর্তিগড়ের প্রইভেট সেক্রেটারি। প্রাইভেট কেন বললাম পরে নিজেই বুঝতে পারবেন। হালদারদের সঙ্গে ও-বাড়ির প্রায় নাড়ির যোগ, কয়েক পুরুষের। রাজমহলের নায়েবি থেকে পরে এস্টেট ম্যানেজারি ইস্তক হালদাররাই হাল ধরে এসেছেন এযাবৎ। এরকম আপাদমস্তক বিশ্বাসী পরিবার আজকের দিনে ভাবা যায় না। প্রভাকর তো রঞ্জুবাবুর একরকম কম্বাইন্ড হ্যান্ডই বলতে পারেন। প্রয়োজনে ডান বাম দুই হস্তই।'

স্বস্তির বিষয়, এই প্রশস্তি শোনবার জন্যে প্রভাকর অপেক্ষা করেননি। তিনি আগেই হাত বাড়িয়ে অতনু আর শচীর সুটকেস দুটো নিয়ে নিয়েছিলেন, তারপর মাথা নুইয়ে হেসে এগিয়ে গিয়েছিলেন কয়েক কদম। সেইটুকু সময় দিয়ে বাকি কথাগুলো চ্যাটার্জি বলেছিলেন নিচু গলায়, কেবল অতনুকে শোনাতেই। শুনতে শুনতে অতনু কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। একটা আবছা অস্বস্তির মত

অনুভূতি তার মনটাকে কেন যেন থিতু হতে দিচ্ছিল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল কি একটা ব্যাপার তার বোধ থেকে ফসকে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা যে কি সেটাই তার ধারণায় আসছে না। এরকম অদ্ভুত পরিস্থিতিব মধ্যে এর আগেও সে এক-আধ বার যে পড়েনি তা নয়। পরে দেখা গেছে তার একটা কার্যকারণসূত্র ঠিকই ছিল। একেবার ভিত্তিহীন ব্যাপার না। কিন্তু আজ এখন এই সময়টুকুর মধ্যে কি এমন কারণ ঘটল যে...

একটা বিশাল অশ্বত্থ গাছের নিচে ধূসর রঙের অ্যামবাসাডারটা দাঁড়িয়ে ছিল। সুটকেস দুটো বুটে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রভাকর বললেন, 'আপনারা ভেতরে বসুন, আমি এখুনি আসছি।' লক খুলে দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হলেন।

চ্যাটার্জি ব্রিফকেস হাতছাড়া কবলেন না। বললেন, 'আপনারা দুজনে পেছনে বসুন, আমি সামনেই বসি বরং।'

ভেতরে বসে শচী হাতে হাত ঘষে শরীর গরম করছিল। ছেলেটা একটু শীতকাতুরে আছে। অতনু মুচকি হেসে ভেতরে ঢুকল, 'কেমন লাগছে?'

'আর খানিকক্ষণ বাইরে থাকলে জমে যেতাম।' শচী বলল, 'প্রভাকরবাবুকে হারিয়ে ফেললাম, কোনদিকে গেলেন? বোধহয় ড্রাইভারের খোঁজে?'

অতনু মাথা নাড়ল, 'মনে হয় না।'

খুব বেশিক্ষণ অবশ্য অপেক্ষা করতে হল না। একটু পরেই একটি অল্পবয়সী ছোকরা দৌড়ে এল সামনের গুমটি থেকে। বেতের টুকরিতে করে চা নিয়ে এসেছে। প্রায মগের মত সাইজের গেলাস ভর্তি ঘন দুধের মালাই চা, তখনও ধোঁয়া উঠছে। এই প্রত্যুষে এর চেয়ে ভাল পানীয় আর কি হতে পারত! বিষ্ণু চ্যাটার্জি হেসে ফেলে বললেন, 'নিন, প্রভাকরের ম্যাজিক শুরু হয়ে গেল।'

বলতে না বলতেই কুয়াশা ফুঁড়ে প্রভাকর হালদারের উদয় হল। চায়ের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে গদাইলস্করি চালে।

স্টেশনের খেলনা-ফেলনা চেহারা দেখে জায়গাটার চরিত্র সত্যিই বোঝা যায়নি। এই অঞ্চলের বাড়বাড়ন্ত যে কতখানি হয়েছে সেটা জানতে অবশ্য আরও কিছু সময় লেগেছিল তাদের। স্টিয়ারিংযে প্রভাকর বসেছিলেন একেবারে পাইলটের গাম্ভীর্য নিয়ে। গাড়ি ছুটে চলেছিল একেবারে ঝড়ের গতিতে। রোদ্দুর ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কুশায়ার পর্দা সরে গিয়ে ঝকঝকে সকাল বেরিয়ে পড়েছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মোরাম পেটানো রাস্তাটা যেন বার দরিয়ায় এসে পড়ল। সেখান থেকে মেটাল রোডের শুরু। পাশে তাকালে দিগন্তরেখার মত দূরের সদ্যব্যস্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে চোখে পড়ে। দিনরাতের জপমালার মত প্রহরে প্রহরে ট্রাকের কনভয় চলেছে হাতির পালের মত।

এই অঞ্চলের হালহদিস থেকে প্রাচীন কিংবদন্তী ইস্তক বিষ্ণু চ্যাটার্জির যেন

নখদর্পণে আঁকা। সৌম্যদর্শন গাইডের মত নিজে থেকেই বুঝিযে দিচ্ছিলেন যেন একের পর এক ছবি এঁকে। গোটা দেশের তাবড়ো তাবড়ো শহর ছুঁয়ে চলে গেছে এই জাতীয সড়কটি, মার্নচিত্রের অদৃশ্য শিরদাঁড়ার মত। জংশন স্টেশনের মত আরও দুটি সড়ক এসে কাটাকুটি খেযেছে কয়েক কিলোমিটাবের মধ্যে। ফলে এই অঞ্চলটার গুরুত্ব বেড়ে গেছে অনেকখানি। একটা বাইপাস মাঝারি আকারের এক মোচড় খেয়ে যে লুপ তৈরি করেছে সেটা মালার মত এই শহরের বাড়িযে দেওয়া গলায় এসে দুলছে। এ সবই অবশ্য হাল আমলের ব্যাপার, স্বাধীনতার অনেক পরের কাণ্ড। কিন্তু এই ইতিহাসের আগেরও এক ইতিহাস আছে।

কযেক শ বছরের পুরনো এই জঙ্গল মহাল জুড়ে এক বিস্তীর্ণ গঞ্জগ্রাম, ছড়ানো-ছিটোনো বর্ধিষ্ণু বসতি। চাষীবাসী, নৌজীবী আর শিল্পজীবী মানুষেব সঙ্গে জোতদার মহাজন বাস করছিল পুরুষানুক্রমে। তখনও পরিকল্পনা কমিশনেব চোখ পড়েনি এদিকে, মাইকা মাইনস আর তামার খনির খোঁজ মেলেনি। এই অঞ্চলের প্রায় কেন্দ্রস্থলের গুরুত্বপূর্ণ একটি জাযগা প্রকৃতির অকৃপণ হাতে তৈরি বিউটি স্পটের মত সকলের নজর এড়িয়েই পড়েছিল বহুকাল। তার একদিকে ছিল হিলবেঞ্চ আর আদিম অরণ্যের আউটলাইন, অন্যদিকে সমুদ্রেব প্রসারিত বাহু এসে ছুঁয়েছিল বিশাল খাঁড়ির চেহারা নিযে। অন্য পাশ থেকে একটা পাহাড়ি নদী নাচতে নাচতে এসে ভিড়ে গিযেছিল সেই সঙ্গে। এমনি করে নদী বন পাহাড় সমুদ্রের যোগসাজসে জন্ম নিয়েছিল রূপকথার চৌরঙ্গি। কিন্তু এর অন্যতর সম্ভাবনার দিকটি প্রথম যে জহুরির চোখে পড়েছিল তিনি ছিলেন এক বহিরাগত। ভারতবর্ষের অন্য প্রান্ত থেকে আসা এই ক্ষত্রিয় পুরুষটি তাঁদের পূর্ববসতি তুলে নিয়ে এখানে এলেন। কতটা সৌন্দর্যের টানে সেকথা বলা শক্ত। সম্ভবত এই জায়গাটির প্রাকৃতিক দুর্ভেদ্যতাই তাঁকে আকর্ষণ করে এনেছিল এখানে। নিকটদৃষ্টি দূরদৃষ্টি দুটোই যে তাঁর প্রখর ছিল, তাঁর উত্তর পুরুষরা সেকথা প্রমাণ করেছিলেন অনতি বিলম্বেই। যে দুর্ধর্ষ, সন্ত্রাসসঞ্চারী রাজশক্তির পত্তন হয়েছিল এখানে, জায়গাটি পরিণত হয়েছিল তারই দুর্গ-শহরে। পিতৃপুরুষ কীর্তিচাঁদ সিংহের নামাঙ্কিত হয়ে।

এখন অবশ্য আর দুর্গ মনে হয় না, বলতে কি শহরও না। কীর্তি ছেড়ে শহর চলে গেছে অন্যদিকে। রাজমহলটাই শুধু পড়ে রয়েছে এখানে বিস্ময়কর স্মৃতিচিহ্নের মত। ক-মহলা পাথুরে প্রমাণ। সমুদ্র সরে গেছে অনেক অনেক দূরে, খাঁড়ি শুকনো, বলিরেখার মত ধু-ধু বালিরেখা। নদীটাও খোলস ছেড়ে পাথরের চাঁই-চাঙড়ের ফাঁকে লুকিয়ে পড়েছে। কেবল বর্ষায় আর পাহাড়ি বৃষ্টির ঢল নামলে ফণা তুলে ফোঁপায়।

দাসখতমুক্ত প্রজাপুঞ্জও এখন চোখের আড়ালে। জমানা বদল হয়ে গেছে

কবে! দুর্ভাগ্যে আর দুর্ঘটনায় ফতুর আর কৌত হয়ে-যাওয়া রাজবংশ তার পতনের ইতিহাস ফেলে রেখে নিজেরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কবে!

চ্যাটার্জি হঠাৎ ব্রেক কষার ভঙ্গিতে বললেন, 'এই তো!'

যেন ইতিহাসের বিগত চ্যাপ্টারটা অকস্মাৎ একটা ঝাঁকানি দিয়ে চোখের সামনে স্তব্ধ হযে গেল। কিংবা আচমকাই এসে দাঁড়াল।

স্টিয়ারিং হুইলের সামনে ব্যাক-ভিউ আয়নার মধ্যে আধকপালে মূর্তিটা দুলে উঠে এই প্রথম চোখে চোখে কথা বলল, 'আমরা ঢুকছি।'

জনহীন দেউড়ির বিশাল ফটকের ভেতর দিয়ে যেন অভ্যাসের ঝোঁকেই গাড়িটা চাবুকেব মত আধচক্কর ঘুরে গাড়িবারান্দাব নিচে গিযে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে যূথবদ্ধ শাঁখেব আওযাজ শুনে কেমন হকচকিয়ে গিয়েছিল ওরা। ভেবেছিল গাড়ির ভেতব থেকেই, বোধহয রেডিও বা ওই জাতীয কিছু, ড্রাইভারদের মাথায় অনেক রকম শখ-আহ্লাদ থাকে।

প্রভাকর হেসে, বললেন, 'যা ভাবছেন তা নয়, অতিথি অভ্যর্থনার টেপ বাজানো হচ্ছে বাড়ির ভেতর থেকে। আপনারা এসে গেছেন জানতে পেরে গেছে।'

প্রভাকব ওদের নিয়ে ভেতরে ঢুকতেই শাঁখের আওযাজ থেমে গেল। প্যাসেজ দিয়ে ঢুকেই হলঘর। তার এ-কোণে ও-কোণে দাঁড়িযে নানা বয়সের কয়েকজন কি সব শলাপরামর্শে ব্যস্ত। সেই ব্যস্ততার মধ্যেও সবাই কৌতূহলী চোখ তুলে দেখল।

প্রভাকর বললেন আমাদের ওপরে যেতে হবে।

রঞ্জুপ্রসাদ একাই ছিলেন। একটা গদিমোড়া আর্মচেয়ারে বসে দরজার দিকে তাকিযে ছিলেন। ধবেধবে ফর্সা, হঠাৎ বিদেশি মনে হয়। সুদীর্ঘ ছিপছিপে সপ্রতিভ চেহারা। কুচকুচে কালো চুলের তলায় জুলপি দুটো সোনালিসাদা। উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন, বিষ্ণুবাবু বাধা দিলেন, 'না-না, আপনাকে উঠতে হবে না।'

রঞ্জুপ্রসাদ উঠতে গিয়েও উঠলেন না শেষ পর্যন্ত। ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসি, তাঁর সন্ধানী চোখ দুটো অতনুকে খুঁটিয়ে দেখছিল যেন। এই হাসিটাই পূর্ণচ্ছেদের মত লোকচক্ষুকে আড়াল করে রেখেছে। তিনি মনে মনে কতখানি উদ্‌গ্রীব, কি পরিমাণ আলোড়িত তার কিছুই অতনুদের চোখে ধরা পড়ল না।

অতনুই আগে নমস্কার করল, দেখাদেখি শচীদুলালও। রঞ্জুপ্রসাদ মাথা নুইয়ে নিষ্পলক থেমে থেকে বললেন, 'তাহলে শেষ পর্যন্ত দেখা হল আমাদের। খুশি হলাম।'

অতনু বুঝতে পারছিল ভদ্রলোক আপনি-তুমির ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন কৌশলে। স্বাভাবিক। তার বয়স যে এত অল্প হবে ভদ্রলোক সম্ভবত দেখার

আগে সেটা আন্দাজ করতে পারেননি। এখন সামনাসামনি বোধহয় মনস্থির করে উঠতে পারছেন না।

অতনু হাওয়া বদলাতে তাড়াতাড়ি বলল, 'আজ্ঞে কথা যখন দিয়েছি তখন তো আসবই কিন্তু তার বাইরেও একটা কারণ ছিল। আপনাকে নিজের চোখে দেখব, অনেক দিন থেকেই ইচ্ছেটা মনের মধ্যে ছিল।'

রঞ্জুপ্রসাদ সেই একই রকম স্মিতমুখে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আমারও।'

'শুধু একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে।'

ওঁর ভুরু জোড়া জিজ্ঞাসায় উঁচু হল। কিন্তু তাঁর চোখ যেন অতনুর ভেতর অন্য কিছু খুঁজছিল গভীর মনোযোগের সঙ্গে।

'আমাকে আপনি নাম ধরে ডাকবেন। তুমি বলবেন। আমি বলতে গেলে আপনার ছেলের মত।'

এই প্রথম রঞ্জুপ্রসাদ যেন চমকে উঠলেন কিন্তু সে চমক তাঁর মুখে নয়, চোখের তারায়। অতনুর কেমন খটকা লাগল।

রঞ্জুপ্রসাদ বললেন, 'তাহলে তোমরা দুজনে নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করোগে। পরে দেখা হবে। এখন আমি বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে একটু কথা বলব।'

প্রভাকর ওদের নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

তোয়ালে দিয়ে গা-মাথা মুছতে মুছতে অতনু প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। শাল জড়িয়ে আরাম করে বসে শচী সবে একটা সিগারেট ধরিয়েছিল। ওকে ওভাবে বেরিয়ে আসতে দেখে চমকাল। অবাক হয়ে তাকিয়ে শুধোল, 'কী হল?'

অতনু বলল, 'ইস! সারা রাস্তা এই ব্যাপারটাই আমাকে খোঁচাচ্ছিল। ঠিক ধরতে পারিনি।'

'খোঁচাচ্ছিল? কী ব্যাপার?'

'স্টেশনে প্রভাকর হালদার আমাকে কি ভাবে ডেকেছিলেন মনে আছে?' তাঁর সেই প্রথম কথাটা তোর কানে গিয়েছিল নিশ্চয়?'

শচী অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, শুনেছি তো! এই যে মজুমদারমশাই—তাই না?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

'তাতে গোলমালটা কোথায় আমি তো ঠিক—'

অতনু বলল, 'গোলমাল না। কোইন্সিডেন্স, একটা কাকতালীয় ব্যাপার। খটকাটা সেখানেই।'

শচী বলল, 'তোমার ধাঁধা আমার মাথায় ঢুকল না।'

অতনু বলল, 'খবরের কাগজের সঙ্গে সেই যে চিঠিটা এসেছিল মনে আছে?

তাতে সম্বোধনটা ঠিক এই রকমই ছিল না কি? এই যে মজুমদারমশাই—' বলে চিঠিটা শুরু হয়েছিল কিন্তু। প্রভাকরের ডাকটার সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিল। এর মানে কি? এটা কি শুধুই কাকতালীয, না অন্য কিছু?'

শচী স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকল। সত্যি ব্যাপারটা সে তলিয়ে দেখেনি, আশ্চর্য!

শচীদুলাল মিঠে পানের মোড়ক খুলে একটা পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলল। অতনু দুষ্টুমিভবা চোখে বুঝি আড়ে আড়ে ওকেই দেখছিল। এক খিলি পান ওব দিকে বাড়িযে ধবে শচী বলল, 'খাও। পানের রস তোমাব হজমির কাজ করবে। মধ্যাহ্নভোজনটা কেবল আর্লিই হযনি, বলতে নেই, হেভিই হয়ে গেছে। এখন একটা ঘন্টা আর আমি নড়ছি-চড়ছি না ভাই।'

অতনু পানের খিলি দেখতে দেখতে হাসল, 'বলতে নেই, জানতাম। ফাঁসির খাওযা কাকে বলে জানি না, তবে তোব খাওযা দেখলাম। একেবারে দেখার মতই। পাতে সুখাদ্য পড়লে আত্ম-পর হুঁশ থাকে না। অ্যাট এনি কস্ট—'

শচী দাঁত বের করল, 'অ্যাট এনি কষ্টও বলতে পাবো। সোযাদের রান্না ফেলতে কষ্ট হয়। উঁহু, খুলে দেখার কিছু নেই, নো জর্দা।' শচীর ইদানীং বেশ রসজ্ঞান হয়েছে, কথায় কথা কাটে।

অতনু কান খাড়া কবেই রেখেছিল। বলল, 'ঘন ঘন গাড়ির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। অতিথিরা আসতে শুরু করেছে মনে হয়।' পানের খিলি মুখে পুরে অতনু সিগারেটের প্যাকেট বের করল।

'ইয়েস।' পানেব রসে না নিদ্রারসে কে জানে, শচীর চোখে একটা ছলছলে ভাব দেখা দিয়েছিল এরই মধ্যেই, 'ম্যানেজমেন্টটা কাদেব হাতে আছে জানি না, পান থেকে চুন খসার জো নেই, সব দিকে খুব নজব আছে। রাজসিক ব্যাপার, এই না হলে রাজগৃহ!'

ডিভানের গদিতে কাত হবার তাল বুঝতে পেরেই অতনু বলল, 'নে, একটা ধরা, ঘুমফুম কেটে যাবে।'

শচী একটা হাই চেপে দু-আঙুলের ফাঁকে সিগারেট নিল অনিচ্ছা সত্ত্বেও। ফোমেব গদি তাকে ইতিমধ্যে টানছিল। অতনুর হাত থেকে আগুন নিতে নিতে বলল, 'ঘুমোচ্ছে কে! জাস্ট একটু গড়াগড়ি, বিশ্রাম।'

অতনু বলল, 'দ্যাখ্, ঝোঁকের মাথায় একটা মুখ্যুর মত কাজ করে ফেলেছি, তোকে বলা হয়নি। আসবার সময় সুপর্ণার ঠিকানা-লেখা কাগজটা খুঁজতে গিয়ে মনে পড়ল, ওটা রাখিনি। বাজে কাগজের ঝুড়িতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফেলে দিয়েছিলাম। কখনও যাব ভাবিনি তো! ঝাঁটপাট দিতে এসে সে সব সাফা করে দিয়েছে কাজের মেয়েটা।

'সাঁওতাল পরগনা না কোথায় যেন বলেছিলে আমাকে।'

'বলেছিলাম বুঝি? কিন্তু কি করে বললাম? কাগজটাতে তো একবার চোখ বুলিয়েও দেখিনি। কোথায় সাঁওতাল পরগনা আর কোথায় কীর্তিগড়! ওয়েস্ট বেঙ্গলের ঝুল-পকেট কেটে ওড়িশার কলজের ভেতর। অবিশ্যি তিন রাজ্যের ত্র্যহস্পর্শ ঘটিয়েছে রাজসড়ক। ময়ূরভঞ্জ ফরেস্টের—'

'আমার মনে হয়', শচী বলল, 'কাঁথি অঞ্চলের কাছাকাছি সিংবাবুমশাইদের পয়লা পত্তন হযেছিল। কীর্তিচাঁদ না কি নাম যেন, সেই আদিপুরুষ যিনি এই গড়ের প্রথম বাদ্যিকার।'

'এই রাজগিরেব?' অতনু ধোঁয়া ছাড়তে ছাডতে মজার গলায় বলে, 'তোর ভাষায় রাজগৃহ! খাসা বলেছিস। এই তিন মহলা অট্টালিকা ঘুরে দেখতে হবে একবার। খুব ইন্টারেস্টিং। ঝুলন্ত সেতুর মত দুটি ঝুলবারান্দা যেন দুই লম্বা হাত বের করে পরের মহলের কাঁধে রেখেছে।'

দুটো বেডরুম, ডাইনিং আর অ্যাটাচড বাথ নিযে অতনুদের ইউনিটটা। মেন বিল্ডিং-এর দোতলায় হলঘরের চারপাশ ঘিরে খুব সম্ভব এরকম এক একটা ফ্ল্যাট। এখনও কিছুই নিজের চোখে দেখা হয়নি। নিজেদের ঘরে বসে ওরা কথা বলছিল। শচী বলল, 'রাজা নেই, রাজত্ব নেই। জায়গির জমিদারি ভ্যানিশ। কিন্তু এই সিনহা ফ্যামিলির জ্ঞাতিগুষ্ঠি খুব ছোট না। তারা কিন্তু বেশ ফুলে-ফেঁপেই উঠেছে, বিজনেস না অন্য কিছু?'

অতনু ঠোঁট উল্টে বলল, 'ক্রমশ প্রকাশ্য। নতুন জায়গায় পা দিয়েই কি সব বোঝা যায়? লোকজনের সঙ্গে আলাপ-সালাপ হোক।'

'এদের গ্যারেজটা দেখেছ?'

'হুঁ। কেন?'

'মনে হল পাঁচ-সাতখানা গাড়ি থাকে। এ কি অমনি অমনি—'

অতনু ঠোঁটে আঙুল রেখে শচীকে চুপ করাল। স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে একটা মিনিয়েচার ছায়ামূর্তি হেঁটে আসছিল ঘরের উল্টো দিকের দেওয়ালে। আবছা, চোখে না পড়ার মতই, কিন্তু অতনুর নজর ভুল করেনি। একটু পরেই দরজায় ঠুকঠুক শব্দ হল। অতনু গলা চড়িয়ে বলল, 'কাম ইন, দরজা খোলাই আছে।'

যে মানুষটি ভেতরে ঢুকলেন তাঁর বয়স হয়েছে। ধবধবে সাদা চুল আর দাড়ি মিলিয়ে আচার্য-আচার্য চেহারা। মাথার মাঝখান দিয়ে সিঁথি। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো কুঁচকে ছোট করে তাকালেন। চশমা ছাড়া তাকালে যেমন হয়।

'আলাপ করতে এলাম। সত্যেন চাকী, এ বাড়ির লাইব্রেরিয়ান।'

গায়ের চামড়া ঢিলে, কিন্তু এখনও বেশ সপ্রতিভ, পায়ে স্বচ্ছন্দ গতি। অতনুর মনে পড়ল একতলার হলঘরের ভেতর থেকে চারটে সিঁড়ি উঠে এসেছে চারদিক

থেকে। তার দুটো সিঁড়ির মাঝ বরাবর পালিশ-করা কাঠের দু-প্রস্থ ব্যালকনি, চোখে পড়েছে প্রথম ভেতরে ঢুকেই। নিট সাজানো সারি সারি আলমারিতে ঝকঝকে বইয়ের সংগ্রহ দূর থেকে দেখেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল সে। এবার তার পিছনের মানুষটাকে দেখল। লাইব্রেরিটাকে যিনি ঢেলে সাজিয়েছেন।

অতনু বলতে যাচ্ছিল, 'আমার নাম—'

সত্যেনবাবু হাসলেন, 'জানি। আপনার সম্পর্কে অনেক কথাই আমার জানা। ইনি বুঝি আপনার বন্ধু? বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটালাম বোধহয়!'

অতনু বলল, 'একেবারেই না, আসুন, আসুন। আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমার বন্ধু। শচীদুলাল। শচীদুলাল গোস্বামী। ওর বাবা শঙ্কাহরণ গোস্বামী, একসময় যাত্রার জগতে বেশ নামডাক ছিল। তবে সে বছর পঁচিশ-তিরিশ আগেকার কথা।'

সত্যেনবাবু অবাক হয়ে শচীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। মনে হল স্মৃতি হাতড়ে কিছু ভাবছেন। অতনু বলল, 'নামটা বোধহয় শোনা-শোনা ঠেকছে?'

সত্যেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, 'না। কেমন দেখা-দেখা লাগছে। সম্ভবত আমাদের কালেকশনে ওঁর ডিটেল ইনফরমেশনের সঙ্গে কিছু ফটোগ্রাফও আছে।'

ব্যাপারটা অতনুর কেমন ধোঁয়াটে লাগায় সে অবাক হয়ে তাকাল। সত্যেনবাবু হেসে বললেন, 'অবাক লাগছে তো? একবার লাইব্রেরিতে এলে নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। আমরা অনেক আপ-টু-ডেট হয়ে আছি। অবিশ্যি আইডিয়াটা আমার নয়, এটা প্রথম মাথায় এসেছিল রঞ্জুবাবুর পিতৃদেবের। তিনি ছিলেন বিশাল পড়ুয়া। দেশবিদেশ ঘুরে-আসা মানুষ। তিনি চেয়েছিলেন এই একটেরে জায়গায় বসেও যেন দুনিয়ার খবর নখের ডগায় থাকে। বহু দুষ্প্রাপ্য আর বিচিত্র বিষয়ে নতুন নতুন বই কিনতে, পত্রপত্রিকার গ্রাহক হতে তিনি দুহাতে অর্থ ব্যয় করে গেছেন। এখনও এই খাতে বরাদ্দের টাকা বড় কম নয়। আমি চল্লিশ বছর ধরে এটাকে আধুনিক কায়দায় সাজিয়ে গুছিয়ে একটা পদ্ধতিতে বেঁধে ফেলেছি। কিন্তু এখন মনে হয় পণ্ডশ্রমই করে চলেছি। এসব এখন কে দেখে! কে পড়ে, লোক কই!' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার মত শব্দ হল।

সত্যেনবাবুকে অতনুর বেশ মনে ধরেছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে একপায়ে খাড়া। বলল, 'আপনার যদি আপত্তি না থাকে, আমার তো এখনই দেখতে ইচ্ছে করছে।' শচীদুলালের আলস্য ছুটে গিয়েছিল পলকে। অতনুর সঙ্গে সেও পা বাড়াল লাইব্রেরির দিকে।

সন্ধেয় এ-বাড়িতে বিরাট অনুষ্ঠান, চারপাশে তার হরেকরকম তোড়জোড় চলেছে কিন্তু লাইব্রেরির মধ্যে তার কোনও ঢেউ পৌঁছায়নি। ভেতরের একটা লম্বা টেবিলে গুটি তিনেক স্থানীয় ছেলে দৈনিক পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে বিভিন্ন টুকরো খবর কেটে ভাগে ভাগে সাজাচ্ছে। নিউজক্লিপিংস তৈরি হচ্ছে। সত্যেন

চাকী ওদের নিয়ে নিজের ছোট কামরাটিতে এসে ঢুকলেন। অবশ্য এখানে ঢোকার আগে তিনি ওদের নিয়ে এক চক্কর ঘুরে এসেছেন ভেতরের ঘরগুলোয়।

অতনু বলল, 'এ তো দেখছি বিশাল ব্যাপার! সব বইয়ের আলমারির ব্যাপার বুঝতে দু-তিন দিন সময় লেগে যাবে! এত বিষয়ের এত রকমের বই—' নিজের পড়াশোনার দীনতা সে টের পেয়ে গেছে এক রাউন্ড ঘুরেই।

সত্যেনবাবু হেসে বললেন, 'তার দরকার নেই। ওপর ওপর একটা তো ধারণা হল। এ ছাড়া এখানে অন্য একটা কাজও চালিয়ে যাচ্ছি। বলেছি আপনাকে। নিউজ ব্যাঙ্ক। তার একটা নমুনা, আপনাদের সুযোগ হলে দেখাব। নিউজ ব্যাঙ্কের একটা বিভাগ। নাম দেওয়া হয়েছে প্রোফাইল। এই রাজমহলের বিশেষ বিশেষ মানুষদের জীবনপঞ্জি, সেই সঙ্গে এ দেশের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নথিবদ্ধ করে রাখা আছে। আজ সকলেই আপনারা এখানে এসে পৌঁছেছেন। ধরেই নিচ্ছি প্রায় কারও সঙ্গেই আপনাদের মুখোমুখি আলাপ হয়নি।'

অতনু হেসে বলল, 'ঠিকই বলেছেন। মাত্রই তিন জনের সঙ্গে এ পর্যন্ত আলাপ হল। আপনি ছাড়া আর দুজন। গৃহকর্তা, যাঁর নিমন্ত্রণে এখানে আসা আর যিনি আমাদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এলেন। তবে তাকে চাক্ষুষ আলাপই বলব, পরিচয় না।'

'অ, বুঝেছি। আই ই এন টি। প্রভাকর হালদার।'

অতনু বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, 'উনি কি নাক-কান-গলার ডাক্তার নাকি? শুনেছিলাম প্রাইভেট সেক্রেটারি।'

সত্যেনবাবু ঠোঁটের কোণে হেসে বললেন, 'না না, এই আই ই এন টি অন্য ব্যাপার। দু মিনিট অপেক্ষা করুন, আসছি।'

দু-তিন মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরে এলেন সত্যেনবাবু। হাতে দুখানা ব্রাউন খাম। সে-দুটো সামনের টেবিলে নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি ছাড়া এই আপনারা বাকি দুজন মানুষ। পড়ে দেখুন, একনজরে আপনাদের জ্ঞাতব্য তথ্য পেয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে একটু কফি হলে আপত্তি নেই তো?' বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে কোথায় বেরিয়ে গেলেন।

আই ই এন টি-র ব্যাপারটাই আগে টানছিল। অতনু প্রভাকর হালদারের খামটি নিয়ে পড়ল। এই প্রভাকরের লাইফ-স্কেচটি সত্যিই চমকে দেবার মত। অল্পবয়সেই মিলিটারিতে নাম লেখান। পরে সেখান থেকে কলকাতার পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে, গোয়েন্দা বিভাগে। একটানা অনেক বছর কাজ করার পর চাকরিতে ইস্তফা। এক প্রবীণ এক্স-মিলিটারিম্যানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বাধীন জীবিকায় নামলেন। খোলা হল প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি। তিনটি ইংরেজি অ্যালফাবেটে সাংকেতিক নামঃ ই. এন. টি। প্রথম ই অক্ষরটি অবশ্য টু-ইন-ওয়ান। আই অ্যান্ড ইয়ার, চোখ এবং কান বোঝাতে। তার সঙ্গে নোজ এবং থ্রোট। তদন্তের

ধরনটা বোঝানো হয়েছে এর মধ্য দিয়েই। এ ধরনের প্রতিষ্ঠান কেবল অভিনব নয়, এ দেশে এই প্রথম। খুনজখমের বাইরে অন্য ধরনের ইনভেস্টিগেশন। কাগজ আর সিনেমা স্লাইডে বিজ্ঞাপন পড়তেই বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হল, কাজ আসতে লাগল চতুর্দিক থেকে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অফিস, ক্লাব আর বহু ধনী পরিবার গোপন খবর সংগ্রহের এই সুযোগ পেয়ে যেন বর্তে গেল। সন্দেহজনক গতিবিধির ওপরে নজর রাখা থেকে শুরু করে নানা তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে দেওয়া, ইত্যাকার অনেক কাজই করে দেওয়ার ফলে ই. এন. টি. অল্পকালের মধ্যেই ফুলে-ফেঁপে বিস্তৃত হল। প্রত্যক্ষে পরোক্ষে হয়ে উঠল বহু মানুষের অন্ন সংস্থানের উপায়। অবসরপ্রাপ্ত সেই প্রবীণ জঙ্গি ভদ্রলোক রয়ে গেলেন প্রতিষ্ঠানের ঝানু মাথা হয়ে। আর আটান্ন বছর বয়সী জুনিয়ার প্রভাকরের কাঁধে চাপল শহরতলি আর দূর মফস্বলের ভার। অবশ্য কলকাতার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেই। এক হিসেবে ভালই হল, এ-বাড়ির কর্তারা প্রভাকরকে ফিরিয়ে আনলেন নিজেদের মধ্যে। কীর্তিগড়ের নানান বৈষয়িক সমস্যার নিষ্পত্তির জন্যে বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হয়ে কলকাতার যথা জায়গায় তাকেই ছুটতে হয় মাঝে মধ্যে। বিষ্ণু চ্যাটার্জির সঙ্গে এই সূত্রেই যোগাযোগ।

এমন কমপ্যাক্ট থরো ইনফরমেশন পড়ে ফেলতে বোধহয় মিনিট খানেকের বেশি সময় লাগল না অতনুর। খামটা বন্ধ করতে করতে সে বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'যাহ্ বাবা, এই প্রভাকরই কি তাহলে—'

কথাটা পুরোপুরি শচীর কানে যায়নি, শেষ কথাটুকুর ভুল মানে করে মুখ তুলে তাকাল, 'না, আমার দেরি হবে, তুমি দ্যাখো। খুব ইন্টারেস্টিং। তোমার আর-পি খুব এলেমদার, জাস্ট ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকার লোক না।'

'আমার আর-পি, বেশ বলেছিস!' অতনু ওর হাত থেকে ফোটোকপি করা কাগজের গোছা নিতেই চোখে পড়ল জ. ১৯২২। ওপরে রঞ্জুপ্রসাদের বছর তিরিশ-পঁয়তিরিশের এক তরুণ মূর্তি। নিচের খবরটুকু সংক্ষেপে এই রকমের। তেলের খোঁজে জনৈক ভারতীয় বিশেষজ্ঞ পারস্য উপসাগরে। কলকাতায় সরকারি উদ্যোগে ভূগর্ভের জ্বালানি তেল বিষয়ে গবেষণারত রঞ্জুপ্রসাদ সিংহ দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে দেশ ছাড়লেন। যাত্রার প্রাক্কালে একটি মর্মান্তিক ঘটনার জন্য সমবেদনা জানানো হয়েছে। সন্তান হতে গিয়ে তাঁর স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। খবরের কাগজে সেই বিবরণও ছাপা হয়েছে। তারপরে এতকাল পরে তাঁর দেশে ফেরার খবর। এটা অবশ্য কাগজের নয়, নিজস্ব সংযোজন।

কফি এসে গেল। কফির পিছু পিছু সত্যেন চাকীমশাই স্মিত মুখে ঘরে ঢুকলেন। অতনু খাম দুটো সরিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'দেখলাম, ওয়ান্ডারফুল!'

মাথা নুইয়ে চাকী বললেন, 'হয়তো কোনও দিন ইতিহাসের কাজে লাগবে। হয়তো লাগবে না। সে যাই হোক, আমাদের কর্তব্য আমরা করে যাচ্ছি।'

এর পর কিছুটা সময় নিঃশব্দে কাটল। কফি খেতে খেতে অন্য একটা চিন্তা অতনুর মাথার মধ্যে কাজ করে যাচ্ছিল। সুযোগ বুঝে একসময় সে বলল, ‘আচ্ছা মিঃ চাকী, আপনি তো প্রায় চার দশক ধরে এখানেই রয়েছেন?’

‘হ্যাঁ, তা তো আছিই। ছেলেমেয়েরা সব বাইরে, আমাকে নিয়ে যেতেও চেয়েছে কিন্তু কি জানি কেন কোথাও যেতে মন সরেনি। একাই থেকে গেছি। যদি বলেন এ জায়গার মায়া, বোধহয় ঠিক তাও নয়। কাজের একটা মায়া আছে, দীর্ঘ অভ্যাসের একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনও বলতে পারেন।’

একটু চুপ করে থেকে অতনু বলল, ‘এক হিসেবে আপনি এখানকার সবচেয়ে পুরনো লোক। এ অঞ্চলেব অনেক খবরই আপনার জানার কথা। এ-বাড়ির ভেতরের বাইরের। আশপাশের অনেক ঘটনা।’

‘তা তো নিশ্চয়ই। চোখে দেখে আসছি, কানেও আসে। কিন্তু এ কথা কেন?’

ইতস্তত করে অতনু বলল, ‘আচ্ছা বহ্নি অগ্নিহোত্রী বলে কেউ কি এ অঞ্চলে কখনও ছিল?’

চমকে তাকালেন সত্যেন চাকী। কি দেখলেন অতনুর মুখের দিকে। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, ‘না। রেকর্ডে নেই।’

‘অ। আমি ভেবেছিলাম—’ বলে হতাশ অতনু চুপ করে গেল। একটা ক্ষীণ আশা এভাবে মিলিয়ে যাবে ভাবেনি।

‘কিন্তু কেন?’

‘এমনি। নামটা শোনা ছিল, তাই।’

একটু চুপ করে থেকে চাকী শুকনো গলায় বললেন, ‘একটা কথা বলছি, আপনার ভালব জন্যেই। এ-বাড়ির কারও কাছেই ওই নামটা আপনি দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করবেন না।’

অতনু চমকে সত্যেনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। এরকম একটা অস্বস্তিজনক অবস্থার জন্যে তৈবি ছিল না।

চাকীও চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থাকলেন একটুক্ষণ। পরে সামনে ঝুঁকে নিচু গলায় বললেন, ‘ভেরি স্যাড। অফ্ দি রেকর্ড বলছি, বহ্নির নাম এ-বাড়িব কেউ উচ্চারণ করে না। ওকে বোধহয় ভুলেই গেছে সবাই। এ-বাড়ির মেয়ে হয়ে ও এমন একটা কাজ করেছিল যার ফলে এই পরিবারের মান-মর্যাদা সংস্কার সব ধুলোয় লুটিয়ে গিয়েছিল একদিন। ওর বাবা সেই ধাক্কা সামলে উঠতে পারেননি। অল্পদিনের মধ্যেই মারা যান। এর থেকে বেশি আর কিছু বলতে পারব না।’

অতনু বলল, ‘আমি খুব দুঃখিত, মিঃ চাকী! আপনাকে এরকম অস্বস্তির মধ্যে ফেলব ভাবিনি।’

চাকী উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দরজায় কেউ নক করল! তারপরেই দরজা ঠেলে ভেতরে মুখ বাড়ালেন প্রভাকর। ক্ষিপ্র চোখে একবার পাশে সরিয়ে-রাখা খাম দুটোর দিকে তাকিয়ে নিয়ে চাকীর উদ্দেশে বললেন, 'অতনুবাবুর সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন।'

অতনু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমার সঙ্গে! এখানে!'

প্রভাকর বললেন, 'আপনার ঘরে তাঁকে বসিয়েছি।'

অতনু চাকীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমরা আসছি তাহলে?'

প্রভাকর অতনুদের ফ্ল্যাট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে চলে গেলেন, ভেতরে ঢুকলেন না। অতনু ভেতরে ঢুকে কেমন বিমূঢ় হয়ে গেল। সোফায় বসে বসে সুপর্ণা পা দোলাচ্ছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই যে, মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভূত দেখেছ!'

অতনু হোঁচট খেয়ে বলল, 'তু-মি, এখানে?'

সুপর্ণা ভুরু নাচিয়ে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। অগত্যা। তুমি তো আর গেলে না!'

শচী পিছন থেকে অতনুকে একটা অদৃশ্য খোঁচা দিল। অতনুর খেয়াল ফিরল। বলল, 'শচীদুলাল, এই সুপর্ণা। প্রথম দিন—'

সুপর্ণা বলল, 'তোমার ফ্রেন্ড, বুঝে নিয়েছি।'

এই রাজমহলের ওপাশে নদীর ওপর একটা কাঠের পুল ছিল বহুকালের পুরনো। সেই যখন নদী ছিল বারোমেসে ব্যাপার, বিরামহীন প্রবাহ, আর বর্ষায় কিংবা অকাল বর্ষণে ক্রুদ্ধ কূলভাসানি, ফণা আছড়ানো গোখরো, সেই আমলের। কিন্তু সেই পুল আর জোড়াতালি দিয়েও রাখা যাচ্ছিল না, ভারী চলাচল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। তাই সেটা ভেঙে হাল আমলে মরা নদীর সোঁতার ওপর কংক্রিটের কজওয়ে তৈরি হয়েছে। বছরে বড়জোর দু-চার দিন, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে ঘণ্টা কয়েকের জন্যে কজওয়ে জলের তলায় চলে যায়। কংক্রিট স্ল্যাবের ওপর দিয়ে ফুট-দু-ফুট উঁচু হয়ে স্রোত বইতে থাকে বেআন্দাজি বেগে। সেই সময়টুকু চলাচল বন্ধই থাকে। নিতান্ত ঠেকায় পড়লে দুপাশের শেকল ধরে মানুষ পিঁপড়ে পায়ে এগোয়। ক্বচিৎ কখনও এক-আধটা ট্রাক নিজের ওজন বুঝে শামুকের গতিতে ঢালু জায়গার স্রোতটুকু পেরিয়ে যায়।

দূরের হাইওয়ের কল্যাণে শহর ছড়াতে শুরু করেছিল ওপারে। ওপাশ থেকে মাইকা আর তামার খনির টান ধরেছিল হাইওয়ের পাঁজরে। নতুন টাউনশিপের গ্যারেজ আর মোটর পার্টসের দোকান, পেট্রোল পাম্প, বার-রেস্তোরাঁর পাশাপাশি

গোটা তিনেক হোটেল, ওয়াইন-শপ, ভিডিও হাউস গজিয়ে উঠতে দেরি হয়নি। থানা, পোস্টাপিস, ব্যাঙ্ক ছিল না, হয়েছে। একটা নার্সিংহোম ইস্তক।

শহরটা বিজনেস-কাম-টুরিস্ট সেন্টারের রূপ নিতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। সুধাকান্ত দেবচৌধুরীর অবদান আছে এর পেছনে। এই জায়গাটার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা তাঁর মাথাতেই এসেছিল প্রথমে। এ পথ দিয়ে যেতে যেতে নতুন শহরপত্তনের আইডিয়াটা যেন প্রায় কুড়িয়েই পেয়েছিলেন তিনি। এই বিপুল ধনী মানুষটি তাঁর দুই ব্যবসায়ী বন্ধুকে সঙ্গী করে কাজে নেমে পড়তে বিলম্ব করেননি। পুরনো রেকর্ডে গোটা অঞ্চলটাই ছিল সিংহবাবুদের দখলে। সে সবই একদিন চলে গেল সরকারি তালুকের গর্ভে। সিংহবাবুদের দৃষ্টিতে এও এক ধরনের জবরদখল ছাড়া কি! জাতীয় সড়ক তৈরি হবার পর এপাশের ছুটকো অঞ্চলটা পড়েই ছিল একরকম। গভর্নমেন্ট এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি আর। সেই সুযোগটাই কাজে লাগালেন দেবচৌধুরী। জলের দরে নিরানব্বই বছরের লিজ নিয়ে ফেললেন ঝোঁকের মাথায়। পুরনো দোকানপাট দু-চারটে যা ছিল থেকে গেল নতুন চুক্তিতে। প্ল্যানমাফিক জায়গা করে দিলেন উৎসাহী ব্যবসায়ীদের জন্যে। এই একটুকরো শহরকে স্বয়ম্ভর করতে দোকান বাজার বসল। এমনকি সিংহবাড়ি থেকে সরিয়ে আনা দাতব্য ডাক্তারখানার সমস্ত দায়দায়িত্ব সুধাকান্তই নিয়ে নিলেন ওঁদের অনুরোধে। ভেঙেচুরে নতুন করে তৈরি হল চাঁদ মেমোরিয়াল চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারির নতুন বিল্ডিং। ট্রাস্টি দেবচৌধুরী-সেনরায় প্রাইভেট লিমিটেড। সেও আজ বছর পনের-কুড়ি আগেকার কথা।

অফ্ সিজিনে ব্যবসাপত্তরে মন্দা চললেও বছরে ছ-সাত মাস বেশ রমরমিয়ে চলে। তখন টুরিস্টের ঝাঁক আর নিয়মিত হাওয়া বদলের লোকজন সদলবলে এসে পড়ে। লেখক শিল্পী অ্যামেচার ফটোগ্রাফারের আনাগোনাও শুরু হয়েছে গত কয়েক বছর যাবৎ। শুটিং করতে চলে আসে টিভি ইউনিট, ফিল্মের সাঁজোয়া পার্টি, নতুন আউটডোরের সন্ধানে। মরা নদীর ধারে তাদের ছাউনি পড়ে কখনও-কখনও। বর্ষার জল জমা নিচু জায়গাটায় লেক কাটিয়ে দিয়েছেন সুধাকান্ত। সেখানে রোয়িং ক্লাব দিব্যি জমে উঠেছে। টুরিস্টদের কেউ কেউ কজওয়ে পেরিয়ে সিংহবাড়ি ভিজিট করতে যায়। লাইব্রেরি, মিউজিয়াম, রাজ-আমলের পোশাক-টোশাক, ব্যবহারের জিনিস, অস্ত্রশস্ত্র সাজানো রয়েছে। একবার কি একটা ছবির শুটিংও হয়ে গেছে এই রাজমহলে। সে ছবি এখনও বোধহয় রিলিজ করেনি, আটকে আছে কোনও কারণে, হয়তো অর্থাভাবেই।

চাঁদ চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারির ডাক্তার হয়ে সুপর্ণা খুব বেশিদিন আসেনি। বছর দুই হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এরই মধ্যে যথেষ্ট সুনাম হয়েছে। হবেই, কারণ এ অঞ্চলে লেডি ডাক্তার এই প্রথম, বলতে গেলে ভাবাই যায় না।

এত দূরে এই বেটপকা জায়গায় মহিলা দূরে থাক, কোনও ডাক্তারই আসতে চায় না। এক বৃদ্ধ এল এম এফ, স্থানীয় ডাক্তার, কাজ চালিযে যাচ্ছিলেন এতদিন একাই। সপ্তাহে ছ'দিন দাতব্য ডাক্তারখানা খোলা থাকে। সকালের দিকে, আটটা থেকে একটা, এই পাঁচ ঘণ্টার কাজ। তারপর ছুটি। সুপর্ণা মিত্রকে পেয়ে কর্তৃপক্ষ বর্তে গেছেন। বেশিদিন টিকে থাকবে কিনা এটাই তাঁদের একমাত্র ভাবনা। তাই সুপর্ণার সুবিধে-অসুবিধের দিকে তাঁদের সজাগ নজর আছে। মাইনেপত্র ভালই দিচ্ছেন, সেই সঙ্গে ফ্রি কোয়ার্টার এবং একজন কাজের লোক। ছুটির পর নিজস্ব প্র্যাকটিসের স্বাধীনতা। চেম্বার খোলার জন্যে শহরের মধ্যেই একটা ঘর খুঁজছিল সুপর্ণা। জানতে পেরে সেটাও যোগাড করে দিয়েছেন তাঁরা। সুপর্ণা ভাববার আগেই একখানা নতুন সাইকেল রাতারাতি এসে গেছে তার জন্যে। গিফট হিসেবে। কলে বেরোলে পাযে হেঁটে যাবার দরকার নেই। সুপর্ণা ভালই আছে। কলকাতাব সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, তা হোক। এত সুযোগ-সুবিধে আর কোথায পেত এই প্রতিযোগিতার বাজারে! হেলথ সেন্টারগুলোব যা দশা, কাগজে দেখে মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে। ওষুধপত্র নেই, স্বাধীনতা নেই, উল্টে শাসানি। ঘেরাও, মারধর। রাজনীতির প্যাঁচপয়জার।

আজ সকাল থেকেই সুপর্ণা মনস্থির করতে পারছিল না। তীব্র অভিমান নাকি উপেক্ষার অপমান, আলাদা করে বুঝতে না পারলেও ভেতরে এক অদ্ভুত জ্বালা তাকে অস্থির করে তুলেছিল। আজ সন্ধ্যার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েও প্রথমে ভেবেছিল সে আসবে না। প্রায দুবছর সে এ অঞ্চলে এসেছে কিন্তু এত কাছে থেকেও এই সিংহবাড়িতে, এই রাজমহলে তার যেমন কখনও আসার ফুরসত হয়নি তেমনি আজও হবে না। আর অত মানুষের জম্পেশ ভিড় আর ডামাডোলের মধ্যে তার উপস্থিতিই কেউ খেয়াল করবে না, অনুপস্থিতি তো নয়ই। ল্যাঠা চুকে যাবে! কিন্তু চুকে গেল না। সেই অদ্ভুত যন্ত্রণাটাই তাকে যেন এখানে তাড়িয়ে নিয়ে এল। আর তাও এই দুপুরে, প্রায় অসময়ে। অতনুর সঙ্গে আলাদা, একলা, মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই বুঝতে পেরেই তাকে ছুটে আসতে হল।

আসলে বেশ কয়েকদিন আগেই, অতনু এখানে এসেছে জানার পর থেকেই তার কেমন নিশ্চিত বিশ্বাস হয়েছিল তার রেখে-আসা নিমন্ত্রণ অতনু এবার রাখবেই। ঠিকানা তো দেওয়াই ছিল, ঠিক এসে হাজির হয়ে যাবে তার ডেরায়। বলবে, কি রকম নাটকীয় যোগাযোগ ঘটে গেল দেখলে তো? ঠিক এসে গেলাম! এটাকে কি কাকতালীয় বলবে? না, সুপর্ণা তা বলবে না। দৈবের লিখন বললে খুব সস্তা নাটক-নাটক শোনাবে তাই কিছুই বলবে না। শুধু

হাসবে। অর্থাৎ জানতাম। কিন্তু অপেক্ষাই সার হল। একটি একটি করে দিন চলে গেল অতনু এল না।

চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অতনু বলল, 'তুমি এসে গেলে, ভালই হল।'

সুপর্ণা বাঁকা গলায় বলল, 'তা আর বলতে!'

'না, সত্যি।'

'মিথ্যে কি বলেছি? দেখামাত্র আমার কথা মনে পড়ে গেল, ভালই হল।'

'তা কেন! মনে ঠিকই ছিল।'

'ছিল বুঝি? বাঃ, এ তো আনন্দের কথা!'

'না, রাগেব কথা।' অতনু বলল, 'এটা তোমার রাগের কথা।'

'রাগ করব আমি? কোন দুঃখে?'

'বিশ্বাস করো আমি যেতাম। যাবও।'

'তার আর দরকার হবে না।'

'কেন?'

'আমি এসে গেলাম, তাই।'

অতনু একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এই শচীদুলাল জানে, উপায় ছিল না।'

'কিসের উপায়?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাবার।'

'কেন?'

'এই তো মাত্রই ঘণ্টা কয়েক আগে আমরা এসে পৌঁছেছি।'

সুপর্ণা একটু অপ্রস্তুত হল। সে জানত না অতনু আজই এসে পৌঁছেছে। এই খবরটা তার কানে পৌঁছয়নি। অতনু এবার হালকা গলায় বলল, 'বুঝতেই পারছ, বিশেষ অতিথির বিশেষ হাত ছিল না এ ব্যাপারে। আমাকে যেমন এনেছে তেমন এসেছি।'

ভেতরের জ্বালাটা কখন জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে সুপর্ণার এতক্ষণে খেয়াল হল। সে তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়ল। বলল, 'ভাল কথা, বলতে একদম ভুলে গেছি, তোমার একটা চিঠি আছে।'

'চিঠি! কে লিখেছে? কই দেখি?'

'কে তা তো জানি না। তোমার ঘরে ঢুকে জাস্ট বসেছি, মানে মিঃ হালদার আমাকে বসিয়ে রেখে যাবার পরেই কে একজন দরজার ফাঁক দিয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, শুনছেন, এটা ওঁকে দেবেন। আমি চমকে গিয়েছিলাম। বাড়ানো হাত থেকে চিঠিটা নেবার জন্যে উঠে দাঁড়াবার আগেই লোকটি মেঝের ওপর

খামটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম নামটা জানতে চাইব, ওঁকে মানে কাকে? তার আগেই দরজা টেনে বন্ধ করে দিতে দিতে লোকটা বলল, অতনু। অতনু মজুমদারকে।' সুপর্ণা আঙুল দিয়ে নিচু টেবিলের ওপরে পড়ে-থাকা খামটা দেখাল।

অতনুব তর সইছিল না। ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল খামটা। সাদা খাম। মুখ আঁটা কিন্তু ওপরে নামটাম কিছু নেই, একটা কালির আঁচড় পর্যন্ত না। সন্দিগ্ধ গলায়, খামটা ছেঁড়াব আগে অতনু জানতে চাইল, 'সিওর তো? চিঠিটা আমারই?'

'ভুল হবে কেন? আমারও খটকা লেগেছিল তো!'

দ্রুত হাতে খামটা ছিঁডে ফেলতেই একটা চার ভাঁজ কবা কাগজ বেবিযে এল। ভাঁজ খুলতেই অতনুর কপালেও ভাঁজ পড়ল। শচী মুখটা বাড়িযে শুধোল, 'কে লিখেছে? কী ব্যাপার!'

অতনু কাগজখানা উল্টেপাল্টে দেখে বলে উঠল, 'স্ট্রেঞ্জ! এ আবার কি রকম. রসিকতা রে শচে? ব্ল্যাঙ্ক পেপার, কোনও বিন্দু বা বিসর্গ না! যেন কোনও বাচ্চা ছেলে এপ্রিল ফুল কবেছে।'

সুপর্ণা চমকে উঠে বলল, 'সেকী! একদম ফাঁকা? না-না, বাচ্চা ছেলে হবে কেন! লোকটা রীতিমত—'

'কি রকম দেখতে?' কাগজখানা ভাঁজ কবে খামসুদ্ধু পকেটে রাখল অতনু।

সুপর্ণা মাথা নাড়ল, 'শুধু একটা রোমশ হাত আর গলা শুনেছি।'

'মিঃ হালদার নিশ্চযই নন?'

'ধ্যাত্! ওঁকে আমি ভাল করেই চিনি। আলাপ হয়েছে। সুধাকান্তবাবুদের কাছে তো প্রাযই—'

'কে সুধাকান্ত?'

'তুমি চিনবে না। পরে বলব।'

একটু গুম হয়ে থেকে অতনু বলল, 'শচী, ব্রাদার, বি কেয়ারফুল। পুরনো বন্ধুরা এখানেও এসে গেছে। আমি এতটা ভাবিনি। কিন্তু কখন এল, কি করে এল?'

'মূর্তি গিলেও পেট ভরেনি বলছ?' শচী বিড়বিড় করে যেন নিজের মনেই বলে, 'আরও কি চায়?'

অতনু পলকে সজাগ হয়ে গিয়ে মনে মনে বলল, 'নক্শা!'

সুপর্ণা একটুক্ষণ এ-মুখ ও-মুখ চেয়ে বলল, 'তোমরা দু বন্ধুতে এমন করছ, মনে হচ্ছে একটা মিস্ট্রির গন্ধ পাচ্ছি।'

অতনু চট করে একবার বাইরেটা উঁকি দিয়ে এল। আসার সময় দরজায়

ছিটকিনি তুলে দিয়ে এল। ইশারায় শচীকে বসতে বলে নিজেও বসল। তারপর বলল, 'একরকম তাই। সন্ধের অনুষ্ঠানে থাকছ?'

'থাকব বলেই তো এসেছি।'

'তাহলে তাড়া নেই?'

'নেই। তুমি ভেঙে বলো সব শুনি। ব্যাপারটা কি?'

'বলব, সব বলব।' অতনু হাতঘড়ির দিকে তাকাল, 'এখন না।'

'কখন?'

'কাল। তোমার ওখানে আমরা যাচ্ছি। কিন্তু—'

'এসো। আবাব কিন্তু কি? কাল বলে আবাব পরশু-তবশু কোরো না।'

'না, কিন্তু, ওখানে কি তোমাকে একলা পাওযা যাবে? আসলে ব্যাপারটা—'

সুপর্ণা মনে মনে হাসল। তারপর গম্ভীর মুখে বলল, 'এখন একাই আছি। যার কথা ভাবছ সে নেই।'

এমন অপ্রীতিকর ব্যাপার উঠে পড়বে অতনু ভাবতে পারেনি। সুপর্ণাব গম্ভীর থমথমে গলা শুনে ব্যাপারটা আঁচ করে নিতে দেঁরি হয না। আজকাল কি যে হযেছে, কিছুই টেকে না। এই তো কদিন আগেই সুপর্ণা বড় গলা করে, প্রায় চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে তাকে গেরস্থালি দেখতে ডেকেছিল। অতনু অপ্রস্তুত মুখে চুপ কবে থাকল।

'কিছু বলবে?'

'তুমি এখনও জ্যোতিষচর্চা করো?'

সুপর্ণা বুঝল অতনু কথা ঘোরাতে চাইছে। একটা কপট দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, 'না। ছেড়ে দিয়েছি।'

'আমি তোমার কাছে একটা হেল্প চাইতাম।'

'আমি তোমাকে হেল্প করব?' সুপর্ণা হেসে উঠল, 'বলো কি?'

দরজায় কেউ নক করল। খুলতেই প্রভাকর বললেন, 'একটা কথা বলতে এলাম। সবাই এসে গেছেন। আর আধঘণ্টার মধ্যেই আপনারা নিচে চলে আসুন।'

ঘড়ি ধরে আধঘণ্টার মধ্যেই ওরা ফ্ল্যাট থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। দোতলার হলে পা দিয়েই বেজায় চমকে গেল তিনজনেই। দোতলার হলঘরটি এখন দিন বরাবর। দুটি প্রকাণ্ড বৃত্তাকার ঝাড়বাতির গুচ্ছ সিলিং থেকে ঝুলছে। সুদৃশ্য বাতিদানগুলোর মধ্যে এখন মোমবাতির বদলে বিজলি আলোর সরু সরু ক্যান্ডেল টিউব, দেওয়ালের কোণে কোণে তার গেরুয়া পাথরের সুঠাম থামগুলোয় দেওয়ালগিরির কায়দায় শৌখিন কাচের শেডে আলোর রোশনাই। ঝাড় থেকে নোলক ঝোলার মত ত্রিশিরা কাচের ঝুনঝুনি, হাওয়া লাগলে বাজতে থাকে

আর আলো ঠিকরে দেয়। সিঁড়িগুলোয় রঙিন বাল্‌বের শিকলি আলোর কারসাজি দেখাচ্ছে। নিচে কেউ আমুদে গলায় মাইক টেস্টিংয়ের ধারাপাত আওড়াচ্ছে। হালকা চেয়ার-টেবিল ফুলদানিসহ দ্বীপপুঞ্জের মত সাজানো। মনে হচ্ছে আজ আনন্দের মহোৎসব। মনে হচ্ছে সাতটা বেজে গেলেও এখানে আজ বিকেলের পর থেকে সন্ধে হয়নি।

বহু মানুষের মৌচাক থেকে যেন গুঞ্জন উঠে আসছে। ওরা হালকা পায়ে নিচে নেমে আসছিল, দেখতে পেল ভেলভেটের গালচে-মোড়া প্ল্যাটফর্মের ওপর অর্ধচন্দ্রাকারে চেয়ার পাতা রয়েছে খান কয়েক। স্পেশাল ব্যাপার বোঝাই যায়। সেখানে বঙ্কুপ্রসাদ, চাকীমশাই ছাড়াও কয়েকজন প্রবীণ মানুষ, ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছেন কিছু অতিথি। অচেনা মুখের মেয়ে-পুরুষ। অন্য পাশে দূরে লম্বা টেবিলে নৈশভোজের আয়োজন দেখে মনে হল বুফে ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকরা এসেছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে। ফটোগ্রাফারদের ক্যামেরা থেকে বিদ্যুতের ঝিলিক দিচ্ছিল থেকে থেকে। গোটা দুই ভিডিও ক্যামেরাও চোখে পড়ল। রেডিও আর টেলিভিশন থেকেও নাকি প্রতিনিধিরা এসেছেন। প্রভাকর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে রীতিমত ব্যস্ত, তাঁকেই সব দিক সামলাতে হচ্ছিল। ভিড়ের মধ্যে বিষ্ণু চ্যাটার্জি কোথায় ছিলেন, এগিয়ে এলেন, 'আসুন মিঃ মজুমদার, এদিকে আসুন।'

সিঁড়ির মুখেই কিছু ছুটকো সাংবাদিক আর ফটোগ্রাফারের একটা জটলা ঘিরে ধরল। ক্যামেরাম্যানদের বিচিত্র ভঙ্গির সুইপিং ড্যান্স সুপর্ণা আর শচীদুলালের কাছ থেকে অতনুকে আলাদা করে দিল। অতনু একটু অপ্রস্তুত, দিশেহারা, একঝাঁক হাততালি বিশাল হলঘরের মধ্যে গমগমিয়ে উঠল। কেন আর কার উদ্দেশে অতনু ধরতে পারল না। সব যেন মহলা দেওয়া নাটকের মত তৈরি হয়েই ছিল, অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেল।

মাইকে ঘোষণা শোনা গেল, হঠাৎই নিস্তব্ধ হয়ে-যাওয়া জনসমাবেশকে উদ্দেশ করে। সম্বিত ফিরে পেয়ে অতনু দেখল তাকে কারা ডায়াসের ওপরে বঙ্কুপ্রসাদের পাশের চেয়ারে বসিয়ে দিয়েছে। মাইকে তখন বঙ্কুপ্রসাদ, প্রথমে ইংরেজিতে লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যানদের লক্ষ্য করে এই অনুষ্ঠানের কার্যকারণ এবং কর্মসূচি। তারপর বাংলায়। এই প্রথম অতনু খেয়াল করল ভদ্রলোক অনর্গল বলতে পারেন দুটো ভাষাতেই কিন্তু কথার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন উত্তুরে টান আছে। অবাঙালি ছাপটা পুরোপুরি গোপন থাকে না। উদ্দীপ্ত বঙ্কুপ্রসাদকে তবু কেমন ক্লান্ত আর অসুস্থ দেখাচ্ছিল। অবশ্য সেটা তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনছিলেন না। এবং তাঁর বয়সটাকেও। যেন বহু বহু বছর পরে ঠিক এরকম একটা দিনের

জন্যেই তিনি অপেক্ষা করে ছিলেন। এই সুযোগটাকে তিনি পুরোমাত্রায় উপভোগ করতে চান। বক্তৃতার পালা শেষ করে অতনুকে নিয়ে তিনি ডায়াস থেকে নেমে এলেন অতিথিদের মধ্যে। অধিকাংশই তাঁর নিকট কিংবা দূর কালের পরিচিত বা প্রিয়জন। ঘুরে ঘুরে সকলের সঙ্গেই অতনুকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন আর তার ফাঁকে ফাঁকে সাংবাদিকদের উল্টোপাল্টা নানা প্রশ্নের সপ্রতিভ সংক্ষিপ্ততম উত্তর। যাকে বলে মুখের মত জবাব। কীর্তিগড়ের পুরাতত্ত্বে আগ্রহী, রাজবংশের পারিবারিক ইতিহাসে আগ্রহী এই তরুণ লেখককে তিনি বিশেষ অতিথি হিসেবে পেয়ে যে নিজেকে গর্বিত এবং পুরস্কৃত বোধ করছেন সে কথা তিনি বারবার এমনভাবে বলছিলেন যে অতনু খুবই লজ্জিত হয়ে পড়ছিল। থেকে থেকে তার কাঁধের ওপর রঞ্জুপ্রসাদের হাতের চাপ তাকে আনমনা করে দিচ্ছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল এই হাত রাখা কেবল স্নেহবাচক নয়, এই ভর দিয়ে তিনি নিজেও যেন ভরসা কুড়োতে চাইছেন। মানুষটা হয়তো ভেতরে ভেতরে ভীষণ একলা। নানা প্রশ্নের টুকরো জবাব থেকে অতনু মোটামুটি এই অনুষ্ঠানের নেপথ্যের ইতিহাস পেয়ে গিয়েছিল। আজকের দিনটাকে বেছে নেওয়ার পিছনে একটা কারণ, আজ রঞ্জুপ্রসাদের স্ত্রীর মৃত্যুদিন। সেই সঙ্গে আরও একটা স্মরণীয় কারণ অবশ্যই আছে বলেই তিনি ব্যাপারটা চেপে গেলেন। কে একজন ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসেছিল, 'আচ্ছা আপনার এই বিপুল সম্পত্তি আপনার অবর্তমানে কারা পাচ্ছেন, বলবেন কি?'

প্রশ্নটা শুনে যেভাবে ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিলেন, অতনুর মনে হয়েছিল ওঁর সহিষ্ণুতার শান্ত আবরণটা বোধহয় এইবার ফেটে পড়বে। কিন্তু রঞ্জুপ্রসাদ রাগ প্রকাশ করলেন না। ঠাণ্ডা গলায় উনি বললেন, 'কে বা কারা সেটা অবশ্যই প্রকাশ্য নয়। তবে আপনি ঠিকই বলেছেন, মানুষের জীবনের কোনও নিশ্চয়তা নেই। বিশেষ করে আমার বয়সী মানুষের। সেই জন্যে আমার সলিসিটারকে ডেকে এনেছি। আজকের অনুষ্ঠানের পর নতুন করে উইলের খসড়া তৈরি হবে।'

অতনুর কেমন মনে হল রঞ্জুপ্রসাদ হয়তো নিজের জীবনের নিরাপত্তা বিষয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন কোনও কারণে। আর তাই তাঁকে আজ এত ক্লান্ত আর ভেতরে ভেতরে অস্থির এবং একলা মনে হচ্ছে। কিন্তু অতনু তখনও জানত না অনুষ্ঠানের মাঝামাঝি পর্বে তার জন্যে একটা বিস্ময়ের চমক অপেক্ষা করে আছে।

ভিডিও ক্যামেরায় ছবি তোলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। থেকে থেকে জোরালো আলো এসে পড়ছিল তাদের মুখের ওপর। নৈশভোজের বেশ কিছুটা আগে অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে তিনি মিউজিয়ামের সামনে এসে দাঁড়ালেন। অতনু দুপুরেও

দেখেনি, এখন মিউজিয়ামের দরজায় পুলিশ পাহারা মোতায়েন দেখে ভীষণ অবাক লাগল।

পূর্বপুরুষদের কীর্তিচিহ্ন থরে থরে সাজানো সেই প্রশস্ত ঘরখানার মধ্যে ঢুকলে যেন অতীতের গন্ধ স্পষ্ট নাকে এসে লাগে। রঞ্জুপ্রসাদ বললেন, 'একসময় রাজাগিরির আমলে এই বার্ষিক উৎসবে পরিবারের ঐশ্বর্য, দুষ্প্রাপ্য রত্নাবলীর সংগ্রহ প্রদর্শন করা হত। সে ঐশ্বর্য এখন আর নেই। ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটার মত সব কোথায মিলিয়ে গেছে। এখন শুধু আছেন আমাদের কুলদেবতা। যিনি একসময়ে নিত্যপূজা পেতেন। পরে কেবল শিবরাত্রির দিন থেকে চৈত্রসংক্রান্তির দিন পর্যন্ত মাসাধিককাল অন্য গৃহদেবতাদেব সঙ্গে পূজিত হতেন। সুদীর্ঘকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকাব পর সেই কুলদেবতা আজ আপনাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছেন। ওই দেখুন।'

অতনু রীতিমত চমক খেয়ে দেখল একটা কাচের শো-কেসের মধ্যে সেই নটরাজ মূর্তিটি দাঁড করানো রয়েছে।

'সন্দিগ্ধ অতনুর মনটা কেমন বিরূপ হয়ে উঠেছিল। অনেকক্ষণ থেকেই সে সুযোগ খুঁজছিল, একবার ফাঁক পেতেই রঞ্জুপ্রসাদের আওতা থেকে বেরিয়ে ভিড়ের মধ্যে তফাতে সরে এল। রঞ্জুপ্রসাদ হয়তো লক্ষ্যও করেছিলেন ব্যাপারটা কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক আর ডাকেননি। তারপর একসময় মাইকেব সামনে দাঁড়িযে বললেন, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, প্লিজ ডু হেল্প ইযোরসেলভস।' বলেই হাতের ইশারায় দূরের লম্বা টেবিলটা দেখিয়ে দিলেন। কথাটা শুধু বলার অপেক্ষা, জমাট ভিড়টা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে বিলম্ব হল না। সবাই ভেতরে ভেতরে যেন অপেক্ষা করেই ছিল, নিজের নিজের ডিশ নিযে বিলক্ষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেউ কেউ একেবারে হুমড়ি খেযে। অতনুর লজ্জাই করছিল। ওপাশের টেবিলে হোটেলের উর্দিপরা লোকেরা চা, কফি আর কোল্ড ড্রিঙ্কস সার্ভ করতে করতে হিমসিম খাচ্ছিল।

সামান্য ঘেঁষাঘেঁষির মধ্যেই অতনুও সসঙ্কোচে ডিশ হাতে করে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পছন্দ অপছন্দের দরুন পাশ কাটিয়ে এখানে সেখানে থমকে দাঁড়াতে হচ্ছিল তাকে। নিজের বাছবিচারমত কোনও কোনও পাত্র থেকে নামমাত্র এক-আধ খামচা খাবার তুলে নিচ্ছিল নিজের ডিশে। অন্যমনস্ক অতনুর হঠাৎ খেয়াল হল কেউ তাকে অনেকক্ষণ থেকেই যেন খুঁচিয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। আশপাশের কারও কনুইয়ের গুঁতো ভেবে আমল দেয়নি। এবার মুখ ফেরাতেই দেখল শচী। শচীর এক হাতে উপচে-পড়া ডিশ, মুখে ততোধিক উপচে-পড়া হাসি। একটা চোখ টিপে প্রায় নিঃশ্বাস ফেলার মত গলায় বলল, 'ডোন্ট মাইন্ড, এই দ্বিতীয়বার হচ্ছে।'

'অতনু হেসে ফেলে বলল, 'অ, তুই! তা এরকম জীবনের ঝুঁকি নিযে?'

'তোমার মত আমার পাখির আহার না!' কটাক্ষে ওব প্লেট ছুঁযে গেল শচীদুলাল, 'তুমি হচ্ছ বাযুভুক প্রাণী। যাকগে, শোনো, তোমাকে ধরব বলেই তক্কে তক্কে ছিলাম। চলো কোথাও বসি দুজনে।'

অতনুও তাই চাইছিল। বলল, 'ওদিকে গেলে কেমন হয়?' চোখের ইশারায় দূরের খালি টেবিলগুলো দেখাল।

ঘাড় দুলিয়ে শচী বলল, 'ফাইন। তাই চলো।'

পছন্দসই একটা টেবিলে চেয়ার টেনে বসতে বসতে শচী বলল, 'আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে, গুরু! এটা কি রকম হল?'

অতনু দূরের জটলার মধ্যে কাকে যেন দেখছিল। নির্লিপ্ত গলায় বলল, 'কোনটা কি রকম হল?'

শচী মাথা ঝাঁকিযে বলল, 'আমি কি তখন ভুল দেখলাম ভাই? মনে হল আমাদের সেই পুরনো নটবাজ মূর্তিটাই! নাকি নকল, ডুপ্লিকেট আর একটা? আমার তো কিছুই মাথায় ঢুকছে না।'

অতনু ওর মুখের দিকে তাকাল, 'গভীব রহস্য, তাই না? তবে একটা কথা হলপ করে বলতে পারি, তোর ভুল হযনি, মূর্তিটা দু নম্বরি নয়। আর যেই চোখে ধুলো দিতে পাকক, ওই নটরাজ পারেনি।'

'সেই জন্যেই তো তোমাকে জিজ্ঞেস করা। জানি নটরাজকে তুমি গুলে খেযেছ।'

'না, অতটা পারিনি।' অতনু হাসল, 'নটরাজই আমাকে গুলিযে দিয়েছিল।'

শচী চিন্তিত গলায় বলল, 'মূর্তিটা কি দেবীদির কাছেই গোড়া থেকে ছিল? ছিল যদি, মূর্তিচোবেব চোখে ধুলো দিয়ে কি ভাবে থেকে গেল কে জানে! এর উত্তর একমাত্র তিনিই দিতে পারতেন। তিনিই বলতে পারতেন তাঁর কাছে কি ভাবে এবং কেন এ-বাড়ির পারিবারিক সম্পত্তি হাজির হর্যেছিল। আর হয়েছিল যদি, অত দামী মূর্তিটা নিতান্ত খেয়ালের বশেই তিনি আমাকে দান করে গেলেন কেন?'

অতনু বলল, 'শুধুই ভালবেসে বা খেয়ালের বশে নাও হতে পারে। হযতো মূর্তিটা নিয়ে বিদেশে পা বাড়ানো তিনি নিরাপদ বোধ করেননি। কিংবা বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন মূর্তিচোরেরা আন্দাজ করতে পেরে অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠেছে। তাই তাদের চোখে ধুলো দিতে এমন একজন কাউকে বেছে নিযেছিলেন, যাকে কেউ সন্দেহ করবে না। অথচ যার লোভ নেই, যার কাছে মূর্তিটা অক্ষত অবস্থায় নিরাপদে থেকে যাবে।'

'যদি তাই থাকত তাতে ওঁর কি লাভ হত জানি না।' শচী তার প্লেটে

কাঁটাচামচ বসাতে বসাতে বলল, 'আমি সে প্রশ্নও তুলছি না। ভাবছি মূর্তিটা হাত-ফেরতাই হয়ে রঞ্জুপ্রসাদের কাছে কি করে পৌঁছাল! এটা তো একটা রহস্যই কিন্তু তার থেকেও একটা গভীর রহস্য আছে তা কি জানো?'

'তুই বল্ আগে শুনি।'

'মূর্তি ফিরে পেয়ে ব্যাপারটা তিনি চেপে থাকতেই পারতেন। এতকাল যে দেবতার পুজো বন্ধ হয়ে ছিল, আরও কিছুকাল না হয় সেভাবেই থাকত। এভাবে সকলের চোখের সামনে জাহির করে বেড়ানো কি খুব বুদ্ধিমানের কাজ হল?'

অতনু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। বেশ মনোযোগ দিয়ে সে নিজেব ডিশের দিকে তাকিয়ে ছিল, শেষে এক চামচ খাবার মুখে ফেলে বলল, 'আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে থাকিস তা হলে বলব, যে-কোনও কাবণেই হোক উনি আর নিজেকে নিরাপদ বোধ করছেন না। হয়তো মূর্তিব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও।'

'তাই বোধহয ভদ্রলোকের মাথার ঠিক নেই?' শচী অবাক হয়ে বলল।

অতনু বলল, 'কিন্তু আমার মনে হয় ঠিক তার উলটো। উনি এনিহাউ মূর্তিটাকে এস্টাব্লিশ করতে চাইছিলেন, এক ধরনের আইডেন্টিফিকেশন হযতো দরকার ছিল।'

ব্যাপারটা শচীর ঠিক বোধগম্য হল না। সে শুধু চোখ তুলে তাকিযে থাকল। অতনু বুঝল কথাটা শচীর কাছে স্পষ্ট হয়নি, হেঁয়ালিব মত ঠেকছে। বলল, 'তুই নিশ্চয দেখেছিস ভিডিও ক্যামেরায় অনুষ্ঠানেব ছবির সঙ্গে নটবাজকেও ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খবরের কাগজের সাংবাদিকরা ছাড়াও রেডিও আর টিভি থেকে নিউজ কভার করতে নিজস্ব প্রতিনিধিবা এসেছে—সংবাদ বিচিত্রায় কিংবা স্থানীয টুকরো খবরে ঠিক ঢুকে যাবে। ফলে কত সহজে একটা স্থাযী ডকুমেন্টেশনের ব্যবস্থা হযে গেল। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক যে কেবল এই প্রথম নটরাজ মূর্তিটি চোখে দেখবে তাই নয়, এর মালিকানা সম্বন্ধেও অবহিত হবে। এত ওযাইড পাবলিসিটির পর নটবাজকে এখান থেকে নডানো সরানো, গুম করে রাখা বা পাচার করা যে-কোনও লোকের পক্ষেই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।'

শচী বলল, 'এবাব বুঝেছি।'

'রঞ্জুপ্রসাদের মনে অবশ্য অন্য এক মতলবও থাকতে পারে।'

'এছাড়াও অন্য মতলব? বলো কি!'

'ভদ্রলোক হয়তো চেয়েছিলেন আজ এখানে যেসব বিশিষ্ট মানুষজন এসেছেন সকলকেই সাক্ষী হিসেবে জড়িয়ে দিতে। সেই সঙ্গে ফিঙ্গার প্রিন্টের অ্যালবামের মতই এই অনুষ্ঠানে হাজির প্রত্যেকটি মুখের ছাপ তুলে রাখলেন। আমার ধারণা,

এই ডামাডোলের মধ্যে, তোর ভাষায় অন্য পার্টির লোকও দু-একজন সেঁধিয়ে রয়েছে। সেই অবাঞ্ছিতদের হয়তো এই মুহূর্তে শনাক্ত করা যাচ্ছে না, কিন্তু কোনও ঘটনা ঘটলে তাদের বেছে নেওয়া যাবে। ভিডিও ক্যামেরার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ হবে না।'

শচী বলল, 'সত্যি তনু, স্রেফ জাঁকজমকের খাতিরে এইসব ছবিটবি তোলা হচ্ছে ভেবেছিলাম। ভদ্রলোক অবাঙালি হলে কি হবে, মাথাটা দেখছি দিব্যি সাফ।'

'এই যে রাজামশাই—'

চেনা গলা শুনে শচী চমকে তাকিয়ে দেখল, সেই ডাক্তারনি, অতনুর ফ্রেন্ড সুপর্ণা পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, দুহাতে দুটি ধোঁয়া-ওঠা কফির মগ। শচীর দিকে তাকিয়ে হাসল, 'যান না মশাই, আমার তো দুটো হাত, আর একটা ম্যানেজ করে আনুন। এই ঠাণ্ডায় কফির তুলনা নেই।'

শচী লজ্জিত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এই যাচ্ছি—' বলে করুণ চোখে একবার নিজের অর্ধভুক্ত ডিশের দিকে তাকাল।

মুখে আঁচল দিয়ে হাসার মত চাপা হাসি হেসে সুপর্ণা বলল, 'ভয় নেই, নজর দিলেও আমরা কেউ ভাগ বসাব না।'

লালচে মুখে শচী প্রায় ছুট লাগাতেই অতনু হেসে ফেলে বলল, 'বেচারি।'

'কে বেচারি?' কফির মগ সাবধানে টেবিলে নামাতে নামাতে সুপর্ণা জানতে চায়।

'আপাতত আমার চেয়ে বেচারা তো আর কাউকে দেখছি না।'

সুপর্ণা ভুরু বাঁকিয়ে বলে, 'বিখ্যাত হওয়ার অনেক জ্বালা, তাই না?'

'জ্বালা না? তুমি পর্যন্ত আমাকে রাজা বানিয়ে ছাড়লে! আমি কি অপরাধ করেছি?'

ঠাট্টার গলায় সুপর্ণা গুনগুন করে গেয়ে উঠল এক কলি, 'লাল পাগুড়ি দিয়ে মাথে, রাজা হলে মথুরাতে—'

অতনু প্রতিবাদ জানাল, 'লাল পাগড়ির দিন বহুকাল চলে গেছে।'

'রয়্যাল সেন্সে বললাম।'

'ননসেন্স।'

'মোটেই না। চেনা মানুষ এক মুহূর্তে অচেনা হয়ে গেল, একেবারে নাগালের বাইরে—রীতিমত সেন্সেশনাল লাগছিল।'

অতনু নিচু গলায় বলল, 'তুমি কি মিউজিয়াম রুমে ঢুকেছিলে?'

সুপর্ণা হাসল, 'নিশ্চয়। পিছনে তাকালেই দেখতে পেতে। অবশ্য বিখ্যাতদের শুনেছি পিছনে তাকাতে নেই। কিন্তু কেন বলো তো?'

খোঁচাটা গায়ে মাখল না অতনু। বলল, 'নটরাজ মূর্তিটা নিশ্চয় দেখলে?'

'ওই সোনার নটরাজ তো? নিশ্চয় দেখলাম। এবং যদি ভুল করে না থাকি আগেও দেখেছি।' বলে সুপর্ণা মুখ টিপে হাসল।

'আগেও?' অতনু অবাক হয়ে তাকাল।

'লুকিয়ে-চুরিয়ে অবিশ্যি।' ওর ঠোঁটে তখনও সেই চতুর হাসিটা লেগে রয়েছে, 'তোমার সেই মডেল না? তুমি তোয়ালে চাপা দিয়ে আলমারিতে তুলে রাখলে?'

'সরি সুপর্ণা, সেদিন ওভাবে লুকোনো ছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না। তখন এমন এক টেনসনেব মধ্যে দিযে চলছিলাম, শুনলে অবাক হয়ে যাবে। শুনলে আরও অবাক হবে ওই ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে আমার কিছু পরামর্শের প্রযোজন। সাহায্যেরও প্রযোজন।'

সুপর্ণার মুখ গম্ভীব হযে গেল। শচী কফির মগ নিয়ে হনহনিযে আসছে দেখা গেল। সুপর্ণা দ্রুত গলায় বলল, 'ঠিক আছে, এসো তো, দেখা যাবে।'

ওরা মুখোমুখি বসে কফি প্রায় শেষ করে এনেছে। অতনুর আঙুলের ফাঁকে সদ্য ধরানো সিগারেট, শচীকে ঠাট্টা করে অতনু সবে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ঘটনাটা ঘটল। সমস্ত হলঘর চমকে দিযে পরপর দুবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হল। সুপর্ণা কফিতে চুমুক দিচ্ছিল, গায়ে চলকে পড়ল অনেকখানি। শচীর হাত থেকে চামচে ছিটকে পড়ল মেঝের ওপর। কানে তালা ধরানো আওয়াজের আকস্মিকতায় ওরা তিনজনেই উঠে দাঁড়িযেছিল। প্রথমে মনে হযেছিল ধোঁয়া, কিন্তু ধোঁয়া না। কফির কাপ, প্লেট, কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল মেঝের ওপরে ছিটকে ফেলে আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। একেবারে হুলস্থূল ব্যাপার। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না খবরের কাগজের কল্যাণে সকলেরই মনের মধ্যে প্যানিক তৈরি হয়েই ছিল, এবার তাতে ইন্ধন পড়েছে। সকলের আগে মনের মধ্যে বোধহয় উগ্রপন্থীদের কাণ্ডকারখানার কথাই উদয় হয়েছে।

সুপর্ণার মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল, 'বোমের আওয়াজ মনে হল!'

শচী বলল, 'তাজ্জব কাণ্ড! আওয়াজটা কোন দিক থেকে—'

অতনু যেন কান খাড়া করে কিছু অনুমান করার চেষ্টা করছিল। উদ্বিগ্ন গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এই রে! সর্বনাশটা বোধহয় ঘটেই গেল রে শচী! ইস, আমি এই ভয়টাই করছিলাম।'

'কেন, কী হল তনু? কী হয়েছে?' শচীর গলা আর্তনাদের মত শোনাল।

'গুলির শব্দ বুঝতে পারলি না?'

'অ্যাঁ, বোমা না? গুলির শব্দ এত জোরে!'

সুপর্ণা বলল, 'বন্দুকের আওয়াজ আমি কখনও শুনিনি। সিনেমায় অবশ্য—'

অতনু বলল, 'মনে হল রিভলভার থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। দোতলায় ঘটেছে।'

শচী সজোরে বলল, 'কক্ষণো না। এই হলঘর কেঁপে উঠল স্পষ্ট শুনলাম।'

অতনু বলল, 'না! শব্দের ক্যারেক্টারটা ধরতে পারলি না। শব্দটা এল এই হলঘরের চতুর্দিক থেকে। কেন জানিস? চারপাশের লাউড স্পিকার থেকে। তার মানে হল, কোনও হিড্‌ন মাইকের সামনে ফায়ার করা হয়েছে। চল আমার সঙ্গে, কুইক! সুপর্ণা, তুমি এখানেই থাকো, ভয় নেই!'

অতনু আগে আগে ছুটল। শচী ওকে ছায়ার মত অনুসরণ করল।

পাক্কা অ্যাথলেটের মত অতনু সিঁড়ি টপকে ওপরে উঠছিল। এক এক লাফে দুটো করে ধাপ ডিঙিয়ে যাচ্ছিল সে। মাঝারি হাইটের শচী পায়ের গতি দ্রুততর করেও ঠিক তাল মেলাতে পারছিল না। দম ফুরিয়ে আসছিল যেন। এককালেব নেশাটাকে দুম করে ছেড়ে দেবার কিছু কুফল তো আছেই। তবু বন্ধু যে বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে তা বুঝতে পারার পর সে কি আর পিছিয়ে থাকতে পারে!

অতনুর পাশাপাশি পৌঁছে সে হাঁপধরা গলায় বলে উঠল, 'আমরা কিন্তু শুধু হাতে, খেয়াল থাকে যেন!' শচীর মনে আফসোস হচ্ছিল, ইস, স্প্রিংযের ছোরাটাও যদি এখানে সঙ্গে আনত। সেটা তো এখন তাদের ঘরে সুটকেসে তালাবন্দী হয়ে পড়ে আছে।

'জানি শুধু হাতে, কিন্তু', অতনু ক্যারাটে ভাঁজার ভঙ্গিতে হাত দুটো সামনে তুলে বলল, 'এ দুটো আমি শুধু শুধু বয়ে বেড়াই না!'

শচী মনে জোর ফিরে পেয়ে বলল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

অতনু সিঁড়ির ওপরের ধাপে পৌঁছে গিয়েছিল। চাপা গলায় বলল, 'আগে রঞ্জুপ্রসাদ!'

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝুপ করে আলো নিবে গেল। সে অন্ধকার ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। চোখের সামনে পাঁচশো ওয়াটের নজর-ধাঁধানো বাল্‌ব আচমকা ফিউজ হয়ে গেলে যেমন হয়। কেবল চোখে নয়, সর্বাঙ্গে অন্ধ হয়ে-যাওয়া বোধহয় একেই বলে। ওরা সাবধান হবার সময় পেল না। ছুটে চলার ঝোঁকে বেশ কয়েক পা চলে এসেছিল দোতলার চত্বরে। নিচে মেয়েলি গলায় প্রায় কোরাস আর্ত চিৎকার ওদের কেমন বিভ্রান্ত করে দিল। প্রায় ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়েছিল শচী, হয়তো অতনুও। অপ্রত্যাশিত, একেবারেই কল্পনার বাইরের অঘটন। স্তব্ধ, স্থাণু হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে কেমন বেকুব লাগছিল। একতলার শোরগোলের জন্যে কোনও পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি সময়মত।

শুধু আলোর একটা সরু ঝলক যেন অন্ধকার ফুঁড়ে উল্কার মত কোথায় মিলিয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে অবশ্য কিছুই আর দেখতে পেল না। পেন্সিল টর্চের আলো? চোখের ভুল হতে পারে। ভাবছে, আর ঠিক তখনই শচীর ঘাড়ের ওপর কেউ হুড়মুড় করে এসে পড়ে তাকে ধরাশায়ী করে দিল। পড়ে যাবার মুহূর্তে তার মাথায় বোধহয় কেউ কঠিন ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করেছিল, শচী চোখে অন্ধকার দেখল।

হুটোপাটির শব্দটা অতনুর কানে গিয়েছিল। সে চাপা তীক্ষ্ণ গলায় ডাকল, 'শচী!'

কেউ বিকৃত দুর্বল গলায় বলে উঠল, 'আমি! আমি!' অতনু বুঝতে পারল গলাটা শচীর নয়। আর প্রায় তখনই নিচের চত্বরে একটা মোটর সাইকেল গর্জে উঠল। তারপর তার দ্রুতলয় ডুগডুগি দূর থেকে দূরের দিকে যেন মিলিয়ে যেতে থাকল। কিছু বোঝার আগেই দপ দপ করে আলো জ্বলে উঠল কয়েকটা। সে রোশনাই হল না, ঝাড়বাতির সেই উজ্জ্বল তেজী আলো নয়, বোঝাই যায় এটা সিংহবাড়ির নিজস্ব জেনারেটারের আলো। সেই আলোয় অতনু দেখল চ্যাটার্জি সাহেব ভাঙাচোরা 'দ'-এর মত কেতরে পড়ে আছেন। তাঁব অ্যাটাচিকেসটা যেখানে ছিটকে পড়ে আছে সেখানে শচীদুলাল গা-ঝাড়া দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসছে। এক হাতে শচী কপালের একটা পাশ চেপে ধরে আছে। বোঝাই যায় অন্ধকারে অ্যাটাচির চোট লেগেছে ওর কপালে। অতনু ছুটে গিয়ে চ্যাটার্জিকে আগে টেনে তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় লেগেছে আপনার? উঠুন। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করুন।'

গুরুতর কিছু না। অতনুর হাতে ভব দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে চ্যাটার্জি কাঁপা গলায় বললেন, 'ফর নাথিং একটা কলিশন...শচীবাবুর কি হল?'

শচীবাবুর আর কি হবে! সিরিয়াস কিছু ঘটতে ঘটতে ঘটেনি। শুধু ডান কপালে ভুরুর ওপবে একটা নৈনিতাল আলু ফুলে উঠেছে। সে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'আমি অলরাইট। চলুন।'

'ওঃ, ইয়েস! আমি তো তাই যাচ্ছিলাম। রঞ্জুবাবুর ঘর থেকেই খুব সম্ভব—'

অতনু সকলের আগে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। পেছনে শচী। তার পেছনে অ্যাটাচি হাতে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বিষ্ণু চ্যাটার্জি। হাঁটু কিংবা পায়ের পাতা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, মচকে গেছে সম্ভবত।

দরজা ভেজানো ছিল। আলো জ্বলছিল। বন্ধ ঘরে বারুদের গন্ধ। খাটের কাছে হুমড়ি খেয়ে রঞ্জুপ্রসাদের নিশ্চল দেহটা পড়ে আছে। কম আলোতেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল দেহে প্রাণ নেই। বাঁ পিঠে শিরদাঁড়া বরাবর সার্জের পাঞ্জাবিতে ঝলসে যাওয়া দুটো গর্ত। বোধহয় দুটো গুলিই নির্ভুল রকমে হৃৎপিণ্ড ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় করে।

চ্যাটার্জি আর্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'হেঃ ভগবান! দি এণ্ড!'

যদিও আততায়ীর এতক্ষণ বসে থাকার কথা নয়, তবু নিশ্চিত হবার জন্যে অতনু পাশের ঘরে ছুটে গেল। সেখান থেকে বাথরুমে। সম্ভব অসম্ভব আনাচ-কানাচ দেখল। খুনী হাওয়া।

বিষ্ণুবাবুও বসে ছিলেন না। ভেতরের ঘরে ঢুকে তিনি সম্ভবত কাউকে টেলিফোন করছিলেন। বাইরের ঘরে ফিরে এসে অতনু অবাক হল। শচীদুলালকে সে কোথাও দেখতে পেল না। হঠাৎ চোখে পড়ল খাটের একপাশে রিভলভারটা পড়ে রয়েছে। খুব সম্ভব এটাই সেই মারণাস্ত্র। পকেট থেকে রুমাল বের করে হাঁটু গেড়ে বসল অতনু, তারপর সাবধানে রুমালে জড়িয়ে রিভলভারটা তুলে নাকের কাছে ধরল। হ্যাঁ, নলের ভেতরে পোড়া বারুদের গন্ধ খুব স্পষ্ট। এটা থেকেই গুলি ছোঁড়া হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। রুমালে জড়ানো রিভলভারটা পকেটে পুরে উঠে দাঁড়াতেই বিষ্ণুবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। খুব ব্যস্ত গলায় চ্যাটার্জি বললেন, 'আমি থানায় ফোন করে এলাম। এরকম একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্তে প্রভাকরবাবু যে কোথায় বসে থাকলেন—শচীবাবুকে অবশ্য নিচে পাঠিয়েছি দেখতে!'

অতনু বলল, 'হ্যাঁ, যে বিকট আওয়াজ হয়েছিল, সেটা তো তাঁর কানে না যাবার কথা নয়, গোটা বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে গেল।' বলেই অতনুর মনে পড়ে গেল। সে সতর্ক চোখে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। লুকোনো মাইক্রোফোন যদি কোথাও থাকে তবে তা এ-ঘরেই আছে।

বিষ্ণু চ্যাটার্জি চিন্তিত গলায় বললেন, 'একটা স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার কি জানেন, বন্দুক-পিস্তল থেকে এরকম প্রচণ্ড আওয়াজ কখনও হতে পারে না। আমি তো ভেবেছিলাম বোমা ফেটেছে। হয়তো সেরকমই কিছু হয়েছে কোথাও। নইলে এই বন্ধ ঘরের ভেতরের গুলির শব্দ বাইরে থেকে তেমন শুনতে পাবার কথা নয়। আমার নিজেরই রিভলভার আছে, আমি জানি।'

অতনু অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'আছে বুঝি?'

'নিশ্চয়।' চ্যাটার্জি ভীষণ অবাক হয়ে অতনুর অদ্ভুত কাণ্ড দেখছিলেন। শেষে অতনু যখন ঘরময় চক্কর দেবার পর প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে খাটের তলাটা দেখছিল তখন আর কৌতূহল চাপতে পারলেন না। বললেন, 'আপনার কি হয়েছে বলুন তো! কি খুঁজছেন?'

'অন্তত মাথা খারাপ হয়নি এটুকু বলতে পারি।'

চ্যাটার্জি সম্ভবত সে রকমই সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন। বললেন, 'তাহলে?'

'এ-ঘরে একটা লুকোনো মাইক্রোফোন আছে। কিন্তু কোথায় তা ট্রেস করতে পারছি না।'

'অ্যাঁ!' চ্যাটার্জির মুখ দিয়ে প্রথমে শুধু বিস্ময়ের ধ্বনি বেরোল। শেষে বললেন, 'সেকি কথা! এরকম আজগুবি কল্পনা আপনার মাথায় কি করে—'

কথা শেষ হবার আগেই শচীদুলাল আর সুপর্ণা ছুটতে ছুটতে এসে ভেতরে ঢুকল।

সুপর্ণা গম্ভীর গলায় বলল, 'কই, কোথায়? আমাকে দেখতে দিন!'

শচী আড়াল ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওই যে!'

অতনু উঠে দাঁডিয়েছিল আগেই। এগিয়ে আসছিল, বিষ্ণু চ্যাটার্জি তাকে হাতের ইশারায় নিজের কাছে ডাকলেন। অতনু কাছে আসতেই তাকে নিয়ে ঘরের অন্য প্রান্তে খানিকটা তফাতে সরে গেলেন। সহানুভূতি জানানোর ভঙ্গিতে অতনুব কাঁধে একটা হাত রেখে দাঁড়ালেন। বুঝতে অসুবিধে হল না ভদ্রলোক কিছু বলবেন, বলতে চাইছেন।

লেডি ডাক্তার ততক্ষণে প্রায় নীল-ডাউনের ভঙ্গিতে রঞ্জুপ্রসাদের শিয়রে বসে পড়েছে। তার পাশে শচী দু হাঁটুব ওপরে হাতের ঠেকনো রেখে ঝুঁকে সুপর্ণার কার্যকলাপ দেখতে ব্যস্ত। অতনু সামান্য বিরক্ত হল। শচী বোধহয় নিজের বুদ্ধিতেই হাতের কাছের ডাক্তার হিসেবে সুপর্ণাকে ডেকে নিয়ে এসেছে। সুপর্ণার চেয়েও প্রভাকরের উপস্থিতিই এখন এখানে জরুরি ছিল।

চ্যাটার্জি বললেন, 'পেলেন কিছু?'

অতনু জিজ্ঞেস করল, 'কি?'

'ওই যে মাইক্রোফোন না কি?'

অতনু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। চ্যাটার্জিও মাথা দোলালেন। যেন বলতে চাইলেন পাবেন না, ওসব কিছু নেই। অতনু ভাবল একবার কুড়িয়ে-পাওয়া রিভলভারের কথাটা বলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলল না। আগে পুলিশ আসুক, প্রভাকর আসুক, সময়মত বলা যাবে।

চ্যাটার্জি ওর কাঁধে হাত রেখেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, 'ওই সাইলেন্ট মানুষটা নিজের মুখে আর কিছুই বলতে পারবেন না। ভেরি স্যাড, ভেরি মাচ শকিং। আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি কিন্তু আপনার ফাদার, মানে আপনার বাবা রঞ্জুপ্রসাদকে—'

এরকম ভেঙে ভেঙে, নাটক করে কথা বললে ধৈর্যচ্যুতি ঘটবেই। বিশেষ করে এই সময়ে, যখন গালগল্পের অবকাশ নেই। অতনু অস্থির গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'হোয়াট? কি হয়েছে?'

ওপাশ থেকে সুপর্ণা উত্তর দিল, 'কিছু না, আপনারা একটু সাহায্য করুন। এঁকে বিছানার ওপর তুলে শোয়াতে হবে।'

অতনু চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আর এক পর্দা গলা চড়িয়ে বলল, 'হোয়াট?'

রঞ্জুপ্রসাদকে ধরাধরি করে খাটের ওপর তুলে শুইয়ে দেওয়া হল। কিন্তু যে পোজিশানে দু দুটো গুলি ওঁর শরীরে বিঁধেছে, তার পরেও উনি বেঁচে আছেন, তিনজনের কারুরই সেটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিল না। হৃৎপিণ্ড বরাবর গুলি, তৎক্ষণাৎই মৃত্যু ঘটার কথা, কিন্তু অলৌকিক ঘটনাও ঘটে তাহলে।

সুপর্ণা বলল, 'রক্ত বেরোয়নি দেখেই কেমন খটকা লেগেছিল। ফুটোর কাছে জামাটা ছিঁড়ে ফেলে দেখি নো বুলেট ইঞ্জুরি! অবিশ্যি পালস আগেই দেখে নিয়েছিলাম।'

বিষ্ণুবাবু অবাক গলায় বলে ওঠেন, 'তাহলে এটা কি ব্যাপার ঠিক বুঝলাম না তো, মিস মিত্র!'

সার্কাসের অভিজ্ঞতা থেকে অতনু উত্তর দিল, 'ফলস্ ফায়ার। ব্ল্যাঙ্ক কার্টিজ ব্যবহার করা হয়েছে। এত ক্লোজ কাউন্টার থেকে—পিঠে প্রায় নল ছুঁইয়ে ফায়ার করা হয়েছে, কালসিটে পড়বার কথা।'

সুপর্ণা সন্দিগ্ধ গলায় বলল, 'কী জানি। তবে ট্রিমেন্ডাস শক্ পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন এটুকু বলতে পারি। জল—'

বিষ্ণুবাবুর পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছিল। কষ্টের গলায় বললেন, 'দুলালবাবু, ঝট করে ওঘরে যান। জল পাবেন। আলমারিতে ব্র্যান্ডিও দেখেছি। গরম দুধের দরকার হলে নিচে যেতে হবে কিন্তু।'

শচী দৌড়ল। অতনু ততক্ষণে অন্য কাজে ব্যস্ত। নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত কিছুতেই সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না। রঞ্জুপ্রসাদের পিঠ আলোর উলটো দিকে ফেরানো, ঘরের আলোর এমনিতেই খুব জোর নেই। জামা গেঞ্জি সরিয়ে রঞ্জুপ্রসাদের পিঠটা দেশলাই কাঠির আলোয় সাবধানে দেখে নিচ্ছিল সে। কালসিটে বোঝা যাচ্ছিল না। দুটো স্পট বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে লালচে হয়ে আছে। আগুনের ছ্যাঁকা লাগলে ফোস্কা পড়ার আগে যেমন হয়। অতনু আরও কিছু বোধহয় খুঁজছিল। পেয়েও গেল। সুর্পণারা তখন ওপাশে রঞ্জুপ্রসাদের জ্ঞান ফেরাতে ব্যস্ত।

কয়েক আঁজলা ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা চোখে-মুখে লাগতেই রঞ্জুপ্রসাদের জ্ঞান একটু একটু করে ফিরে আসছিল। দু চামচ ব্র্যান্ডি গলায় যেতেই উনি চোখ খুলে তাকালেন। বেশ কয়েক সেকেন্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকার পর বোধহয় ঘটনাটা মনে পড়ে গেল তাঁর। কেমন একটা বিস্ময়-বিহ্বল অবিশ্বাসের ছায়া ফুলে উঠল মুখে-চোখে। অতনু বুঝতে পারল, তিনি যে এখনও বেঁচে আছেন, সত্যিই বেঁচে আছেন, এটা যেন মেনে নিতে পারছেন না। ধড়মড় করে উঠে বসতে যেতেই সুপর্ণা বলল, 'একদম বেডরেস্ট, চুপচাপ শুয়ে থাকুন। গরম দুধ আসছে, আগে দুধ খাবেন।'

এই মেয়েটিকে চিনতে পারলেন না রঞ্জুপ্রসাদ। হুকুমের গলায় কথা বলছে এ কে? জিজ্ঞাসু চোখে বিষ্ণু চ্যাটার্জির দিকে তাকাতেই তিনি আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসলেন, 'ডাক্তার। লেডি ডাক্তার।'

ফ্ল্যাটের বাইরে বেশ কিছু গলা শোনা যাচ্ছিল, এলোমেলো জুতোর শব্দ। সুপর্ণা অতনুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন কাউকে এখানে ভিড় করতে দেওয়া হবে না। ওদের আটকাতে হবে। এক্ষুণি।'

অতনু এক লাফে দরজার দিকে এগোল। চ্যাটার্জির দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। রঞ্জুপ্রসাদের পায়ের দিকে খাটের কিনারে বসে পড়লেন। রঞ্জুপ্রসাদের ঠোঁট দুটো কাঁপছিল, তিনি বোধহয় কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন। চ্যাটার্জি হাত তুলে বললেন, 'থাক, এখন ওসব থাক। পরে শোনা যাবে।' বলা অবশ্য বাহুল্যই, কারণ কথা বলার শক্তি রঞ্জুপ্রসাদের ছিল না। তিনি এপাশে ওপাশে মাথা হেলিয়ে কাউকে খুঁজছিলেন। প্রভাকর হালদারকে ছাড়া আর কাকে! কিন্তু লোকটা যে কোথায় ভ্যানিশ হয়ে গেল কে জানে! চ্যাটার্জি বললেন, 'উনি এসে যাবেন। কোনও চিন্তা নেই, আমরা তো রয়েছি, অতনুবাবু আছেন।'

দুধের গ্লাস নিয়ে শচী এসে দাঁড়াতেই সুর্পণা হাত বাড়িয়ে সেটা নিল। শচীদুলালের মুখের দিকে তাকানো যায় না। কপালের ফোলাটা এখন নিচের দিকেও নেমে এসেছে নীলচে হয়ে। চোখের কোল ফুলে একটা চোখ প্রায় বুজে এসেছে। সেদিকে তাকিয়ে অনুতপ্ত চ্যাটার্জির হঠাৎ অ্যাটাচিকেসটার কথা মনে পড়ে গেল। ইতস্তত করে বলেই ফেললেন, 'দুলালবাবু, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, আমার অ্যাটাচিকেসটা ও-ঘরে ফেলে এসেছি—'

শচী বলল, 'এখানে নিয়ে আসব? এনে দিচ্ছি। আপনার পায়ের ব্যথা এখন কেমন?'

'আরও বেড়েছে। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।'

শচী কেসটা এনে দিতেই চ্যাটার্জি ব্যস্ত হাতে অ্যাটাচি খুললেন। হতবাক হয়ে এক পলক তাকিয়ে থেকে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে ভেতরের জিনিসপত্র হাঁটকাতে হাঁটকাতে বলে উঠলেন, 'গুড গড!'

শচী পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। গলার স্বর নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

'ইটস গন্ দুলালবাবু, ইটস গন্!'

'কিছু খুঁজে পাচ্ছেন না?'

হতাশ গলায় চ্যাটার্জি আপন মনে বলে উঠলেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার। কেউ নিশ্চয় তুলে নিয়েছে! কিন্তু কখন নিল? আজ দুপুরেও তো আমি দেখেছিলাম, আছে।'

'খুব দরকারী কিছু?' শচী ঝুঁকে তাকায়।

'তাজ্জব কাণ্ড মশাই! একটা সিল করা খাম ছিল ভেতরে। নেই। আরও ডেঞ্জারাস ব্যাপার, সেই সঙ্গে আমার লোডেড রিভলভারটাও মিসিং!'

ভদ্রলোকের উদ্‌ভ্রান্ত মুখের দিকে শচী চমকে তাকাল আর ঠিক তখনই অতনু ফিরে এল দ্রুতপায়ে। এক পলক রঞ্জুপ্রসাদের দিকে তাকাল। কোলের ওপর ওঁর মাথাটা তুলে ধরে সুপর্ণা দুধের গ্লাস নিয়ে ব্যস্ত। অতনু বিষ্ণুবাবুর কানে কানে বলল, 'পুলিশ এসে গেছে, নিন এবার হ্যাপা সামলান। সাত সতের উল্টোপাল্টা কোশ্চেন হবে, এদিকে পেশেন্টের তো এই অবস্থা!'

'না!' হাতের গ্লাসটা শচীর হাতে দিয়ে সুপর্ণা উঠে দাঁড়াল। 'এঁকে ডিসটার্ব করা চলবে না, বলতে হবে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, অসুস্থ মানুষ। মিঃ চ্যাটার্জি, আপনার পা-টাও দেখতে হবে, চলুন আমাদের সঙ্গে। আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে ওষুধ পাঠিয়ে দেব। শচীবাবুর জন্যেও।'

বিষ্ণুবাবুকে সবাই মিলে ধরাধরি করে পৌঁছে দেবার পর ফ্ল্যাটের সদর বন্ধ করে অতনু একাই ফিরে এল। স্থির হল প্রভাকর হালদার না ফেরা পর্যন্ত রঞ্জুপ্রসাদের পাহারায় অতনু একাই এখানে থাকবে।

একটা আর্মচেয়ার নিঃশব্দে খাটের পাশে সরিয়ে আনল অতনু। তার দিকেই পাশ ফিরে শুয়ে আছেন রঞ্জুপ্রসাদ। চোখ বন্ধ। ঘুমিয়ে পড়েছেন, না আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে তলিয়ে আছেন বোঝা গেল না। চেয়ারে গা ঢেলে পা ছড়িয়ে আরাম করে বসল অতনু। কিন্তু তার মগজে এই মুহূর্তে কোনও আরাম ছিল না। অনেকগুলো ব্যাপার কেমন তালগোল পাকিয়ে রয়েছে, কোনও মীমাংসা হচ্ছে না। মাইক্রোফোনের ব্যাপারটা না হয় তার ভিত্তিহীন কল্পনা কিন্তু ব্ল্যাঙ্ক ফায়ারের উদ্দেশ্যটা কি? রঞ্জুপ্রসাদকে যদি ভয় দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল, সে তো অন্য উপায়েও হতে পারত, এতখানি ঝুঁকি নেবার প্রয়োজন ছিল না। সাদা কাগজের চিঠিটার কথাও মনে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। চেয়ারে হেলান দিয়ে শুয়ে এই সব ভাবছে, হঠাৎ চোখে পড়ল খাটের মাথার দিকে পায়ার জোড়ের কাছে পপিন্সের সাইজের কি একটা বস্তু লেগে আছে। খয়েরি রংটা খাটের পালিশের সঙ্গে এমন মিশে আছে যে, চট করে চোখে পড়ে না। বুকের ভেতরটা আবিষ্কারের আনন্দে ধক্ করে উঠল।

ঝুঁকে হাত বাড়াল অতনু। যা ভেবেছিল তাই। সেলো টেপ দিয়ে সাঁটা। টেপ তুলে ফেলে জোরে টান দিতেই সেই মিনি মাইক্রোফোনটা খানিকটা তারসুদ্ধ খুলে-এল। আকারে ছোট হলেও বিদেশি যন্ত্র, খুব শক্তিশালী তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বেশিক্ষণ দেখার সময় পেল না অতনু। তার ষষ্ঠ চেতনায় একটা সূক্ষ্ম আলোড়ন ধরা পড়ল। তাড়াতাড়ি বুকপকেটে জিনিসটা চালান করে দিয়ে রঞ্জুপ্রসাদের মুখের দিকে তাকাতেই দেখল উনি চোখ মেলে ওকেই দেখছেন।

চোখাচোখি হতেই হাত বাড়ালেন। কারণটা ঠিক বুঝতে পারল না অতনু। মনে হয় না মাইক্রোফোনের ব্যাপারটা উনি বুঝতে পেরেছেন। চেয়ারটা আরও কাছে টেনে নিয়ে সামনে ঝুঁকে অতনু আলগোছে ওঁর হাতটা ধরল। বুঝতে পারল হাতটা কাঁপছে থরথর করে।

'কিছু কি বলতে চান আপনি?'

কথা বলতে পারবেন আশা করেনি অতনু। কিন্তু পারলেন। পরিষ্কার গলা। যদিও কাঁপছিল। দুর্বলতায় কিংবা ভেতরের উত্তেজনায়। বললেন, 'সরি মাই বয়। খুব বেশি সময় তো আর আমার হাতে নেই।'

অতনু মাথা নাড়ল, 'ছি ছি, একথা কেন বলছেন! এই তো আপনি এরই মধ্যে অনেক ইমপ্রুভ করেছেন। কাল সকালে দেখবেন একদম ফিট হয়ে গেছেন—'

এই নার্ভাস ব্রেকডাউনের অবস্থা থেকে ওঁকে চাঙ্গা করে তোলার জন্যে অতনু বোধহয় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই রঞ্জুপ্রসাদ নিচু গলায় বলে উঠলেন, 'মাই ডেজ আর নাম্বার্ড। কেউ জানে না। এইট টু টেন মান্থস...বড়জোর এক বছর, ডাক্তাররা বলেই দিয়েছেন।'

অতনু অবাক হয়ে বলল, 'কেন? কি হয়েছে আপনার?'

'কার্সিনোমা...ক্যান্সার। আজকের এই অনুষ্ঠানের পিছনে এই একটাই কারণ। আর হয়তো সময় পাব না, তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা হল, আর আমার কোনও দুঃখ নেই। শুধু একটা কথা বলি।' বলে চুপ করে গেলেন কিছু সময়ের জন্য। অতনুর মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোল না। হাতের মধ্যে হাত নিয়ে সে স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকল।

'নটরাজ মূর্তিটা তো দেখেছ?'

অতনু আর লুকোল না। এই মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে সত্যি কথাই বলল, 'মূর্তিটা সামান্য কয়েকদিন আমার কাছেই ছিল, পরে চুরি হয়ে যায়।'

ঠোঁটের কোণে আবছা ম্লান হাসি নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন রঞ্জুপ্রসাদ। বড় দুঃখের সেই হাসি। অতনু ভেবেছিল তার কথা শুনে চমকে উঠবেন, কিন্তু রঞ্জুপ্রসাদ চমকালেন না। স্থির চোখে তাকিয়ে চুপ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। পরে বললেন, 'আমাদের ডাউনফলের জন্যে দায়ী ওই অভিশপ্ত মূর্তি। ওই লোভনীয় মূর্তিটার লোভেই এত দুর্ঘটনা, নইলে—'

'হয়তো ঠিক তা নয়।' অতনু বলল, 'মূর্তির ভেতরে অন্য কিছু...আপনি নিশ্চয়ই জানেন।'

'অন্য কি? মূর্তির ভেতরে অন্য কি?' রঞ্জুপ্রসাদকে কেমন উত্তেজিত মনে হল।

'আপনি কিছু জানেন না? সত্যিই কিছু জানেন না?'

'না তো!' রঞ্জুপ্রসাদ সন্দিগ্ধ গলায় বলেন, 'মূর্তির ভেতরে আবার কি থাকবে? কেমন করেই বা থাকবে?'

অতনু বলল, 'মূর্তিটা ফাঁপা। ওর ভেতরে একটা নক্‌শা, মানে ছক ছিল।'

'বলো, বলো—' হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে রঞ্জুপ্রসাদ বোধহয় উঠে বসার চেষ্টা করতে যাচ্ছিলেন।

অতনু ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'বোধহয় একটা রহস্য, ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে মনে হয় এ-বাড়িতে কোনও গুপ্ত ভাণ্ডার আছে, ওই ছকটা তারই চাবিকাঠি।'

'অ্যা। ইউ মিন রত্নভাণ্ডার? হতে পারে, আশ্চর্য না, হতে পারে।' অস্ফুট স্বরে কি বিড়বিড় করে শেষে বললেন, 'সেই ছকটা এখন—'

'এখনও আমার কাছেই আছে। আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারি। আপনারই তো জিনিস।'

'না, থাক।' রঞ্জুপ্রসাদ ফিসফিস করে বললেন, 'তোমার কাছেই থাক। কিন্তু হুঁশিযার, কেউ যেন...কাউকে বোলো না। কাউকে না!'

হঠাৎ চোখ ঝলসে দিয়ে ঘরের উজ্জ্বল আলোগুলো জ্বলে উঠল। একেবারে চমকে যাবার মতই ব্যাপার। আচমকা আলোর বন্যা সহ্য করতে না পেরে রঞ্জুপ্রসাদ চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। অতনু ওঁর চোখ খোলার অপেক্ষায় চুপ করে বসেছিল। এমন সময় আর একদফা চমকে দিয়ে ডোরবেল বেজে উঠল। চিন্তিত মুখে অতনু কি ব্যাপার দেখতে উঠে গেল।

দরজা খুলতেই ই.এন.টি প্রভাকর মুখ বাড়ালেন, 'আরে মজুমদারমশাই যে! গুড ডিসিসন। চ্যাটার্জি সাহেবও নিশ্চয় আছেন?' পিছনে দরজাটা বন্ধ করে দিতে দিতে বললেন, 'একটু বেশিই দেরি করে ফেলেছি, একেবারেই হিসেবের বাইরে ছিল কিনা!'

'না, আমি একাই। বিষ্ণুবাবু এখন তাঁর নিজের ঘরেই খুব সম্ভব। পা মচকে বসে আছেন। তার ওপর এক চাঞ্চল্যকর দুর্ঘটনায় মন ভাল নেই। তাঁর ব্রিফকেস থেকে লোডেড রিভলভার খোয়া গেছে। সেই সঙ্গে একটা সিল-করা খাম। খুব জরুরি কিছু কাগজপত্র বোধহয় তার মধ্যে ছিল।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে প্রভাকর বললেন, 'ঠিক হয়েছে! যে লোক নিজের রিভলভারটাও সামলে রাখতে পারে না তাঁর ওসব যন্তর নিয়ে বেরোনো কেন বাপু! সর্বস্ব গেলেও আমার কোনও সিমপ্যাথি নেই। আবার আহ্লাদ করে পা মচকাবার কী হল? যাকগে, আমার প্রভু অলরাইট তো?'

প্রভাকরের কথা বলার ধাঁচে অতনু বিরক্তই হয়েছিল। তাই প্রভু কথাটার প্রসঙ্গ ঠিক ধরতে পারল না। তার থমকানো ভাবটা বুঝতে পেরেই প্রভাকর বলে উঠলেন, 'আমার লর্ড রঞ্জুপ্রসাদ সিংহমশাইয়ের কথা বলছি।'

অতনু বলল, 'তাঁর ওপর অ্যাটাক হয়েছিল।'

কেমন হেঁয়ালি মেশানো গলায় প্রভাকর বললেন, 'জানতাম। সিরিয়াস কিছু নয় নিশ্চয়? চলুন, দেখি।'

কনুইয়ে ভর দিয়ে রঞ্জুপ্রসাদ মাথাটা সামান্য উঁচু করে তাকিয়ে ছিলেন। কথাবার্তার শব্দ তাঁর কানে যাওয়ায় সম্ভবত কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন ছিলেন। প্রভাকরকে দেখে মুখে একটু স্বস্তির হাসি ফুটল। কুচকুচে কালো ঘন চুল ফুঁড়ে নেমে-আসা দুটি বৃহৎ শ্বেত জুল্পি আর খড়্গ নাসায় ফ্যাকাশে ফর্সা মুখখানাকে কেমন অবাস্তব লাগছিল।

প্রভাকর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত কায়দায় হাত দুটো তুলে বললেন, 'এসে গেছি প্রভুজি। এবার টেক রেস্ট, নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যান। আপনার ওপর দিয়ে অনেক ধাক্কা ধকল গেছে তো—'

প্রভাকরের কথার মধ্যেও এই প্রথম অবাঙালি টোনটা কানে ধরা পড়ল। বোধহয় এটা ওঁরই সঙ্গগুণে। রঞ্জুবাবু মাথা নামিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। ঠোঁট ফাঁক করে বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। প্রভাকর বলে উঠলেন, 'এখন না। অতনুবাবুর কাছে আমি এভরিথিং শুনে নিচ্ছি—। চলুন আমরা পাশের ঘরে যাই।'

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে সোফায় গিয়ে অতনুর মুখোমুখি বসলেন প্রভাকর।

'কী জানতে চান? এভরিথিং বলতে যে কী, আমি ঠিক বুঝলাম না।'

খুকখুক করে হেসে প্রভাকর বললেন, 'আপনার নজর আছে, বুদ্ধি আছে, আপনি খুব অ্যাডভেঞ্চারাস আছেন। আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউ।'

অতনু অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'বাজে ভনিতা রেখে কি জানতে চান বলুন?'

'আপনি যা বলবেন সবই একরকম আমার জানা।'

'কি রকম?' অতনুর গলায় শ্লেষ।

'এই যেমন লুকোনো মাইক্রোফোন...শক্ত কাগজের তৈরি ফলস্ বুলেটের খোল, যা আপনি কুড়িয়ে পেয়েছেন আশা করছি। আর হ্যাঁ, সেই রিভলভারটা, যা এই মুহূর্তে আপনার প্যান্টের পকেটে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি।'

অতনু স্তম্ভিত হয়ে গেল। ই এন টি প্রভাকরকে একটি ধূর্ত শেয়ালের মত লাগছিল তার।

'আর নাটক করে লাভ নেই।' প্রভাকর আবার বললেন, 'সময়ও নেই। আমি বলছি, শুনুন। ফাঁদটা আমিই পেতেছিলাম, কাকপক্ষীও জানত না। চ্যাটার্জি সাহেব তো নয়ই। ওঁর অ্যাটাচির মধ্যে আমার হাতসাফাই ছিল। লাইভ কার্টিজগুলো সরিয়ে ব্ল্যাঙ্ক কার্টিজ ভরে দিয়েছিলাম। আসল দলিলটা সরিয়ে সিল-করা খামের মধ্যে সই না-করা অন্য একটা দলিল রেখেছিলাম, যার বয়ানমাফিক রঞ্জুবাবুর

সমস্ত প্রপার্টি কয়েকটা জনসেবক প্রতিষ্ঠানকে দান করার কথা ছিল। কেন জানেন? আমাদের কাছে খবর ছিল, চ্যাটার্জি সাহেবের অজ্ঞাতেই ওরিজিনাল উইলের সব খবর লিক আউট হয়ে গেছে। রঞ্জুবাবুকে শিখিয়ে রেখেছিলাম, উনি যাতে উইল বদলানোর কথা ঘোষণা করেন। আমি জানতাম ক্রিমিনালরা এখানে আসতে বাধ্য। তারা নতুন উইলের ব্যাপারটা জানার জন্যে চ্যাটার্জি সাহেবের অ্যাটাচি খুঁজবে। তারা যাতে সহজে সেই সুযোগ পায় তার সব ব্যবস্থাই আমি করে রেখেছিলাম। অস্ত্রটাও তারা হাতে পেয়ে গেল। প্ল্যানমাফিক সবই ঠিকঠাক এগোচ্ছিল, হাতেনাতে ধরতে আমার লোকজন তৈরি হয়েই ছিল। আমি জানতাম ঘরের মধ্যে গুলি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে লুকোনো মাইক্রোফোনের কল্যাণে গোটা বাড়ি তটস্থ করে এমন প্রচণ্ড আওয়াজ হবে যে আক্রমণকারী দিশেহারা হয়ে ছুটে পালাতে বাধ্য হবে। এই পর্যন্ত প্ল্যানমাফিক ঘটনাগুলো ঠিকই ঘটেছে কিন্তু একটা ব্যাপার আগে থেকে ধারণা করতে পারিনি। ওদের কেউ যে এ-বাড়ির মেন সুইচ থেকে ফিউজ খুলে নিয়ে গোটা বাড়ি অন্ধকার করে দেবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে, আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি।' এই পর্যন্ত বলে প্রভাকর চুপ করলেন।

অতনু দুঃখিত গলায় বলল, 'জাল ছিঁড়ে তাহলে পালিয়ে গেল তো?'

প্রভাকর বললেন, 'না। অনেক কষ্টে পিছু ধাওয়া করে শেষ পর্যন্ত দুই মূর্তিমানকে ধরে ফেলেছি আমরা। তবে দলে আর কেউ ছিল কিনা বলা শক্ত। খুব সম্ভবত ছিল, সে চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। লোক দুটোকে থানায় জমা করে দিয়ে ফিরছি। আসলে একটা খুনের ব্যাপারে এদের আমরা খুঁজছিলাম। তাছাড়া এটাও তো বলতে গেলে হত্যার চেষ্টাই। পুলিশ দলাই-মলাই করলে আসল নামটা বেড়িয়ে পড়বে।'

সন্দিগ্ধ গলায় অতনু জিজ্ঞেস করল, 'একটা খুনের কথা কি বলছিলেন?'

প্রভাকর অস্বস্তিজনক চোখে অতনুর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যেন ইচ্ছে করেই দেরি করছিলেন। শেষে কেমন অদ্ভুত গলায় বলেন, 'খুনটা অবশ্য এখানে হয়নি, কলকাতায়।'

অস্ফুট গলায় অতনু বলল, 'কলকাতায়!'

প্রভাকর তেমনি রহস্যময় গলায় বললেন, 'বেশিদিনের তো কথা নয়। সন্দীপ সর্বাধিকারী, কী মনে পড়ছে?'

অতনুর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

প্রভাকরের আপাতনিরীহ প্রশ্নটা অন্য যে-কেউ শুনলে ভাবত তার মধ্যে ঘোরপ্যাঁচ কিছু নেই। সন্দীপ সর্বাধিকারীর হত্যা কিছু ভুলে যাবার মত পুরনো ব্যাপার না। কলকাতার কাগজে বেশ ফলাও করেই ছাপা হয়েছিল সেই ঘটনার

বিবরণ। তাই অতনুর সব মনে আছে কিনা জানতে চাওয়ার ভেতর অস্বাভাবিকতার চিহ্নমাত্রও হয়তো ছিল না। কিন্তু অতনুর সূক্ষ্ম সজাগ কানে কেমন খটকা লাগল, বলার ধরনটা গোলমেলে ঠেকল। ওই নিছক কথাগুলোর তলায় যে জাঁতিকলের মত কোনও ফাঁদ পাতা নেই তার বিশ্বাস কি? সে সতর্ক হয়ে গেল, হুট করে কোনও জবাব দিল না। আকস্মিক চমকের ধাক্কায় তার মুখ বিবর্ণ আর চেহারা বদলে গেছে বুঝতে পেরে সে নিজেকে লুকোতে চাইল। মাথা নিচু করে সে হঠাৎ প্যান্টের পাশ-পকেট থেকে রুমালে জড়ানো রিভলভারটা বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রভাকরবাবু ঝিল রোডের বাড়ির ভেতরের কথা জেনেশুনেই কিছু ইঙ্গিত করতে চাইছেন কিনা আন্দাজ করতে না পেরে সে মহাফাঁপরে পড়ে গেল। সে সময় নিচ্ছিল নিজেকে সহজ আর শক্ত করে তোলার জন্যে। মুখ না তুলেই সে অন্য পকেট হাতড়ে কাগজের শক্ত খোল দুটো বের করে আনল, শেষে বুকপকেট থেকে লকেটের মত তারসুদ্ধ মাইক্রোফোনটা। তিনটে জিনিসই একের পর এক সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে সে আত্মসমর্পণের ইচ্ছেটা দমন করে ফেলল। সেদিন সকালের সব ঘটনা নিজে থেকে অকপটে স্বীকার করলে তা এই মানুষটার কাছে কতখানি বিশ্বাসযোগ্য হবে এবং তার পরিণাম কী দাঁড়াবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। ও-বাড়ির ঘরের দেওয়ালে, মেঝেয়, ছুরির বাঁটে যে অকাট্য প্রমাণ সে রেখে এসেছে তা এতদিনে পুলিশের জিম্মায় ধোয়ামোছার বাইরে, পাকাপোক্ত রেকর্ড হয়ে গেছে। সেই অমোঘ ফাঁস থেকে তাকে বের করে আনার সাধ্য প্রভাকর হালদারেরও নেই। তা ছাড়া শত্রু না হলেও, প্রভাকর এ-বাড়ির স্বার্থেই সন্দীপের হত্যাকারীকে যে ভাবে খুঁজছেন তাতে করে অন্য কারও বাঁচা-মরা তাঁর কাছে গৌণ হতে বাধ্য। আবার ওদিকে থানার লক-আপে ক্রিমিন্যাল দুজন নিজেদের মাথা বাঁচাতে অতনুর নাম বলে তাকে ফাঁসিয়ে দিতেও পারে। হতাশ এবং মরিয়া হয়ে অতনু মনে মনে ভাবল, লেট দেম প্রুভ ইট! আমি কেন আগ বাড়িয়ে—

কিছুই হয়নি ভঙ্গিতে অতনু এবার মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল, 'আপনি যে হাত গুনতে-জানা জ্যোতিষীকেও হার মানালেন মশাই! আমি এগুলো আপনাকে দেব বলেই তুলে রেখেছিলাম। এই রিভলভারটাই তাহলে চ্যাটার্জি সাহেবের, যা উনি পাগলের মত খুঁজছিলেন? রুমালটা কিন্তু আমার, হাতের ছাপ থাকতে পারে ভেবে—'

'নট এ ব্যাড আইডিয়া!' প্রভাকর হাসলেন, 'ডিটেকটিভ উপন্যাস-টুপন্যাস খুব পড়েন, তাই না?'

'তা পেলে পড়ি বইকি!' অতনু কথা ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, পাশের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'উনি মানুষটা ভীষণ চাপা, তাই না? অথচ কিছুক্ষণ আগেও জানতাম না।'

প্রভাকর বললেন, 'প্রভুজি তাই! নতুন না, বরাবরই তাই! আমাকে আর চ্যাটার্জি সাহেবকে ছাড়া এখনও পর্যন্ত উনি কারও কাছেই মুখ খোলেননি। এত বড় ব্যাপারটা কেমন দাঁতে দাঁতে চেপে রেখেছিলেন দেখলেন তো?'

'হ্যাঁ। আপনি আসার আগে ওঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমাকে বলেই ফেললেন শেষ পর্যন্ত। শুনে তো আমি যাকে বলে হতভম্ব। মাথাটা ঘুরে গেল। এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'না, ফ্যাক্ট। ইট ইজ ফাইনাল!' প্রভাকব তর্জনী তুলে বললেন।

অতনু মনে মনে বলল, ফাইনাল ডায়াগনোসিস! মুখে সংক্ষেপে শুধু বলল, 'হুঁ।'

'অবশ্য আজ হোক কাল হোক বলতেই হত। আর লুকোছাপার তো কিছু নেই।'

'নিয়তি!' অতনু বলল, 'ভাগ্য যে কার জন্যে কি লুকিয়ে রেখেছে!'

প্রভাকর মাথা দুলিয়ে বললেন, 'ঠিক! মনে করতে হবে এটাই আপনার পাওনা ছিল। বরাতের বরাদ্দ। হাত পেতে নিতেই হবে।'

'হয়তো তাই হবে। তবু এক নিমেষে জগৎ সংসার, নিজের অতীত বর্তমান মিথ্যে করে জীবনের মানে বদলে যাওয়া...ভাবতে পারেন?'

'পারি।' প্রভাকর এই প্রথম কেমন আবেগের মাথায় বলে চললেন, 'প্রায় তিরিশ বছর পরে প্রভুজি এখানে ফিরে এলেন। জীবনের শেষ পর্বে সন্তান-খোয়ানো এক নিঃসঙ্গ মানুষ কি ভাবে ফিরে আসে সে আমার নিজের চোখে দেখা! প্রায় তিরিশ বছর পরে পিতৃপরিচয় ফিরে-পাওয়া আর একজন, অবশ্য এখানে তার এই প্রথম আসা—সত্যি ভাগ্যের নাটক ছাড়া আর কী!'

শেষ কথাটা অতনুকে কি রকম দিশেহারা করে দিল। মনে হল সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। প্রভাকর উন্মাদের মত এসব কী বলছেন? রঞ্জুপ্রসাদের ক্যান্সারের কথা থেকে, তাঁর আয়ু শেষ হয়ে আসার কথা থেকে এ কী প্রলাপ বকতে শুরু করলেন ভদ্রলোক! রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অতনু তাকিয়ে থাকল, কি বলবে ভেবে পেল না।

'আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝি। চলন্ত গাড়ি থেকে উল্টো দিকে লাফিয়ে পড়ার মত। পায়ের তলায় শক্ত মাটি স্পর্শ করার প্রথম ধাক্কা! তবু কী স্থির করলেন জানতে ইচ্ছে করছে।'

অতনু সবিস্ময়ে বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'থেকে যাচ্ছেন, না ফিরে যাচ্ছেন, কোনটা?'

'তার মানে! থেকে যাবার প্রশ্ন আসছে কেন! কোথায়? কেন? কী ভাবে!'

'উইল মোতাবেক আপনিই এখন এ-বাড়ির স্থাবর-অস্থাবর সবকিছুর

উত্তরাধিকারী! কিছুক্ষণ আগেই তো প্রভুজি আপনাকে বলে দিয়েছেন। কেন, বিশ্বাস হয়নি? দিস ইজ ফ্যাক্ট! ফাইনাল। অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।'

অতনুর বুকের ভেতর কেমন দুলে উঠল। মাথাটা ঘুরে গেল যেন। এসব কী শুনছে সে! এ কি কোনও পরিকল্পিত সাজানো ব্যাপার? তাকে ফাঁদে ফেলার মিথ্যে নাটক? স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি হারিয়ে যাবার মুখে হঠাৎ সমস্ত চেতনা হিম করে দিয়ে একটা ঘটনা, কিছুক্ষণ আগে এই ঘরে প্রথম পা দেবার পরে একজনের একটা অসমাপ্ত কথা তার কানের মধ্যে স্পষ্ট বেজে উঠল। কথাটার তখন অন্য মানে করে গুরুত্ব দেয়নি। রঞ্জুপ্রসাদ সম্ভবত বেঁচে আছেন—এই বিস্ময়ের ধাক্কাই সবকিছু ছাপিয়ে গিয়েছিল। কথাটা বলছিলেন বিষ্ণু চ্যাটার্জি, যিনি অতনুর মতই সেই মুহূর্তে রঞ্জুপ্রসাদকে মৃত ছাড়া কিছু ভাবতে পারেননি। ওদিকে সুপর্ণা ডাক্তারের রুটিন ওয়ার্ক সারতে রঞ্জুপ্রসাদের শিয়রে নিল-ডাউন হয়ে বসেছে, শচী দুই হাঁটুতে হাতের ভর রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দেখছে। এই ঝাপসা দৃশ্যটার অনেকখানি আড়াল করে চ্যাটার্জি তাঁর কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বলছিলেন, 'ভেরি স্যাড, ভেরি মাচ শকিং। আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারছি কিন্তু আপনার ফাদার, মানে আপনার বাবা রঞ্জুপ্রসাদকে—'

অতনুর বাবা রঞ্জুপ্রসাদ যদি কোনও কথা বলেও থাকেন, এতকাল পরে সেই মৌখিক প্রতিশ্রুতির কোনও গুরুত্ব ছিল না অতনুর কাছে। যার সাক্ষী নেই, প্রমাণ নেই, যা কেবল এক তরফের কথার কথা, তার দায় নিশ্চয়ই অতনুর নয়। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে সে বুঝতে পারল কথাটা সে আদৌ ধরতে পারেনি তখন। আসলে ওই 'ফাদার' আর 'বাবা' শব্দ দুটো বিশেষণের মত রঞ্জুপ্রসাদকে শনাক্ত করতেই ব্যবহার করেছিলেন বিষ্ণু চ্যাটার্জি। কিন্তু শুধু বিষ্ণুবাবুই বা কেন, এই নাটক শুরু হবার সেই প্রথম রাত্তিরে তার যে 'শুভাকাঙ্ক্ষী' রঞ্জুপ্রসাদ সেজে তাকে ঝিল রোডের বাড়িতে ডেকেছিল সেও তাহলে তার অতীত আর ভবিষ্যৎ দুটোই জানত। আর এই গোপন খবরটুকুকে মূলধন করেই সে তাকে অসৎ উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। তাকে ফাঁসিয়ে ব্ল্যাকমেল করার জন্যে পিছনে লেগেছিল। অতনু চমকে উঠল। মনে হল কানের মধ্যে খুব আবছা হয়ে একটা টেপ বাজছেঃ

'আপনি?'

'আপনার পাস্ট, অতীত—।...আপনার অতীত জানতে ইচ্ছে করে না?'

'আমার অতীত আমি জানি। নতুন করে আর কিছু জানার নেই।'

'কে বলল নেই? একটা দারুণ খবর আছে, শুনলে চমকে যেতে পারেন।...আসলে খবরটাই আসল। খুব জরুরি। জরুরি, কেন না এর ওপর আপনার ভাগ্য, আপনার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।'

এই একটুকরো সংলাপের বাইরে বাকি কথাগুলো বোধহয় মুছে গেছে, শোনা গেল না। মানুষের মগজ হয়তো এই রকমই খেয়ালি, কিছু ধরে রাখে, বেশির ভাগই রাখে না।

প্রভাকরের দিকে তাকিয়ে অতনু কেমন মচকানো গলায় প্রতিবাদ জানাল, 'না, আপনার প্রভুজি এসব কিছুই বলেননি। এই হেঁয়ালি শুনিয়ে আপনার লাভ? আমার বাবার কথা আমার খুব ভাল করেই মনে আছে। তিনি আজ বেঁচে থাকলে—'

'বেঁচে থাকলে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত। আমাকে হেঁয়ালি শোনাতে হত না।'—প্রভাকরের গলা শুনে বোঝা যাচ্ছিল তিনি কিঞ্চিৎ আহত হয়েছেন। নিজেকে সামলে নিতে ফের বললেন, 'আমার বিশ্বাস মিঃ মজুমদার অন্তত সদ্য পুত্রশোক-পাওয়া বন্ধুকে কখনও ঠেলতে পারতেন না।'

অতনু বিস্মিত গলায় শুধোল, 'আপনি কি রঞ্জুবাবুর ছেলের কথা বলছেন? তিনি কি এ-বাড়িতেই মারা গেছেন? কতদিন আগের ঘটনা?'

'কেন, একটু আগে তো সেই কথাই বলছিলাম, খেয়াল করেননি? সে কী! ঝিল রোডে যিনি খুন হয়েছিলেন!'

'সে তো সন্দীপ নামের এক তরুণ।'

'ইয়েস! সন্দীপই প্রভুজির ছেলে।'

'সে তো সর্বাধিকারী! আপনার কথার কোনও মাথামুণ্ডু নেই। আবোল-তাবোল বকছেন।'

প্রভাকর হাসলেন, 'সর্বাধিকারী তো কী হয়েছে? পদবীর হিসেব কি সব সময় মেলে! আপনিও তো মজুমদার, তবে? ইট ইজ এ লং স্টোরি।'

'গপ্পো?' অতনু যেন ব্যঙ্গ করেই বলল, 'স্টোরিকে তো বাংলায় তাই বলে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু গল্প হলেও সত্যি! আজ থেকে তিরিশ-বত্রিশ বছর পেছিয়ে যেতে হবে আমাদের। শুনুন তাহলে।'

রঞ্জুপ্রসাদের কাহিনী সত্যিই রোমাঞ্চকর। শুনতে শুনতে অতনুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল, বুঝতে পারছিল তার পায়ের তলা থেকে মাটি এবার সত্যিই সরে যাচ্ছে, তাতে কোনও ভুল নেই। হেঁয়ালি নেই। বুকের ভেতর কেমন এক শূন্যতা খাঁ খাঁ করছে। তার এতকালের পরিচয়, তার আজন্মের বিশ্বাস কেউ নিষ্ঠুর হাতে বাজে কাগজের মত ড্যালা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল এই মাত্তর। অতীত আর বর্তমান একাকার হয়ে যাওয়া এই মুহূর্তে। রঞ্জুপ্রসাদ একই রকম বিপন্ন বোধ করেছিলেন। দীর্ঘমেয়াদি ভারী দায়িত্বে চুক্তিবদ্ধ রঞ্জুপ্রসাদের মাথায় সেদিন আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থাই। ভেতরে ভেতরে দু টুকরো হয়ে গিয়েছিলেন। প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছিল দুজনের। কাগজপত্র তৈরি।

হঠাৎ কলকাতা ছাড়ার দুদিন আগের রাত্রে বিপর্যয় ঘটে গেল। প্রিম্যাচিওর ডেলিভারির পরে টিটেনাস হয়ে স্ত্রী মারা গেলেন। ডাক্তারদের হিসেবমত আরও মাস দেড়েক দেরি ছিল। দুই বাঙালি বন্ধু সেদিন পাশে এসে না দাঁড়ালে সদ্যোজাত দুই যমজ সন্তান নিয়ে রঞ্জুপ্রসাদকে চোখে অন্ধকার দেখতে হত। মুশকিল আসান করে দিলেন তাঁরাই। সর্বাধিকারী ছিলেন বয়সে বেশ কয়েক বছরের বড়। তাঁর দুই মেয়ে, কোনও ছেলে ছিল না। একটি শিশুকে তিনি দত্তক নিলেন। অন্যটিকে গ্রহণ করলেন মজুমদার। তিনি তো নিঃসন্তানই ছিলেন, ছেলেপুলে হবার আশা তাঁরা ছেড়েই দিয়েছিলেন। কিন্তু নাটকীয় মনে হলেও ঘটনা ঘটল অন্যরকম। অতনুকে ঘরে আনার বছর দুয়েকের মধ্যেই তাঁদের একটি পুত্রসন্তান জন্মাল। তারপর পিঠোপিঠি আর একটি।

হতবাক অতনুর মনে হল কেউ তাকে অতর্কিতে বার দরিয়ার দিকে ঠেলে দিল। বাঙালির ঘর থেকে, বঙ্গসমাজ থেকে, এতকালের গণ্ডি থেকে ছিন্নমূল হতে কতটুকুই বা সময় লাগল! তার চোখের সামনে থেকে কুয়াশার পর্দা সরে যাচ্ছিল দ্রুতগতিতে। বাড়ির সকলের বিচিত্র আচরণের ব্যাখ্যা এবার স্বচ্ছ হয়ে এল। ছেলেবেলা থেকেই অন্য ভাইদের তুলনায় কেন সে কেমন আলগা-আলগা, বাড়িটা লিখে-পড়ে দেবার সময় কেন তার নামটা শুধু বাদ পড়ে গেল, বুঝতে আর কোনও অসুবিধে নেই। শচীদুলাল তার ডুপ্লিকেট আবিষ্কার করে চমকে উঠেছিল, পরে সে নিজেও ঝিল রোডের বাড়িতে সন্দীপকে দেখে। এর কারণটা এখন জলের মত স্পষ্ট। ছেলেবেলায় বাবার হাত ধরে ঝিল রোডের বাড়িতে যাওয়ার রহস্যও।

বুকে গুলি-খাওয়া মানুষের মত টলতে টলতে সে যখন ঘরে ঢুকল শচীদুলাল কী একটা কাজে ব্যস্ত ছিল, ভাল করে লক্ষ্য করেনি। চোখ না তুলেই সে বলল, 'তোমার এত দেরি হল, গুরু? আলো ফিরে এল অথচ তুমি ফিরলে না দেখে ভাবছিলাম।'

অতনু উত্তর দিল না। শচীর কেমন খটকা লাগল। সে আসলে রঞ্জুপ্রসাদ আর প্রভাকর হালদারের খবর জানার জন্যে মনে মনে উদ্‌গ্রীব ছিল। কিন্তু মুখ তুলে অতনুর দিকে তাকিয়ে চমকে গেল, কোনও প্রশ্নই তার মুখ দিয়ে বেরোল না। এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অতনুর চেহারা কেমন অন্যরকম হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ, চোখ-মুখ বসা, বিধ্বস্ত ভঙ্গি। সোফার ওপরে ধপ্ করে বসে পড়ল। অন্যমনস্কের মত কী যেন ভেবে চলেছে, শচীর কথা তার কানেই যায়নি, হয়তো তার অস্তিত্বও সে খেয়াল করেনি।

কেমন ভয়-পাওয়া গলায় শচী জিজ্ঞেস করল, 'তনু? এই তনু, কী ব্যাপার? কোনও খারাপ খবর কিছু?'

অতনু মুখ ফিরিয়ে তাকাল। তার মরা চোখে যেন আবার দৃষ্টি ফিরল। অদৃশ্য কথার ভরে ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল বার কতক কিন্তু বাষ্পরুদ্ধ গলা দিয়ে স্বর ফুটতে দেরি হল। বলল, 'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না, আমি তোমাদের কেউ না। কেউ না! আমি খুব দুঃখিত শচীদুলাল। খুব লজ্জিত তোমার কাছে। আমাকে তুমি বাদ দাও।'

কথাগুলো খুব করুণ আর ক্লান্ত শোনাল। এমন উদ্ভট কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না শচী। নিজের অজ্ঞান্তে তবে সে কি কোনও অন্যায় করে ফেলেছে? নইলে অতনু কখনও যা করে না, এমন তুমি তুমি করে কথা বলছে কেন?

'তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ অতনু?' শচী আক্ষেপের গলায় বলে, 'তুমি এরকম করে কথা বলছ কেন? তোমাকে বাদ দেব! কেন? কী হযেছে? ঘটনাটা কী ভেঙে বলবে তো!'

অতনু থমথমে গলায় বলল, 'ওসব না, অন্য ব্যাপার। আসলে মাথাটা কেমন গুলিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কোনও ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন, কোনও মারাত্মক খোয়াব দেখছি—বোধহয় পাগল হয়ে যেতে আর বেশি দেরি নেই।'

'দুঃস্বপ্ন...খোয়াব...পাগল হয়ে যাওয়া—এসব কী বলছ! দেহে-মনে তোমাকে এতদিন যে আয়রনম্যান বলেই জানতাম! না না, ধ্যেত, কী যে কখন তোমার মাথায় ঢোকে!'

অতনু গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি জানো না, এইমাত্র জানতে পারলাম, রঞ্জুপ্রসাদ তাঁর সবকিছু আমাকেই লিখে দিয়েছেন। আমি এখন এই সিংহবাড়ির বড় তরফের সব সম্পত্তির মালিক।'

সব ভুলে গিয়ে শচী সত্যি-সত্যিই লাফিয়ে উঠল, 'রিয়্যালি! বলো কী ব্রাদার? এ তো পাগল হয়ে যাবার মতই খবর একটা! একে তুমি দুঃস্বপ্ন বলছ! আমার তো দু হাত তুলে নাচতে ইচ্ছে করছে। সত্যি অতনু, বিশ্বাসই করতে পারছি না ভাই। ভদ্রলোকের সারা জীবনের উপার্জন, এদেশি মুদ্রায় সেও তো একটা হিউজ ব্যাপার হবে!'

'প্রপার্টি-পয়সাকড়ি, ড্যাম ইট! আমি ও নিয়ে মাথাই ঘামাচ্ছি না। আমি মরছি আমার নিজের জ্বালায়।' শচীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে অতনুর টালমাটাল ভাব আর বুকের ভেতরে শূন্যতার চাপ যেন আলগা হয়ে আসছিল। বোতলের লেবেল তুলে ফেললেও বোতল যেমন বদলায় না, তার ভেতরের পদার্থও একই থাকে, মানুষও বোধহয় তেমনি, তার বাইরের আকৃতি আর ভেতরের প্রকৃতি পাল্টায় না। অতনুরও তেমনি। মুখে যদিও সে আবার বলল, 'আমি আর সে আমি নেই। তোমার অতনু মজুমদারের খেল খতম হয়ে গেছে।'

'কই, না! আমার চোখে তো তুমি একই আছ। তোমার জীবন তুমি নতুন

করে শুরু করতে যাচ্ছ এই যা। যাকে বলে বাজেট বদলানো। কিন্তু বন্ধুর কাছে, ছেলেবেলার বন্ধুর কাছে, বন্ধু কখনও বদলায় না।'

'বাজেট না শচী, বাজেট না!' অতনু হঠাৎ অসংলগ্নের মত অট্টহাসি হেসে উঠল। তারপর বিকৃত গলায় বলল, 'মেরে বাপের নাম ভুলিয়ে দেওয়া কাকে বলে জানিস! এই আমাকে দ্যাখ্।'

শচী লক্ষ্য করল অতনু আবার তুমি থেকে তুই-তে ফিরেছে। যাক, সুলক্ষণ।

শচী হাসল, 'বলেছি তো আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

অতনু রেগে গেল, 'তুই কানা, অন্ধ। কিছুই দেখতে পাস না। আমার জাত, আমার পদবী বদলে গেছে, এখন থেকে আর আমি মজুমদার না, সিংহ। আমার বাবার নাম রঞ্জুপ্রসাদ সিংহ।'

একটা শুকনো ঢোক গিলে শচী বলল, 'তাই বলো, উনি তোমাকে পোষ্যপুত্র হিসেবে—'

হাতের বাতাস দিয়ে মাছি তাড়ানোর কায়দায় অতনু ওর বাকি কথাগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আগে সব শোন্।'

সব শুনে শচী বলল, 'জাতপাত আমি মানি না। আমি বামুন, তুমি ক্ষত্রিয়, আর একজন হয়তো বৈশ্য কি শূদ্র, তাতে কী? আর পদবী? বিয়ের পর যে মেয়েদের পদবী বদলায় তাতে কি সে মানুষটাও বদলে যায়? অনেকে আবার আগের পদবীই ধরে থাকেন। তুমি টাইটেল চেঞ্জ করো না, ফুরিয়ে গেল! তোমার জন্ম বাংলায়, মুখের ভাষা বাংলা, মনটা বাঙালি—সে তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তুমি মাইরি উপন্যাসের মত কথা কইছ, যেন রবি ঠাকুরের 'গোরা'!'

'বাজে বকিস না! আর আমার শিরায় ধমনীতে যে রক্ত বইছে, তা বদলাবে কী করে?'

হিঃ হিঃ করে হেসে শচীদুলাল বলল, 'তুমি না গুরু ক'বছর ডাক্তারি পড়েছিলে? তুমি জানো না, রক্তের কোনও জাত নেই, শুধু গ্রুপ আছে। হাসপাতালে কত রোগীকে যে বোতল বোতল রক্ত দেওয়া হয় তাতে পরিচয় লেখা থাকে? ব্লাড ট্রান্সফিউশন না কি যেন, শুনেছি তাতে করে শরীরের পুরো রক্তই নাকি চেঞ্জ করা সম্ভব।'

অতনু কোনও জবাব দিতে না পেরে চুপ করে গেল। শচের কাছে তার কোনও সমস্যাই ধোপে টিকল না।

দরজা খুলে দিয়ে সুপর্ণা হাসল, 'বাব্বাঃ একেই বলে ভদ্রলোক। নাঃ, কথার দাম সত্যিই আছে!'

'বলা উচিত ছিল ডাবল জেন্টলম্যান।' শচী দাঁত বের করে হাসল, 'তনু একা না, আমিও আছি।'

সুপর্ণাও কথার প্যাঁচে কম যায় না। বলল, 'শচীদা, ব্যাকরণে একেই বলে গৌরবে একবচন।'

'বলে বুঝি?' শচী বলল, 'ভাগ্যিস বলে। আমি আবার ব্যাকরণে একদম কাঁচা।'

'একলা ব্যাকরণকে দোষ দিয়ে লাভ কি? তুমি সবকিছুতেই কাঁচা!' সুপর্ণা হাসে, 'না হলে অমন রাজভোগ ফেলে কেউ ডালভাতের নেমন্তন্ন রাখতে আসে। যাক, আমার সৌভাগ্যি, রাত না পোয়াতেই একেবারে রাজদর্শন হল। এসো-এসো, ভেতরে এসো।'

এ পর্যন্ত অতনু একটাও কথা বলেনি। অতনুকে রিলিফ দিতে শচীই আগ বাড়িয়ে কথা বলছিল। ওর মুখে রঞ্জুপ্রসাদ আর বিষ্ণু চ্যাটার্জির শরীরের হালচাল জেনে নেবার পর সুপর্ণা অতনুকে বলল, 'এবার বলো। হেল্প করার কথা কি যেন বলছিলে কাল?'

অতনু তার জামার ভেতর-পকেট থেকে ছালটটা বের করে ভাঁজ খুলে মেলে ধরল, 'এই ছকটা একটু মন দিয়ে দ্যাখো। আমার মনে হয়েছে এটা কোনও ছক নয়, ছকেব ধাঁধা। ছকের আদলে হয়তো এ-বাড়ির গোপন নক্শা। সংকেত-টংকেত থাকা আশ্চর্য না। কোনও গুপ্তভাণ্ডার বা তেমন কিছুর।'

শচী উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'আমার নিজের জন্মছক একবার একজনকে দেখিয়েছিলাম। ওরে বাবা! এইসব গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যেও যে মানুষের মত পেটি পলিটিক্সের প্যাঁচ-পয়জার চলে তা আগে কি আর জানতাম! নবমপতি অমুকচন্দ্র অমুক দ্বাদশ ঘরে বসে তমুকের দিকে দৃষ্টি রেখেছেন—সেকি ভাষা! উনি তো আমাকে জলের মত ব্যাখ্যা করে বোঝালেন, কিন্তু তোমাদের এই শনি মঙ্গল বেস্পতি রাহু কেতুর ডাবল রোল, রিলেশনের প্যাটার্ন, কে কার পালটি ঘর, কার সঙ্গে কার নজর আর নাক শোঁকাশুঁকি কিছুই আমার মাথায় ঢুকল না।'

অতনু ধমক লাগাল, 'তুই থাম, আজকাল দেখছি মুখে খুব খই ফুটেছে।'

সুপর্ণা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছিল। এবার গম্ভীর হয়ে বলল, 'শচীদা, তুমি ঘোর নাস্তিক আছ, তোমার ফিউচার কেউ মেলাতে পারবে না। তোমরা একটু বসো, আমি হোমটাস্কের অঙ্ক কষে আসি।' বলেই ছকের কাগজটা তুলে নিয়ে সুপর্ণা ভেতরের ঘরে চলে গেল।

শচী সেন্টার টেবিলের ওপর থেকে খবরের কাগজখানা টেনে নিল। বাংলা

কাগজ, একদিনের বাসি, এখানে বোধহয় সেরকমই নিয়ম। অতনুর আজ কাগজে রুচি ছিল না। সে উঠে গিয়ে বইয়ের শেলফের কাছে দাঁড়াল।

তারপর কোথা দিয়ে যে ঘণ্টা দেড়েক সময় পার হয়ে গেছে কেউ খেয়ালই করেনি। মাঝখানে একবার সুপর্ণার কোয়ার্টারের কাজের লোকটি কফি জলখাবার দিয়ে গিয়েছিল। সেগুলোর সদ্ব্যবহারও হয়েছে। শচী খবরের কাগজ নিয়ে মশগুল, কী রস পেয়েছে সে-ই জানে! অতনু একখানা পেপারব্যাক থ্রিলারের মধ্যে যেন আপাদমস্তক ডুবে গেছে। সুপর্ণা যখন ফিরে এল, কারও হুঁশ নেই। তার চটির শব্দও বিফল হল দেখে সুপর্ণা গলা তুলে বলল, 'এই যে মশাইরা! তোমরা জেগে ঘুমোচ্ছ না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জেগে আছ জানতে ইচ্ছে করছে!'

হাতের পেপারব্যাক টেবিলে উপুড় করে রেখে অতনু মুখ তুলে তাকাল, 'হোমটাস্কের কদ্দূর?' ওপাশে দুহাতে মেলে-ধরা খবরের কাগজের পাঁচিল ছাড়িয়ে শচীর মুণ্ডুটা ভেসে উঠল ভুস করে।

সুপর্ণা বলল, 'আঁক কষতে কষতে আঙুল ব্যথা হয়ে গেল, তবু অঙ্কটা বোধহয় রাইট হল না। হবে কি করে! বিস্তর গোলমাল, এরকম আবার হয় নাকি! গ্রহ সন্নিবেশ যাচ্ছেতাই, ফিল্ডিং সাজাতে গিয়ে দেখি ডিগ্রিগুলোর মাথামুণ্ডু নেই, অ্যাবসার্ড! অথচ পুরনো পাঁজির হিসেবে ১৯২২ সালের আকাশচিত্র বিলকুল অন্যরকম ছিল। ছক দেখলেই মনে হবে, গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে রিমোট কন্ট্রোলে কেউ বুঝি উদ্ভট খেলা খেলেছে।' কথা শেষ করে সুপর্ণা এসে ওর পাশে ধপ করে বসে পড়ল। অতনু তাকিয়েই ছিল, হাসল।

'১৯২২ সালে রঞ্জুপ্রসাদের জন্ম।' অতনু বলে, 'আমার অনুমান এটা তাঁরই ছক। কোনও কারণে পরে বিকৃত করা হয়েছে।'

'বলো কী! তা আমাকে আগে বলবে তো! তবে পরে না, ছকটা পুরনো, খুব সম্ভব জন্মমুহূর্তেই তৈরি—যখন জাতকের নামকরণ হয়নি। সেই সময়কার আকাশ মানলে জাতকের এই বয়সে একই সঙ্গে মৃত্যুযোগ আর প্রভূত ধনৈশ্বর্য যোগ দেখা যাচ্ছে।'

অতনু হাসল, 'ফাইন! বোধহয় দুটোই মিলছে। কিন্তু আমি তোমাকে যে ব্যাপারে—'

'হ্যাঁ, তুমি যে হিন্ট দিয়েছিলে আমি আসলে সেই লাইনেই দেখার চেষ্টা করেছি। ফলে আমার চোখে এই বিকৃত ছকটা এখন রাজবাড়ির হলঘরের নক্‌শা ছাড়া আর কিছু না। প্রতীক ইঙ্গিত ধরলে এটা হুবহু মেইন বিল্ডিং-এর একতলার ম্যাপ। হুবহু। পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ আর তার মধ্যবর্তী কোণগুলো বেঁধে নিলে কাজটা সহজ হয়ে যায়। বেস্পতি তুঙ্গে অর্থাৎ দেড়তলার লাইব্রেরি ঘর।'

অতনু খুশির গলায় বলল, 'ওয়ান্ডারফুল ডিসকভারি।'

সুপর্ণা বলল, 'ডিসকভারিব এখনও অনেক বাকি। বারো ঘর ঘিঞ্জি বসতির মাঝখানে এক উঠোন, মানে সেই শূন্য জায়গাটা। বোঝাই যায় সকলের লক্ষ্য ওই একদিকে। কেউ বক্রী, কেউ বেহাল, কেউ নিষ্ক্রিয়। সকলেবই দৃষ্টি কাটাকুটি খাচ্ছে ওই উঠোনতুল্য হলঘরের মধ্যে। এই কাগজের ছকে ঠিক ধরা যাবে না। ওখানে গিয়ে ফিতে ধরে মাপজোক করলে হয়তো সেই স্পটটা খুঁজে পাওয়া যাবে, যেখানে—'

'বুঝেছি, মার্বল ফ্লোরের তলায় কোনও লুকোনো গর্ত আছে। নিচে নামার সিঁড়ি। শুধু সেই জায়গাটা আন্দাজ কবলেই হবে না, সেই চিচিং ফাঁকের কৌশলও আমাদের মাথা খাটিযে বের করতে হবে। শচী, কি বলিস?' শচীর অনেকক্ষণ সাড়াশব্দ নেই দেখে অতনু শচীদুলালের দিকে মুখ ফেরাল কিন্তু কাগজের আড়ালে শচীর মুখ ঢাকা, দেখা গেল না। এত তন্ময় হযে খবরের কাগজ পড়বার পাত্র অন্তত শচী নয়। নিশ্চযই অভিমান, মুখে খই ফুটছে বলাটা বোধহয ঠিক হয়নি, এখনও মনে গেঁথে আছে। মান ভাঙানোর জন্যে অতনু ঝুঁকে হাত বাড়িযে কপাটে টোকা দেবার মতই খবরের কাগজেব দেওয়ালে টোকা দিযে বলল, 'অ্যাই শচে, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি! কি হল?'

শচী জবাব দিল না, তাব হাত থেকে কাগজ খসে পড়ল। সে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েই গোটা দুই-তিন নিঃশব্দ লাফে একেবারে দরজায় পৌঁছে গেল। অতনু আর সুপর্ণাকে বোকা বানিযে দিয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। সুপর্ণা কিছু বুঝতে না পেরে শুধোল, 'কী হল?'

অতনু পেছু ডাকল, 'এই শচে! যাচ্ছিস কোথায়, শোন্। কী ছেলেমানুষি করছিস—'

কিন্তু শচী থামল না, ফিরল না, অতনুর কথায় কর্ণপাতই করল না। শচীর অসভ্যতায় সুপর্ণার কাছে মাথা কাটা যাচ্ছিল অতনুর। সে গুম হয়ে বসে থাকল। বন্ধুর হয়ে কোনওরকম সাফাই গাইবার ভাষাও সে খুঁজে পাচ্ছিল না। সামান্য সময় অপেক্ষা করে অবাক সুপর্ণা বলল, 'তোমার ফ্রেন্ডের ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলাম না! সত্যি সত্যিই চলে গেল নাকি, আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য বলে আশ্চর্য!' পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে শচী বলে উঠল, 'কোনও মহিলা যে এত তাড়াতাড়ি হাওয়া হয়ে যেতে পারে আমার ধারণা ছিল না।' তার গলায় চাপা উত্তেজনা।

অতনু খাড়া হয়ে বসে বলল, 'মহিলা! তার মানে?'

শচী সোফার ওপর ধপাস করে বসে পড়ে ব্যাপারটা খুলে বলল। এখানে

বসে সে একটু আগে কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ লক্ষ্য করে একটা আলোর বিন্দু তার কাগজের ওপর নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। যেন খুদে একটা আলোর মাছি স্থির হয়ে বসতে পারছে না কোথাও। প্রথমটা আমল দেয়নি, কিছু ভাবেইনি এ নিয়ে। পরে আচমকা মাথায় ঢুকল ব্যাপারটা। রোদ্দুরের এই রিফ্লেকশন তার চেনা। ঘড়ি কিংবা আংটির পাথর থেকে এরকম আলোর আভা ঠিকরোয়। ট্রেনে ট্রামে জানলার ধারে বসা মানুষের হাতে রোদ পড়লে এরকম নানা আকৃতির আলোর দ্যুতি দেওয়ালে সিলিংয়ে মানুষের গায়ে নড়েচড়ে আবার থেকে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, কত দেখেছে। মনে হতেই তার কেমন সন্দেহ হল। তার ঠিক পিঠ ঘেঁষে ভারী পর্দাটানা একটা বড় জানলা আছে, বসার সময় লক্ষ্য করেছিল। কেমন যেন মনে হল সেখানে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। একটু আগে কারও হেঁটে বেড়ানোর আবছা শব্দ কানে এসেছিল যেন। খুব সাবধানে নাক টানার মত একটা মৃদু শ্বাস কানে এল তখুনি। মনে হল জানলার ওপিঠে বারান্দায় কেউ নিশ্চয় আড়ি পেতে তাদের কথা শুনছে। পর্দা সরিয়ে হয়তো তাদের দেখছেও। পুবের বারান্দা সকালের রোদ্দুরে ভাসছে। সুতরাং—। পিছন ফিরে তাকালে লোকটা পাছে সাবধান হয়ে যায় তাই শচী বাইরে বেরোনোর জন্যে দরজার দিকে ছুটে গিয়েছিল। কিন্তু যে আড়ি পেতেছিল, সে বুঝতে পেরে গিয়েছিল আগেই। বাইরে বেরিয়ে শচী তাজ্জব বনে গেল। বোরখা-পরা এক মহিলা নীল রঙের একটি লেডিজ সাইকেলে চেপে সাঁই-সাঁই করে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

শচীর কথা শেষ হতেই সুপর্ণা চমকে উঠল, 'নীল রঙের ঠিক দেখেছ? হায় হায়, আমারটা নয় তো? চাবি দেওয়া ছিল না কিন্তু।'...

সবাই মিলে ছুটে বাইরে বেরোল। দেখা গেল সুপর্ণার আশঙ্কা মিথ্যে নয়। তার সাইকেল উধাও হয়েছে। সুপর্ণা বলল, 'এখানে এরকম চুরি-ছ্যাঁচড়ামি কখনও ছিল না। বারান্দা থেকে বের করে নিয়ে যাবে এ ভাবাই যায় না। গাড়ি বাইরে পড়ে থাকলেও কখনও কেউ হাত দেয় না। তাছাড়া আমার সাইকেল শহরের এই অঞ্চলের অনেকেরই চেনা। গাড়ির গায়ে একটা রেড ক্রসও আঁকা আছে।'

অতনু বেশ খুশি-খুশি গলায় বলল, 'ভালই হয়েছে, তোমার সাইকেলটাই ও পছন্দ করেছে।' অতনু পায়ে পায়ে পর্দা-ঝোলানো জানলার পিছনে এসে থমকে দাঁড়াল। পর্দাটা যেন সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। সাবধানে উঁকি দিচ্ছে এমনভাবে পর্দাটা আর ইঞ্চিখানেক সরাতেই ঘরের একাংশ পরিষ্কার দেখা গেল। হাত দেড়েকের মধ্যেই সোফার সেই জায়গাটা, যেখানে শচী পিছন করে বসে ছিল। একটু হেলে কোনাকুনি তাকালে সেন্টার টেবিলের কিনারে উল্টে রাখা

পেপারব্যাকখানা দেখা যাচ্ছে। মনে পড়ল সে তখন সামান্য ঘুরে বসে ছোট কৌচে বসা সুপর্ণার সঙ্গে কথা বলছিল। স্বভাবতই এই জানলার দিক থেকে তার মুখ ফেরানো ছিল, কেউ উঁকি মারলেও তার দেখতে পাবার কথা নয়। সুপর্ণাও ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, এবার সামান্য আহত গলায় বলল, 'তোমার কী, তুমি তো বলেই খালাস। এদিকে আমি যে কি করে চেম্বারে যাব, কলে বেরোব—'

অতনু তখনও ঘরের ভেতরটা দেখছিল। বলল, 'আহা, দেখো ঠিক ফেবত পেয়ে যাবে। এ কোনও বাইসিক্ল থিপের কম্মো নয়। বরং তোমার মার্কামারা সাইকেলের কল্যাণে ওর আস্তানার হদিস—'হঠাৎ সুপর্ণার গলায় অস্ফুট শব্দ শুনে কথার মাঝখানেই ফিরে তাকাল। সুপর্ণা নিচু হয়ে পায়ের তলা থেকে কিছু কুড়িয়ে নিচ্ছিল, বলল, 'এঃ মা! এটা আবার কার, এখানে পড়ে আছে?' দু আঙুলের চিমটিতে একটা ড্যালাপাকানো নোংরা রুমাল তুলে ধরল, যেন মরা ইঁদুরের ল্যাজ ধরে তুলছে। অতনু ভাল করে দেখে বলল, 'যে এখানে আড়ি পাততে এসেছিল এটা তার। আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম, বোরখাটা গা ঢাকা দেবার খোলস মাত্র, ঘোমটার থেকেও এফেকটিভ। ভেতরে মেয়ে না পুরুষ বোঝার উপায় নেই। এত রেডিমেড ছদ্মবেশ আর হয় না। এই নাক মোছার রুমালটায় সেন্টেড নস্যির গন্ধ। তার মানে বোরখা চাপিয়ে যে এসেছিল সে একটি জলজ্যান্ত লোক, কখনই স্ত্রীলোক না। সে চায়নি তাকে কেউ চিনে ফেলুক। ধরেই নিতে পারি, সে অচেনা কেউ না, কারও কারও কাছে বিলক্ষণ পরিচিত। এখানে কোথায় টেলিফোন আছে বলো। এক্ষুণি থানায় আর প্রভাকরবাবুকে খবরটা দিতে হবে।'

প্রভাকর থানাতেই ছিলেন। অতনুকে দেখেই বলে উঠলেন, 'আপনার ফোন পাওয়া মাত্র আমার লোকজন চতুর্দিকে বেরিয়ে পড়েছে। থানা থেকেও দুটো মোবাইল ভ্যানকে সজাগ করে দেওয়া হয়েছে। শহরে ঢোকা আর বেরোনোর রাস্তায় এতক্ষণে বোধহয় পাহারা বসে গেছে।'

অতনু খুশি হল। পকেট থেকে কাগজে মুড়ে আনা সেই নোংরা রুমালটা বের করে দিয়ে বলল, 'লোকটা একটা রুমাল ফেলে গেছে, যদি কোনও কাজে লাগে আপনাদের, তাই সঙ্গে এনেছিলাম। যাক, আমি নিশ্চিন্ত, আপনার অমন জরুরি তলব দেখে ভেবেছিলাম আমার সঙ্গে বোধহয় অন্য কোনও দরকার—'

'হ্যাঁ। যে মানিকজোড়কে কাল পাকড়াও করা হয়েছিল তাদের আজ ছেড়ে দেওয়া হবে। আপনারা যদি লক-আপে রত্ন দুটিকে এক নজর দেখে যান তো ভাল হয়।'

ও সি-র নির্দেশে হাজতঘরের তালা খোলা হল। আসামীরা দেওয়ালে পিঠ

দিয়ে বসে ছিল। দুজনেরই বয়স প্রায় কাছাকাছি। পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। অচেনা মুখ, এদের কাউকেই অতনু কখনও দেখেছে এমন মনে হল না। কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে সে মাথা নাড়ল। শচী অতনুর কানের কাছে মুখ নিয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে বলল, 'আরে ভাই প্রাণগোবিন্দ!'

লক-আপ থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে পা বাড়িয়েও থমকে গেল অতনু, 'কে প্রাণগোবিন্দ? কোনটা?'

'সন্দীপের ভাইপো। ওই যে ছিপছিপে লম্বা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। শুধু দাড়ি আর ঝোলা গোঁফ জোড়া নেই। আমার মতই ক্লিন কামিয়ে ফেলেছে, কিংবা জাল দাড়ি-গোঁফ খুলে ফেলেছে। কিন্তু আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। আমি সিওর, ওই প্রাণগোবিন্দ!'

ও সি আর প্রভাকর দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে একই সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে? কাউকে চেনা লাগছে?'

ছকের খবরটা অন্য কানে চলে যাওয়ায় অতনু খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। গুপ্তকক্ষ খুঁজে দেখার ব্যাপারে আর বিন্দুমাত্রও গাফিলতি করতে নারাজ। তাই বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ সবাই হলঘরে গিয়ে জমায়েত হয়েছিল। অতিথিরা সবাই বিদায় নেবার পর সিংহবাড়ি একদম ফাঁকা। বিজয়ার পরের পুজোর দালানের মত খাঁ খাঁ করছে। ভেতর থেকে সদর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল আগেই।

জোর ধাক্কাটা সামলে উঠলেও রঞ্জুপ্রসাদ এখনও দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি ভাল করে। হলঘরের একপাশে বেতের আরাম-চেয়ারে তিনি আধশোয়া। পাশেই একখানা খাড়া চেয়ারে বিষ্ণু চ্যাটার্জিকে বসানো হয়েছে। ভদ্রলোকের পা এখনও কমজোরি, কিছুটা ফোলা রয়েছে। দুজনেরই ভূমিকা আপাতত অভিভাবক দর্শকের। অতনুর সঙ্গে শচীদুলাল গজ ফিতে ধরে তৈরি। প্রভাকর ওভারসিয়ারের মত ওদের পাশে দুপায়ে খাড়া। একটু তফাতে সুপর্ণা, হাতে ভাঁজ-খোলা ফুলস্ক্যাপ শিটের মত একখানা বড় কাগজ। তাকে ঠিক চলচ্চিত্র পরিচালিকার মত লাগছিল।

সে নিজেই থ হয়ে হলঘরের স্থাপত্য লক্ষ্য করছিল। কাল রাতে অনুষ্ঠানের ডামাডোল, ঝাড়বাতির জলুস আর আলোকসজ্জার বিচিত্র রোশনাইয়ের মধ্যে এই ঘরের গঠনকৌশলটি আলাদা করে চোখেই পড়েনি। এখন দেখে রীতিমত শিহরন বোধ করছিল। এর চারটি দেওয়ালের দৈর্ঘ্যই নিখুঁত ৬০ ফুট। বৃত্তাকারে সাজানো বারোটি পাথরের স্তম্ভের ওপরে ৩৬০০ স্কোয়ার ফুটের বিশাল সিলিং যেন ভর করে রয়েছে। এই ঘরখানা জুড়ে একটা রাশিচক্র আঁকলে যে বারোটি রেখার উদ্ভব হবে তার প্রতিটি রেখার ওপর এক একটি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভ অবশ্য বারোটি নয়, সাকুল্যে তেরটি। সেই ত্রয়োদশটি রয়েছে বৃত্তের

ঠিক কেন্দ্রে। থামটি কেবল স্তম্ভমালার মধ্যমণি তাই নয়, চতুষ্কোণ হলঘরটিরও মধ্যবিন্দু বটে।

স্তব্ধতা ভেঙে সুপর্ণা বলল, 'ডিগ্রিগুলোকে আমরা কিন্তু ফুট হিসেবে ধরব। তার মানে এই ছকে যে গ্রহের মাথায় যত ডিগ্রি বসানো আছে, সেই গ্রহের দৌড় দেওয়াল থেকে কেন্দ্রের দিকে তত ফুট হবে। ছক অনুযায়ী উত্তর থেকে দক্ষিণ আর পুব থেকে পশ্চিম দেওয়াল বরাবর দুটো কাল্পনিক রেখা আমরা ভেবে নিচ্ছি যারা কেন্দ্রবিন্দুতে পরস্পর ছেদ করেছে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, জ্যোতিষ শাস্ত্রে আকাশচক্রকে ৩৬০° ধরা হয়। ছকের পুরো মাপটি তাই ১৮০°+১৮০°-৩৬০° । ফলে রাশিচক্রে বারোটি রেখায় বিধৃত চারটি সমকোণ, আটটি সূক্ষ্মকোণ এবং দ্বাদশটি ঘর আছে। দেওয়াল থেকে মাপবার সময় দুটি পিলারের ঠিক মাঝ বরাবর ফিতে ধরতে হবে। এবার তাহলে শুরু করা যাক।'

বৃহস্পতি, শনি এবং রাহু প্রত্যেকেই নিজের নিজের ঘরে একা এবং তিনজনেরই অবস্থান তিরিশ ডিগ্রিতে। কিন্তু মাপতে গিয়ে অতনুরা দেখল সাড়ে আঠাশ ফুট এগোবার পরে ফিতে মাঝের পিলারের গায়ে ঠেকে যাচ্ছে।

অতনু সুপর্ণাকে শুনিয়ে বলল, 'ফুটের মাপ ধরলে কিন্তু হিসেব মিলছে না, তিরিশ ডিগ্রিতে সাড়ে আঠাশ হবে কি করে?'

সুপর্ণা বলল, 'হবে। বুঝতে পারছ না, তোমার অঙ্ক মিলে গেছে? বাকি দেড় ফুট আছে অদৃশ্য অবস্থায় পিলারের মধ্যে। মেপে দেখো, পিলারটার ব্যাস নিশ্চয় তিন ফুট। তার অর্ধেক দেড়, অর্থাৎ পিলারের সেন্টার পয়েন্টতক।'

মেপে দেখা গেল ঠিক তাই। সুতরাং ব্যাসার্ধ দেড় ফুট ধরলে পিলারের মধ্যবিন্দু অর্থাৎ যেখানে বৃহস্পতি শনি আর রাহুর তিনটি রেখাই পরস্পরকে স্পর্শ করেছে। গুপ্তপথের সংকেত কি ওখানেই?

শচী আপনমনেই বলে উঠল, 'বাপ্ রে বাবা! এই মোটা পাথরের থাম্বা কি তাহলে ভেঙে ফেলতে হবে? অসম্ভব! গোটা বাড়িটাই ড্যামেজ হয়ে যাবে যে!' রঞ্জুপ্রসাদও অসম্মতিসূচক মাথা নাড়তে লাগলেন। বিষ্ণুবাবুও কোনওরকম ভাঙাভাঙির মধ্যে নেই, বুঝিয়ে দিলেন।

অতনু বলল, 'ভাঙার প্রশ্নই আসে না। আগে সবটা দেখা যাক, অন্য গ্রহরা কি বলে।' কিন্তু সেখানে অন্য গোলমাল। শুক্র মঙ্গল বুধ যথাক্রমে ৪, ১০, ১৬ ডিগ্রি, এক লাইনে এসেও তারা নিজের নিজের জায়গায় মুখ থুবড়ে রইল। কেউই স্তম্ভতক পৌঁছুতে পারল না। ওদিকে কেতু আর রবির দশাও তাই। ১৮ আর ১২ ফুট। বোঝাই যাচ্ছে, মেপে কোনও লাভ নেই। অতনু সুপর্ণার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল, 'প্রবলেম কিন্তু!'

কিন্তু এই প্রবলেমটা বোধহয় সুপর্ণা বাড়ি থেকেই সল্‌ভ করে এসেছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'মাপা ঠিক হচ্ছে না। এটা সিম্পল যোগের ব্যাপার। ১৪+১০+১৬=৩০। ১৮ আর ১২ যোগ করলেও ৩০। ওদেরও দেড় ফুট দেখবে পিলাবে খেয়েছে। না মেপেও বলে দেওয়া যায়।'

'তবে আসল গোলমালটা কিন্তু আপনার মাথায়।' কথাটা বলে ফেলেই শুধরে নিলেন প্রভাকর, 'আই মিন আপনাব ছকের মাথায়। চ মানে চন্দ্র তো? ওখানে ডিগ্রি লিখতে ভুল হয়েছে নিশ্চয়। ভেবে দেখুন, ওয়াল টু ওয়াল ৩৬০ ফুট হতে গেলে এরকম ছ'টা হলঘরের দরকার।'

সুপর্ণা বলল, 'হয়তো ভুল নয়, ওখানেই একটা মোক্ষম প্যাঁচ আছে। তখন থেকে ভেবেই চলেছি কিন্তু এখনও কোনও কিনাবা কবতে পাবিনি।'

অতনু বলল, 'অত ভাবাভাবি বাদ দাও। মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আমরা পৌঁছে গেছি। ওই সেন্ট্রাল পিলাবটাই আসল। ওখানেই মেঝের তলায় কিছু আছে।' বলেই যেখানে দাঁড়িযে ছিল, জোড়া পাযে জুতোর গোড়ালি ঠুকে বাবকতক লাফাল। সলিড মেঝেতে যে রকম আওয়াজ হবার তেমনি হল। তারপর পিলারের কাছে এগিযে গেল। পিলারের গা ছুঁযে লাফাতেই তফাতটা স্পষ্ট বোঝা গেল। গভীব ফাঁপা শব্দটা কারও কান এড়াল না। ছক তাহলে মিছে বলেনি। সবাব মুখ-চোখেই উল্লাসের ঝিলিক দেখা দিল। তিন বাই দুই ফুটের মার্বল স্ল্যাবগুলোর কোনওটাকে নিশ্চয় সিন্দুকের ডালার মত খুলে ফেলার ব্যবস্থা আছে। সেটাই খুঁজে বের করতে হবে।

কিন্তু সতর্ক সন্ধানী চোখে অনেক খুঁজেও আংটা বা লুকোনো এমন কিছু চোখে পড়ল না যার সাহায্যে ফলস্‌ স্ল্যাব তোলা যাবে। প্রভাকর আর অতনু থামটার চারপাশ খুঁটিযে দেখছিল। একেবারেই স্বাভাবিক, থামের মধ্যে রহস্যজনক কিছু চোখে পড়ল না। মসৃণ পাথরের গোল থাম, মেঝে থেকে উঠে ছাতে ঠেকেছে। ফুট পাঁচেক উঁচুতে পিলারের ফুট দেড়েক অংশ মোটা, গোল পিলার থেকে প্রায় ছ' ইঞ্চি মতন বেরিয়ে আছে। পাথরটা ওই জায়গায় ছ'কোনা করে কাটা হয়েছে। ইস্ক্রুপে প্যাঁচানো নাটের মত দেখায দূর থেকে। দেড় ফুট চওড়া ছ'কোনা একটা পাথরের নাট যেন গোল পিলারটাকে ঘিরে এঁটে বসেছে। আসলে তা নয়, পাথরের গায়ে রিলিফের মত মূর্তি খোদাই করা। ছ'টি প্যানেলে ভাগ করা মৃগয়া-চিত্র। কাছে গেলে শিল্পীর বাটালির কাজ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। অশ্বারোহী রাজা হরিণের পালকে তাড়া করে চলেছেন, হাতে উদ্যত ধনুর্বাণ। সিনেমার ছবির মত পর্বে পর্বে শিকারের দৃশ্যটি যেন মূর্তিমান আর গতিমান হয়ে উঠেছে। শেষ প্যানেলটিতে লাগাম টেনে ধরা ঘোড়া পিছনের

দুপায়ে ভর করে খাড়া দাঁড়িয়েছে আর তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে আছে শরবিদ্ধ একটি হরিণ।

অতনু মুগ্ধ গলায় বলে উঠল, 'বাঃ! পিলারটাকে যদি লাটাইযের মত ঘোরানো যেত তা হলে স্টেজ বাই স্টেজে ধরা এই মূর্তিগুলো সিনেমার মত সচল হয়ে উঠত।'

সুপর্ণা অতনুর অমানুষিক কল্পনা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠেই গম্ভীর হয়ে গেল। বোধহয় রঞ্জুপ্রসাদের উপস্থিতি হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল। প্রভাকর বললেন, 'আমি আর্ট-ক্রিটিক নই, 'বাঃ' বলতে পারলাম না। আমার প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধিতে এটাই বুঝলাম, নিচের চেম্বারে যেতে হলে আমাদের অন্য পথের সন্ধান করতে হবে। এ-বাড়ির অন্য কোথাও নিশ্চয় সুড়ঙ্গের লুকোনো মুখ আছে।'

কী ব্যাপার জানার জন্যে রঞ্জুপ্রসাদ ওদের সবাইকে কাছে ডাকলেন। সব শুনে বললেন, 'না, এ-বাড়িতে এমন কোনও লুকোনো জায়গা নেই,যেখানে সুড়ঙ্গের মুখ থাকতে পারে। আমার মনে হয় মাটির নিচের ঘরে নামবার মুখ এখানেই ছিল। সেটা কোনও কারণে স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হয়তো গুপ্তভাণ্ডার শূন্য, তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওযায এই ব্যবস্থা নেওযা হয়েছিল। সুতরাং ওসব এখন বাদ দাও। প্রভাকর, ওদিকের নতুন কিছু খবর আছে?'

'আছে প্রভুজি।' প্রভাকর সুপর্ণা আর শচীদুলালের দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে একটু দ্বিধার সঙ্গেই বললেন, 'তখন বলতেই এসেছিলাম কিন্তু সুযোগ পাইনি। রাতে সব আপনাকে ডিটেলে বলব।'

রঞ্জুপ্রসাদ বিরক্তি প্রকাশ করলেন, 'আঃ, আবার রাতে কেন, এখনই বলো। এরা সবাই আমার আপনার লোক।'

প্রভাকর লজ্জা পেলেন। আমতা আমতা করে বললেন, 'তা তো জানি। না, ঠিক সেজন্যে নয়। আপনার অনুমতি না পেলে নিজে থেকে আমার পক্ষে...আচ্ছা এক মিনিট—' ইশারায শচীকে ডেকে নিয়ে পাশের ঘরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হলঘরের দেওয়াল ধরে ধরে এবার ছায়া জমতে শুরু করেছে। এ সময় সন্ধে একটু তাড়াতাড়িই নেমে আসে। বাইরে শীত বোধহয় জাঁকিয়ে নামার জন্যে আজ তাল ঠুকছে। এত বড় হলঘরে তারা এই মুহূর্তে মাত্র চারটি প্রাণী। শীতলতা টের পাওয়া যাচ্ছিল ক্রমশ। মেঝে থেকে ঠাণ্ডা উঠছে বোধহয়। অতনুর খেয়াল হল পুলওভার আনতে ভুলে গেছে, গায়ে থাকলে ভাল হত। দেড়তলার লাইব্রেরির সমস্ত শাটার বন্ধ। কোথাও সাড়াশব্দ নেই। সত্যেন চাকীমশাইয়ের বহুক্ষণ কোনও সাড়াশব্দ নেই। সিঁড়িগুলো যেন ঠ্যাং ছড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। হঠাৎ ঝাড়বাতি দুটো বার কতক ঝিলিক দিয়েই ঝকমকিয়ে জ্বলে

উঠল। মনস্তাত্ত্বিক কারণেও আলো মানেই উত্তাপ। আর এমনি সময়ে প্রভাকর শচীকে পিছনে নিয়ে ফিরে আসছেন দেখা গেল। দুজনের হাতেই দুটো করে বেতের চেয়ার। সবাই মুখোমুখি গোল হয়ে বসে পড়ার পরে প্রভাকর বললেন, 'আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা এসে যাচ্ছে। ভাল কথা মিস মিত্র, আপনার সাইকেল উদ্ধার করা গেছে। বাড়ি ফিরে দেখবেন সেটি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

রঞ্জুপ্রসাদ এসব বৃত্তান্ত কিছুই জানতেন না। জিজ্ঞাসায় ভুরু তুলতেই প্রভাকর সেই বোরখা-পরা লোকটির ঘটনা সবিস্তারে বলতে শুরু করলেনঃ 'লোকটি একটা পাবলিক ইউরিন্যালের সামনে সাইকেল রেখে উধাও হয়েছিল। ওঁরা জানতেন ওর আস্তানা যেখানেই হোক, ওই বোরখা-পরা অবস্থায় সেখানে তার যাওয়া সম্ভব নয়। ওই পোশাকে আস্তানা থেকে বেরিয়ে আসা হয়তো কঠিন নয় কিন্তু ফিরে যাবার আগে তাকে বেশ পরিবর্তন করতেই হবে। অন্য কোথাও বোরখা খুলে ফেলার চেষ্টা না করে সে যখনই ওরকম জায়গা বেছে নিয়েছে তখনই ওঁদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি এই স্পটটা তার চেনা, হয়তো যাতায়াতের পথেই পড়ে। ওই অঞ্চলে আধ মাইলের মধ্যে দুটো হোটেল। খুঁজে বের করে লোকটাকে ক্যাচ করতে সময় লাগেনি। অতনুর দেওয়া রুমালটা ওঁদের খুব কাজে লেগেছে এ ব্যাপারে। একই ব্র্যান্ডের নস্যির কৌটোসহ লোকটিকে সহজেই পাকড়াও করেছেন। লোকটার নাম বংশী দত্ত। বাড়ি কলকাতায়। কিছুদিন আগেও একবার ওই হোটেলে এসে উঠেছিল। উদ্দেশ্য, বিজনেস ট্রিপ আর সেই সঙ্গে নিরিবিলিতে ক'দিন রেস্ট নিয়ে যাওয়া। বোরখা আর মিস মিত্তিরের কথায় আকাশ থেকে পড়ল। ডাক্তার মিত্তিরকে চেনা দূরে থাক, কখনও নাকি নামও শোনেনি। আই উইটনেস নেই, ঝেড়ে অস্বীকার করল, তাই কিছুই করার ছিল না আপাতত। ডাহা মিথ্যে কথা জেনেও, স্রেফ একই ব্র্যান্ডের নস্যি ব্যবহার করে এই অজুহাতে কাউকে তো আর সরাসরি অ্যারেস্ট করা যায় না! কিন্তু এই লোকটাই যে নাটের গুরু, মেঘের আড়ালের মেঘনাদ, খুন-রহস্য-রাহাজানির মগজ এবং মদতদার সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লোকটার ফাঁদা গল্প যে ধোপে টিকবে না তার একটা মোক্ষম প্রমাণ পাওয়া গেছে। পরশু লোকটার সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে একজন ভিজিটার এসেছিল। তার নাম প্রাণ, শুধু প্রাণ, কোনও পদবী নেই। আসলে হিন্দি ফিল্মের কল্যাণে পপুলার ভিলেন 'প্রাণ' সাজার দুর্মতি। রিসেপশন থেকে বংশী দত্তর রুমে ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের তলব হয় ওপরে। কারণ রিসেপশন কাউন্টারের ছোকরা দুজন খুব এনজয় করেছিল ব্যাপারটা।' অতনু হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলার চেষ্টা করেছিল, 'প্রাণ! প্রাণ মানে, আমাদের প্রাণগোবিন্দ! প্রাণগোবিন্দ সর্বাধিকারী?'

প্রভাকর মুচকি হেসে মাথা নাড়লেন, 'না। তবে কাছাকাছি। লক-আপে প্রাণগোবিন্দর জুটি সলিড চেহারার সেই খাটো লোকটা। ওদের ছবি দেখাতেই কাউন্টারের ছোকরারা চিনতে পারে। হোটেলের খাতায় বংশী দত্ত নাম ভাঁড়াবে এটাই স্বাভাবিক। তবে দুই-একদিনের মধ্যেই তার আসল পরিচয়, নাম-ঠিকানা ওঁদের জানা হয়ে যাবে। একটা পুরনো প্রসঙ্গ এখানে তুলতেই হচ্ছে। অতনুর নিশ্চয় মনে আছে, শচীর বাড়ি থেকে বেরুতে একদিন তার বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। প্রভাকরের অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে তবে নটরাজ মণ্ডিত্যা সেদিন তার সঙ্গেই ছিল। সেই রাতে অটো-রিকশার মধ্যে এক রহস্যময় বৃদ্ধ অতনুর সহযাত্রী হয়েছিল। গাড়ি চলতে শুরু করলে বারবার তার গায়ে ঢলে ঢলে পড়ছিল। লোকটার খোনা গলা, প্রতি কথায় চন্দ্রবিন্দুর ছড়াছড়ি অতনুর ভুলে যাবার তো কথা নয়!'

অতনু চমকে গেল। ওটি তাহলে প্রভাকরবাবুর দলের লোক! নইলে দ্বিতীয় কেউ তো সে রাতে অটোর মধ্যে ছিল না। জানা গেল তা নয়। তবে অতনুকে নিরাপদে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে তাঁর লোক ঠিকই হাজির ছিল। অতনু তাকে চিনতে পারেনি। অটোর ড্রাইভার সে, সবই নজর করেছে। চোখ-কান, এমনকি নাক ইস্তক তার সজাগ ছিল। একটু ভেবে দেখলেই হয়তো অতনুর মনে পড়বে। বুড়োর গা থেকে একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল, খুবই পরিচিত কোনও গন্ধ, সে ধরা যাক নস্যির গন্ধ! ইয়েস, অতনু মাথা নেড়ে সায় দিল, নস্যির গন্ধই সে পেয়েছিল যেন!

'অটোচালক লক্ষ্য করেছিল, গাড়িতে গুটিসুটি উঠে বসেই লোকটা নাকে এক খাবলা নস্যি ঠেসেছিল। তার খোনা গলা আর চন্দ্রবিন্দু রহস্যের মূলে ওই নস্যি। সুগন্ধি নস্যি! সুতরাং সেই লোকটা যে এই বংশী দত্তই তাতে বোধহয় ভুল নেই। একটা নস্যি মোছা রুমাল যে তুচ্ছ নয় এটাই তার প্রমাণ।'

'তা বলে রুমালের মালিককে হাতে পেয়েও এভাবে ছেড়ে দেওয়া—' অতনু অসহিষ্ণু গলায় কথাটা তুলতেই প্রভাকর মুচকি হেসে মাথা নাড়লেন। 'ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কথাটা ঠিক না, আলগা দেওয়া হয়েছে মাত্র। তবে পুলিশের কাছে যে বংশী দত্তর ব্যাপারটা একদম চেপে যাওয়া হয়েছে এটা ঠিক। কিন্তু তার একটা সঙ্গত কারণ, দেয়ার ইজ এ স্টোরি টু প্রুভ। অ্যানাদার স্টোরি বলাই ভাল। তার জন্যে কিছু সময় চাই, দিন দুয়েক লেগে যাবে হয়তো। তার জন্যে অবিশ্যি এখানকার থানার ওপরে নির্ভর করা যাচ্ছে না। নাম-কা-ওয়াস্তে গজিয়ে ওঠা এই থানা এখনও মোটা দাগ চিনেই চলতে শিখেছে। এই ঘুমপাড়ানি আবহাওয়াই হয়তো তার জন্যে দায়ী। এখানকার পুলিশ এতদিন শুধু মাছি আর ছিঁচকে চোর তাড়িয়েছে আর ট্রাফিক বেয়াদপি সামলেছে। ঘটনা এই,

বলেছে কলকাতা থেকে তারা নাকি মজা দেখতে আর সিংহবাড়ির অনুষ্ঠান কভার করতে এসেছিল। একজন ফ্রিল্যান্স সংবাদদাতা, অন্যজন ক্যামেরাম্যান। বোমা ফাটার তাণ্ডবে তারা যখন ভয় পেয়ে ছুটে পালাচ্ছিল তখন তাদের মিছিমিছি তাড়া করে ধরা হয়।'

চা এসে গেল এই সময়। প্রভাকরকে আচমকা থামতে হল। ভেতর বাড়ির কিচেন থেকে শুধু চা নয়, স্ন্যাকস পাঠিয়েছে, হাল্কা মশলা-ঘিয়ে ভাজা কাজুর প্লেট। রঞ্জুপ্রসাদ ওসব ছুঁলেন না, তাঁর জন্যে ব্ল্যাক টি। প্রভাকর অন্য গলায় কথা বললেন, 'প্রভুজি, কেমন লাগল?'

রঞ্জুপ্রসাদের চোখের পাতা নাচল। বললেন, 'সেকথা এখনই বলছি না। তবে অনেক দিকে অনেক জল গড়িয়েছে।'

'কিন্তু জল ঘোলা করিনি, বলুন?'

'সে অপবাদ তোমাকে কেউ দেবে না। গো অ্যাহেড!' চেয়ারে খাড়া হয়ে বসতে বসতে বললেন, 'আমি বেটার ফিল করছি।' খাঁকারি দিয়ে গলা সাফ করে নিয়ে ফের বললেন, 'ওগো মেয়েটি! তোমাকে আমার খুব পছন্দ। এবার বিয়ে-সাদির কথা ভাবতে হয়, নাকি ভাবাই আছে?'

আনমনা সুপর্ণার কানে কোনও কথাই ভাল করে ঢুকছিল না। বোকার মত চোখ তুলে এক পলক তাকাল। প্রভাকর চোখের কোণ দিয়ে অতনুর দিকে তাকালেন। তাঁর ভাবলেশহীন মুখের নিচে চাপা হাসি খেলে গেল কিনা ধরা গেল না। বিষ্ণু চ্যাটার্জি চুরুট ধরাতে ধরাতে দাঁতের ফাঁকে বললেন, 'ন্যাস্টি হ্যাবিট। নস্যি ব্যাপারটাকে আমি ভীষণ ডিসলাইক করি। যুগের হাওয়া! ছেলেছোকরাদের মধ্যে এখন বিড়ি খৈনি নস্যির চল হয়েছে। কোনও ডিগনিটি নেই। আমার স্টেনোকে একদিন খুব ধমকেছিলাম। টাইপ স্ক্রিপ্ট নিয়ে এল, দেখি তাতে নস্যির গুঁড়ো ছড়ানো।'

প্রভাকর রহস্যময় মন্তব্য করলেন, 'লিক প্রুফ!' বিষ্ণুবাবু সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন।

'তাহলে একটা কাহিনী বলতে হয়।' প্রভাকর যেন লিক প্রুফের ধুয়ো ধরলেন, 'প্রথমে গল্পের মতই মনে হবে। সত্যি কিনা সেটা পরের কথা।'

'ইউ মিন স্টোরি! কী, স্বরচিত নাকি?'

'এক হিসেবে তাই।' প্রভাকর ঠোঁটের কোণে হাসলেন, 'লেখক না হয়েও মনে মনে গল্প আর কে না বানায় বলুন! ধরুন সবাধিকারীদের রিলেটিভ এক ফ্যামিলি, ও-বাড়িতেই বসবাস করে আসছিল অনেকদিন থেকে। একরকম আশ্রিতের মতই। পরে অবস্থার পরিবর্তন হল। ছেলেরা বড় হয়ে উঠল। বড়টি

একটা ব্যাঙ্কে ঢুকল, মেজটিও টাইপ শর্টহ্যান্ড শিখে চাকরি জুটিয়ে নিল। সমস্যা হল ছোটটিকে নিয়ে। সে লেখাপড়ার ধার মাড়াল না, হয়ে উঠল বদের ধাড়ি। নেশা-ভাং ধরল, মস্তান-গুণ্ডামি করে বেড়াতে লাগল এদিকে সেদিকে। তিতিবিরক্ত হয়ে সর্বাধিকারী ওদের বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করলেন। তাঁর আর একটা দুশ্চিন্তার কারণও ছিল। হস্টেল জীবন শেষ করে সন্দীপের ফিরে আসার সময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি চাননি, পুরনো কথা ওর কানে যায়। নিজেদের বসবাসের অংশটুকু রেখে বাকিটা ভাড়া দিয়ে দিলেন। মেয়ে দুটির বিয়ে হয়ে গিয়েছে ততদিনে। দুজনেই স্বামীর ঘর করতে বিদেশে চলে গেছে। বুড়োবুড়িও প্ল্যান ভাঁজছিলেন চলে যাবার। বাড়ির ভাড়া থেকেই সন্দীপের মোটামুট চলে যাবে। তাছাড়া সেও সুযোগ্য হয়েছে, রোজগারপাতি ভালই করবে।'

প্রভাকর একটু থেমে সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিলেন। সুপর্ণা ছাড়া সকলেই তাঁর দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন। প্রভাকর আবার শুরু করলেন, 'কিন্তু সর্বাধিকারীমশাইয়ের হিসেবে ভুল হল। তিনি যত সহজে সব মিটে গেল ভেবেছিলেন তা মিটল না। স্বজনপরিজনের ক্ষত অত সহজে শুকোয় না। বিশেষ করে একজন আউটসাইডার সকলকে বঞ্চিত করে, বাড়ির মালিক সেজে বসবে, কেউ ভাল মনে মেনে নিতে পারেনি। সমস্ত আক্রোশই দানা বেঁধে উঠেছিল সন্দীপকে ঘিরে। আর ঠিক এরকম সময়েই আর একটি দারুণ খবর ফাঁস হয়ে গেল তাদের কাছে। প্রভুজির যাবতীয় সম্পত্তির অর্ধেক অংশ সন্দীপের ওপরে বর্তাতে যাচ্ছে। বারুদের স্তূপে একটা জ্বলন্ত কাঠি গিয়ে পড়ল। সন্দীপের মৃত্যুদণ্ড নির্ধারিত হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ আর সেই সঙ্গে অতনুবাবুকে জালে জড়িয়ে পুরো সম্পত্তি কৌশলে হাতাবার নিপুণ পরিকল্পনাও ফেঁদে ফেলল দুটি মানুষ, তাদের নাম আপাতত উহ্যই থাক। আমি—'

প্রভাকর তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না। 'চ-চ-চ' বলতে বলতে সুপর্ণা কেমন বিকৃত মুখে উঠে দাঁড়াতে গেল, পারল না, তার হাতের ধাক্কায় আধখালি চায়ের কাপ ছিটকে মেঝেয় পড়ে চুরমার হয়ে গেল। চোখের তারা উলটে প্রায় যায় যায় অবস্থা। সকলের আগে অতনুই বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা। এক লাফে সে সুপর্ণার পাশে পৌঁছে গেল। কোনওরকম সঙ্কোচের সময় ছিল না তার। এক হাতের মোচড়ে সুপর্ণাকে সামনে ঝুঁকিয়ে প্রায় উপুড় করে ধরে রেখে এক অদ্ভুত কৌশলে কাঁধের নিচে উপর্যুপরি দুটো মোক্ষম থাবড়া মারল। আটকে যাওয়া দম আর খাদ্যের কণা কাশির দমকে বেরিয়ে আসতেই বিষম সামলে নিল সুপর্ণা। তারপর জল খেয়ে সুস্থ হতে কিছুটা সময় লাগল।

অবস্থা স্বাভাবিক হতে রঞ্জুপ্রসাদ শান্ত গলায় শুধোলেন, 'তুমি কি কিছু বলতে চাইছিলে মা?'

অপ্রস্তুত আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে সুপর্ণা বলল, 'হ্যাঁ, চ বর্ণের রহস্যটা বোধহয় ধরতে পারা গেছে।' সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সুপর্ণার মুখের দিকে তাকাল।

প্রভাকর বললেন, 'বুঝেছি, আপনি সেই ছকের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু সবটাই এখনও অনুমান। কাগজের ইঙ্গিতটা কাজে আসবে কিনা জানি না। আসলে আইডিয়াটা আমার মাথায় এসেছিল বেশ কিছুক্ষণ আগের একটা কথা থেকে। কথাটা উদ্ভট কিন্তু আমাকে বিদ্যুৎচমকের মত ছুঁযে গিয়েছিল। পিলারটাকে যদি লাটাইয়ের মত ঘোরানো যেত, কী তাই না?' সুপর্ণা অতনুর দিকে জিজ্ঞাসার চোখে তাকাল।

প্রভাকর বলে উঠলেন, 'ইমপসিবল!'

রঞ্জুপ্রসাদ হাত তুললেন, 'আঃ! লেট হার স্পিক।'

সুপর্ণা বলল, 'হ্যাঁ, আমাকে আগে সবটা বলতে দিন। চ অক্ষরটা চন্দ্রই হোক বা চক্রই হোক একটা বর্তুল বা বৃত্তকেই মিন করছে। তিনশো ষাট ডিগ্রির মধ্যেও সেই ইঙ্গিতই আছে। তবে পিলার ঘোরানো যে অসম্ভব সেকথা সবাই জানে। কিন্তু পিলারের ওই ছ'-কোনা জায়গাটায বিলিফের কাজ খোদাই করা শিকারচিত্র সবাই দেখেছেন। প্যানেলের ছবি সবই ক্লকওয়াইজ, অর্থাৎ বাঁ থেকে ডান দিকে চলেছে। যদি আদৌ কোনও সম্ভাবনা থাকে ওখানেই আছে। নাটের মত ওটাকে ঠেলে যদি এক চক্কর ঘোরানো যায, পিলারের ভেতর যদি কোনও প্যাঁচ, কোনও মেকানিজম থাকে, পিলারেব খানিকটা অংশ ফাঁপা হতেও তো পারে যার ভেতর দিযে বল বেয়ারিং দেওয়া কোনও ইস্পাত কিংবা ধাতুর দণ্ড পিস্টনের মত কাজ করবে! চলুন, একবার চেষ্টা করে দেখবেন কি? তবে একটা কথা, ছকটার বাইরের চেহারা দেখে আপনারা হেসেছেন কিনা জানি না, কারণ এরকম উদ্ভট হাস্যকর গ্রহসন্নিবেশ আমি জীবনে দেখিনি।'

অতনু সবসময় এক কদম আগে। সে-ই প্রথম পিলারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রাস্তায় স্টার্ট বন্ধ হয়ে-যাওয়া গাড়ি ঠেলার কায়দায় প্যানেলে হাত রাখল। প্রথমে এক হাতে, পরে দুহাতে, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলল। কোনও ফল হল না। স্তম্ভ আর প্যানেল বুঝি একটাই পাথর। নাকি ভেতরে জং ধরে জমাট বেঁধে আছে? ওকে সাহায্য করতে শচীও দেখাদেখি হাত লাগাল। প্রভাকর পিলারের অন্য পাশে দাঁড়িয়ে ওদের দৌড় দেখছিলেন, ঠোঁটের কোণে আবছা বিদ্রূপের হাসি।

হঠাৎ কিছু বোঝার আগেই অতনু আর শচী মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিল। ছ'-কোনা পাথরটা হুড়মুড় করে এক পাক ঘুরে গেল কত সহজে। একটুও জোর লাগল না। জলভরা বালতির চাপে যেন কপিকল আপনিই ঘুরে যাচ্ছে। ওদিকে বিকট শব্দ করে প্রকাণ্ড একটা লাফ দিলেন প্রভাকর। আর

সামান্য দেরি করলে তিনি বোধহয় অন্ধকার পাতালে তলিযে যেতেন। অতনু উঁকি মেরে দেখল প্রভাকরের পাযের তলার পাথরের স্ল্যাবখানা ফুটখানেক নেমে গিযে একপাশে দ্রুত সবে যাচ্ছে। চোখের পলকে মেঝের ওই জাযগায় শুধু জেগে রইল জমাটবাঁধা অন্ধকারের চৌকো হাঁ-মুখ। সেটা কত গভীর তা ঠাওর করা গেল না। শুধু ঝাড়বাতির আলো মুখের কাছটায় পড়ে নিচের অন্ধকারকে যেন চতুর্গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

অতনু গর্তের সামনে ঝুঁকে দাঁড়িযে বোধহয নিচে নামবার উপায় খুঁজছিল। কেউ তার হাত ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল। কে আবার, স্বযং প্রভাকর। বললেন, 'মরতে চান? একটা কথা আছে, ঝাঁপ দেবাব আগে একবার তাকিয়ে দেখো। এ তো অন্ধকাবে ঝাঁপ দেওযা মশাই। অজানা জাযগা, সাপ ব্যাঙ কি আছে জানা নেই। তার চেযেও বড় কথা, প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর পরে বোধহয এই চেম্বারের মুখ খোলা হল!'

অতনু সতর্ক চোখে তাকিয়ে ছিল। বলল, 'গ্যাস?'

'থাকা আশ্চর্য নয়। আমার মনে হয় রাতটা যাক। কাল দিনের বেলা দেখে-শুনে নিচে নামা যাবে।'

রঞ্জুপ্রসাদ বিষ্ণুবাবু সবাই সেই পরামর্শই দিলেন। অতনু একাই উল্টোদিকে প্যানেল ঘুরিযে চেম্বারের মুখটা আবার বন্ধ করে দিল। আর ঠিক তখনই তার কেমন মনে হল, তার মাথার মধ্যে দূরে কোথাও আবছা হয়ে টেলিফোনের ডায়াল ঘুরছে।

একটা গোঙানির শব্দে তন্দ্রামতন ঘুমটা ভেঙে গেল অতনুর। দেখল শচী বিছানার ওপরে উঠে বসে আছে। ও ঘুমোয়নি। বলল, 'শুনছিস, হলঘরে কে যেন কাতরাচ্ছে!'

বাইরে বেরিযে চমকে গেল। আলো ঝলমল-করা হলঘরে রঞ্জুপ্রসাদ্র, প্রভাকর আর বিষ্ণুবাবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। চেম্বারের মুখটা খোলা, তার কিনাবে রক্তাপ্লুত অবস্থায ছটফট করছে বংশী দত্ত। বিষ্ণুবাবু সকলের শেষে নিচে নেমে এসে চমকে গেলেন, 'একি! ভৌমিক, তুমি? এখানে কেন? তোমার এ অবস্থা কে করল?'

মুমূর্ষু বংশী দত্ত করুণ গলায় বলল, 'আমার ভাই। বিমল।'

'সে কে? কোথায়?'

সে কে প্রভাকর জানতেন। বললেন, 'সেই মস্তান ছোকরা। প্রমাণ অভাবে ও সি ওকে বিকেলেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। খবরটা জানতাম।'

বিষ্ণুবাবু তাঁর স্টেনোর দিকে তাকিয়ে ফের জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কোথায়?'

হাতের ইশারায় বংশী ওরফে অমল ভৌমিক চেম্বারের মুখটা দেখিয়ে দিল।

প্রভাকর রঞ্জুপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওই বিমলই সন্দীপকে মেরেছিল। অমল বিমল আর ওদের ভাইপো গোবিন্দর নাম আমার জানা ছিল। কিন্তু তারাই যে এরা সেটা জানতাম না। অর্থের লালসা কি সাংঘাতিক! নিজের দাদাকেও রেহাই দেয় না!'

ক'দিন পরের এক সকালবেলা।

রঞ্জুপ্রসাদ সবাইকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে এনেছেন। ব্যাপারটা নাকি জরুরি। হঠাৎ এরকম তলবের জন্যে কেউই বোধহয় প্রস্তুত ছিল না। ভেতরের কিচেনে বাড়ির সবকটি কাজের লোক রান্নার আয়োজনে ভীষণ ব্যস্ত, লাগাতার শব্দে আর গন্ধে সেটা মালুম পাওয়া যাচ্ছিল। আয়োজনটা একটু এলাহি ধরনেরই মনে হচ্ছে যেন।

ঘরের ভেতরে অবশ্য কোনও শব্দ নেই। সবাই নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল। একসময় রঞ্জুপ্রসাদ কেমন ক্লান্ত গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, 'টাইম ইজ রানিং শর্ট...ভেরি ভেরি শর্ট। আমি তার ঘণ্টা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।'

সবাই থমকানো মুখে ওঁর দিকে তাকাল। কেউ কোনও কথা বলতে সাহস করল না। এখন ঝড়ের পরের সিংহবাড়ি। সব শান্ত, নিঃশেষ, নিরুদ্বেগ। শুধু বিগত ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির কিছু চিহ্ন এখানে-ওখানে যেন অপ্রীতিকর স্মৃতির মত লেগে রয়েছে। দ্রুতগতিতে ঘটে-যাওয়া মর্মস্পর্শী ঘটনাগুলোকে মন থেকে মুছে ফেলা শক্ত। অমল ওরফে বংশী দত্তকে বাঁচানো যায়নি। মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে সে কোনও সত্যই গোপন করেনি। সত্যেন চাকী যে তার আপন পিসেমশাই, আর সিংহবাড়ির যাবতীয় গোপন তথ্য যে তিনিই বরাবর যুগিয়ে আসছিলেন সে কথা অমল না বললে বোধহয় আর কোনওদিনই জানা যেত না। সেই রাতে উত্তেজিত অতনুর ঘোলাটে মগজে ফোন ডায়াল করার আবছা শব্দটা ঠিকই ঢুকেছিল। তার ফোনে গুপ্ত কক্ষের রহস্যকৌশল জানতে পেরেই সে গভীর রাতে এ-বাড়িতে হানা দিয়েছিল। তবে সেটা সম্ভব হয়েছিল পুলিশ তার কথা বিন্দুবিসর্গ জানত না বলেই। আর তার জন্যে দায়ী প্রভাকর হালদারের ভুল স্ট্র্যাটেজি। অবশ্য এই বংশী দত্ত যে অমল ভৌমিক, অর্থাৎ বিষ্ণুবাবুর পি এ সেকথা হালদার তখনও জানতেন না। প্রভাকর কেবল একা নন, স্বয়ং ও সি-ও আছেন। তাঁর নির্বুদ্ধিতার ফলে তিন তিনটি জীবন নষ্ট হল। সত্যিকারের ফ্রিল্যান্স ফটোগ্রাফার আর সাংবাদিক ধরে নিয়ে বিমল আর প্রাণগোবিন্দকে তিনি যদি বেকসুর খালাস না দিতেন তাহলে ওই গোলমালটি পাকাত না। অবশ্য বিমলই যে সন্দীপের এবং তার হত্যাকারী সেকথা জবানবন্দিতে স্পষ্ট

করে বলে গিয়েছিল অমল। সন্দীপের ঘরের দেওয়ালে, আলমারিতে, ছুরির বাঁটে পাওয়া হাতের ছাপের সঙ্গে বিমলের আঙুলের ছাপ মিলে গেছে। মিলে গেছে পুলিশের পুরনো রেকর্ডে দাগী আসামীর টিপছাপের সঙ্গেও। প্রভাকরের অনুমান নির্ভুল ছিল। তিনি বাধা না দিলে অতনুর মৃত্যু সেদিন সুনিশ্চিত ছিল। আন্ডারগ্রাউন্ড চেম্বারের মারাত্মক গ্যাসে বিমল আর প্রাণগোবিন্দ সংজ্ঞা হারিয়ে মারা গিয়েছিল। পরের দিন চেম্বার গ্যাসমুক্ত করে ও সি, প্রভাকর আর অতনুরা নিচে নেমেছিল। নিচের কুঠুরির মধ্যে স্তূপীকৃত কঙ্কাল পড়েছিল। অজ্ঞাতপরিচয়, হতভাগ্য কিছু মানুষের শেষ চিহ্ন। পোশাক-আশাক রক্তমাংস কবে ধুলোয় মিশে গিয়ে শুধু অস্থি আর করোটি পড়ে আছে। ওটা গুমঘর না গণকবরখানা? শুধু একটি কঙ্কাল তার মধ্যে আস্ত আর নতুন, তাও বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ কোন না হবে! তার দুপায়ে বেড়ি। মেঝেয় গাঁথা লোহার আংটার সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা। অতনু ভীষণ চমকে গিয়েছিল, কিন্তু বুঝতে দেয়নি। কঙ্কালের গলার লকেটটা সে সকলের অলক্ষ্যে খুলে নিয়েছিল। সোনার তবকের ওপর হীরে আর চুনির বিন্দু দিয়ে লেখা 'রত্নাকর'। এটা অবনী কর্মকারকে ফেরত দিতে হবে। রত্নভাণ্ডারের কোনও চিহ্নই দেখতে পাওয়া যায়নি কিন্তু অতনুর কেমন মনে হয়েছে কঙ্কালের পায়ের তলার লোহার আংটার অন্য কোনও উদ্দেশ্যও থাকতে পারে।

এই দ্রুতগতি ভাবনার জাল ছিঁড়ে গেল অতনুর। রঞ্জুপ্রসাদ কখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। এবার ধীর পায়ে সুপর্ণার কাছে গিয়ে ওর মাথায় হাত রাখলেন। বোধহয় মনে মনে আশীর্বাদ করলেন। তাঁর বিষণ্ণ মুখে চাপা কৌতুকের হাসি ফুটল। বললেন, 'আজ থেকে তোমাকে আমার ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান করে নিলাম।'

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। রঞ্জুপ্রসাদ পকেট থেকে আলো ঠিকরোনো একজোড়া রত্নকঙ্কন বের করে অতনুর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'বেটা! মাই বয়, এই জোড়া হাতকড়া ওর হাতে পরিয়ে দাও। অ্যারেস্ট হার।'